বাজী রাও।

"ইস্ মুল্কমে এক বাজী, ঔর সব্ পাজী"।

নিজাম-উল্-মুল্ক।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

(সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

কলিকাতা।

ভাদ্র, ১৩১৩ সাল।

বিজ্ঞাপন।

মহাবীর বাজী রাওয়ের কর্ম্ম-বহুল জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনচরিত যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে গেলে এক খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু তদুপযোগী উপকরণ অদ্যাপি সুপ্রাপ্য নহে। বাজী রাওয়ের স্বহস্ত-লিখিত অনেক চিঠিপত্র অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাঁহার সংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে আমরা এখনও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এরূপ অবস্থায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বৃহদায়তন জীবনচরিত রচনার প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্র। এই কারণে আমি সে অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছি। বাজী রাওয়ের ন্যায় মহদ্‌ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্তও আমাদিগের পক্ষে অল্প শিক্ষাপ্রদ নহে—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান পুস্তকখানি রচনা করিলাম।

"বিশ্বকোষ" নামক বৃহদভিধানের জন্য পেশওয়েদিগের ইতিহাস লিখিবার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। তদনুরোধে আমি বালাজী বিশ্বনাথ, বাজী রাও ও বালাজী বাজী রাও প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা-পূর্ব্বক উক্ত অভিধানে সন্নিবেশিত করি। তাহা পাঠ করিয়া আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে বাজী রাওয়ের বিবরণ স্বতন্ত্র

পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদিগের উৎসাহেই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উৎপত্তি হয়।

পুস্তকাকারে বাজী রাওয়ের প্রচার-কালে উহার পূর্ব্ব-লিখিত অংশগুলি আমূল সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে নূতন অনুসন্ধানের ফলে পূর্ব্বসিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। তৎসঙ্গে অনেক নূতন ঘটনার বিবরণও ইঁহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। তাহাতে ইহা পূর্ব্বায়তনের দ্বিগুণের অপেক্ষাও বৃহত্তর হইয়াছে।

এই দ্বিতীয় সংস্করণে সিদ্দিদিগের সহিত সংগ্রাম ও ইংরাজের সহিত সন্ধি—এই দুইটি বিষয় নূতন সংযোজিত হইয়াছে। পূর্ব্বভাষে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কতিপয় প্রয়োজনীয় তত্ত্বও এবার সন্নিবেশিত করিয়াছি। পরিশিষ্টে পেশওয়েদিগের কুলগুরুর পরিচয় ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমর-নীতির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গিয়াছে। পুণার সুপ্রসিদ্ধ "কেসরী" পত্রে গত ১৯০২ সালে অব্যবস্থিত যুদ্ধ-নীতি সম্বন্ধে যে কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মাবলম্বনে "মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমর-নীতি" শীর্ষক প্রস্তাব রচিত হইয়াছে।

কাপ্তেন গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব মহোদয়ের রচিত ইতিহাস-গ্রন্থের সহিত বহু স্থলে এই পুস্তকের বর্ণনায় পার্থক্য লক্ষিত হইবে। নবাবিষ্কৃত মূল চিঠিপত্রের ও দেশীয় প্রাচীন ইতি-

হাস-গ্রন্থের অনুসরণ করায় এইরূপ ঘটিয়াছে। এই ক্ষুদ্র-পুস্তকে ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদিগের মত-খণ্ডনের প্রয়াস নিরর্থক-বোধে পরিত্যাগ করিয়াছি। সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিতে বিচার-বিতর্কের অবতারণা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমার মনে হয় নাই। তবে পরিশিষ্টে মহারাষ্ট্রীয় সমর-নীতির আলোচনা-কালে প্রচলিত ভ্রান্ত মতের খণ্ডনে যত্ন প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। মোসলমানদিগের "খাঁ" উপাধি এই পুস্তকে "খান"-রূপে লিখিত হইয়াছে। বাজী রাওয়ের পত্রাদিতে খাঁর পরিবর্ত্তে "খান" শব্দই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, দৃষ্ট হয়। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর পত্রেও উক্ত প্রয়োগ দেখিয়াছি। এই কারণে এই পুস্তকে "খান" লিখিবার প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিতে পারি নাই।

উপসংহারে রাও বাহাদুর কাশীনাথ নারায়ণ সানে বি, এ, (ডেক্যান কলেজ), শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে ও সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস মহোদয়ের নিকট আমার একান্ত কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ প্রয়োজন। ইঁহাদিগের অক্লান্ত চেষ্টায় মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস সংক্রান্ত দুর্লভ প্রাচীন কাগজ পত্র সংগৃহীত না হইলে এই পুস্তক রচনা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত।

বিগত ১৩০৮ সালের মাঘ মাসে বাজী রাওয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদিন পরে দ্বিতীয় সংস্করণ

পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল। এবার পুস্তকের আকার প্রায় ৭৫ পৃষ্ঠা বাড়াইয়াও মূল্য-হ্রাস করিয়াছি। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণের ইহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি জন্মিলেই লেখকের শ্রম সফল হইবে।

১০ই ভাদ্র,
১৩১৩ সাল।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

ভ্রম সংশোধন।

		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃঃ ৬	পং ৪	উৎসদান	উৎসাদন
পৃঃ ১৮৫	পং ১০	ইংরাজ সৈন্যের সমকক্ষতায়	ইংরাজ সৈন্যের ন্যায় সুশিক্ষিত সৈন্যের সমকক্ষতায়

সূচীপত্র।

পূর্ব্ব-ভাষ।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমরনীতি।

বাজী রাও।

—:*:—

পূর্ব্ব-ভাষ

কালচক্রের শোচনীয় পরিবর্ত্তনগুণে যে দেশ এক্ষণে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, যে দেশের তৃতীয়াংশ অধিবাসীকে সুভিক্ষের বৎসরেও অর্দ্ধাশনে জীবন যাপন করিতে হয়, সেই দেশ এককালে সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য-সম্পদের নিকেতন বলিয়া জগতের নিকটে পরিচিত ছিল। "অনন্ত-রত্নপ্রসবিনী" বলিলে তখন একমাত্র ভারত-ভূমিকেই বুঝাইত। আমাদিগের এই জন্মভূমি এক-কালে সর্ব্বতো-ভাবে "রত্নগর্ভা-বসুন্ধরা" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল। কিন্তু শুকপক্ষীর মধুর কণ্ঠস্বরের ন্যায় ভারত-ভূমির এই কল্পতরু-সদৃশী রত্ন-প্রভবিতাই দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার পরাধীনতার প্রধান কারণ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে পারসীক, গ্রীক, শক, হুণ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি নানা জাতীয় বৈদেশিকগণ ভারতবর্ষের ধনরত্নের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া সময়ে সময়ে এই দেশ আক্রমণ করিয়াছেন। সেই সকল আক্রমণের মধ্যে গজনবী-বীর

মামুদের আক্রমণই বিশেষ প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মহাবীর অর্থলোভে আকৃষ্ট ও ধর্ম্মোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া উপর্য্যুপরি সপ্তদশ বার ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়া, তাহার অপরিমেয় ধনরাশি লুণ্ঠন করেন। তাঁহার চেষ্টায় মোসলমানদিগের ভারত-বিজয়ের পথ সুগম হয়। ইহার পর প্রায় সাতশত বৎসর পর্য্যন্ত এই দেশ মোসলমানদিগের বিলোল-দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই।

গজনবী বংশের অধঃপতনের পর ঘোরবংশীয় শাহাবউদ্দীন নানা দেশীয় রণ-কর্কশ সৈনিকদল সংগ্রহ-পূর্ব্বক ভারতবর্ষ-বিজয়ের আয়োজন করেন। তাঁহার নিদেশক্রমে পরিচালিত হইয়া ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র তুরগ-সেনা সহ ধর্ম্মোৎসাহ-প্রমত্ত দুর্দ্ধর্ষ আফগানগণ প্রবল সাগর-তরঙ্গের ন্যায় ভারতবর্ষে আপতিত হইলেন। এই সময়ের হিন্দুসৈনিকগণ তেজস্বিতা ও সমর-নিপুণতায় নবাভ্যুদিত মোসলমানদিগের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন ছিলেন না; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে আফগান জাতির নৈসর্গিক উগ্রতা, নবোদ্যম, ধর্ম্মোৎসাহ ও নবরাজ্য-জয়াশার কুহকিনী শক্তির সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ছিল। তাঁহারা কেবল আত্ম-রক্ষিণী নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন হিন্দুনরপতিগণের বিলাসিতা ও আলস্য বর্দ্ধিত হওয়ায় প্রকৃষ্ট সমরনীতির অবলম্বনেও তাঁহারা তৎপরতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সাম্রাজ্য-

লাভের প্রবলাকাঙ্ক্ষা মোসলমানদিগকে যুদ্ধে অধ্যবসায়-সম্পন্ন করিয়াছিল। তথাপি সমর-কুশল প্রাচীন হিন্দুগণের সহিত যুদ্ধে এই নব-অভ্যুদয়-সম্পন্ন জাতি বহু বার পরাজিত হইয়াছিলেন। কোন হিন্দুরাজ্যই স্বল্পায়াসে তাঁহাদিগের করায়ত্ত হয় নাই। অনেক স্থলেই তাঁহাদিগকে অধর্ম্ম-যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জয়লাভ করিতে হইয়াছিল*। সাম্রাজ্য-প্রয়াসী শাহাবউদ্দীন কূটনীতির প্রভাবে ও ত্রিংশৎ বৎসরের অব্যাহত চেষ্টায় আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ খণ্ড-রাজ্য-সমূহে মোসলমানদিগের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত বিজয়-কেতন আংশিকরূপে উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত মোসলমানদিগের অধিকার আর্য্যাবর্ত্তেই নিবদ্ধ ছিল। অতঃপর দক্ষিণ ভারতের প্রতি তাঁহাদিগের লুব্ধ দৃষ্টি নিপতিত হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে খিলিজী বংশীয় আলাউদ্দীন প্রথমতঃ কপট-নীতির বলে সরল-প্রকৃতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। তিনি দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে, পঙ্গপাল-সদৃশ মোসলমান-সেনা মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বাধীনতা-হরণের জন্য দক্ষিণাপথে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। তদানীন্তন মহারাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র রাও ও তদীয় জামাতা হরপাল দেব বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত স্বরাজ্য-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের উদ্যম নিষ্ফল হইলেও মহারাষ্ট্রীয় সামন্তেরা বহুদিবস পর্য্যন্ত

আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্যে জলাঞ্জলি দেন নাই। কিন্তু ইহার পর মোসলমানের প্রবর্দ্ধমান শক্তির গতিরোধ করা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। মোসলমানেরা অসাধারণ অধ্যবসায় ও দুর্নিবার রাজ্যলিপ্সা-বশে স্বল্পদিবসের মধ্যেই সমগ্র দক্ষিণ ভারত পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠন করিয়া ছারখার করিয়া ফেলিলেন। প্রাচীন ইতিহাস-লেখক ফেরিস্তা বলেন. ১৩১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা এক কর্ণাটক প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়াই তিন শতাধিক হস্তী, বিংশতি সহস্র অশ্ব ও ৯৬ সহস্র মণ সুবর্ণ লাভ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদিগের অত্যাচারে কর্ণাটক প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে রজত-শূন্য হইয়াছিল।

এইরূপ কার্য্য-পরম্পরার দ্বারা দক্ষিণ ভারতে মোসলমানদিগের অপ্রতিহত আধিপত্যের নিদর্শনস্বরূপ ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে "বাহামনি" রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই রাজবংশ ১৭৫ বৎসর অক্ষুণ্ণ প্রতাপে মহারাষ্ট্র দেশ শাসন করে। অতঃপর সর্দ্দারগণের কলহ ও বিদ্রোহের ফলে বাহামনি রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই রাজ্য-পঞ্চকের অধীশ্বর সুলতানেরাও প্রায় এক শত বৎসর কাল প্রচণ্ডতেজে দক্ষিণাপথ শাসন করেন। মোসলমানদিগের এই সার্দ্ধদ্বিশত-বর্ষব্যাপী কঠোরশাসন-চক্রের পেষণে জর্জ্জরিত হইয়া স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় মহারাষ্ট্রবাসী "ত্রাহি" "ত্রাহি" করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্র-দেশ হইতে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যবিদ্যা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

অধিকাংশ প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে দেব-মন্দিরাদির স্থানে মসজেদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই ঘটনায় ধর্ম্মপ্রাণ মহারাষ্ট্রবাসী ভয়াকুল হইয়া উঠিলেন। কল্পনা-বিহারী দাক্ষিণাত্য কবি সুখময় কল্পনা-সাম্রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশের দুরবস্থা-বর্ণনায় মনোযোগী হইলেন।—

অবনাবতীত-পবনাশ্বশোভিনো,
ভব-নাগশায়ি-ভবনাবমর্দ্দিনঃ।
সবনাদি-কর্ম্মলবনায় দীক্ষিতাঃ,
যবনাশ্চরন্তি ভুবনাতিভীষণাঃ॥ বিশ্বগুণাদর্শ—১৬২ শ্লোক।

"হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মাদির লোপ করিবার জন্য যবনদিগের দুর্জ্জয় তুরঙ্গ-সেনা ভৈরববেশে দেশে দেশে দেবমন্দিরাদি ভগ্ন করিয়া বেড়াইতেছে"—ইত্যাদি শ্লোক তাঁহাদিগের লেখনীর মুখে নিঃসৃত হইতে লাগিল। রামদাস স্বামীর ন্যায় যোগাসক্তচিত্ত ব্যক্তিও দেশের দুঃখ-কাহিনী বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিলেন,—

"যবনগণ বহুদিবস হইতে অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারে, হিন্দুগণের মধ্যে এমন চণ্ড পুরুষ কেহ নাই। দুষ্টগণের অত্যাচারে দেব-ব্রাহ্মণের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম ভ্রষ্ট হইতেছে, নামসংকীর্ত্তনও লোপ পাইয়াছে। তীর্থক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত, ব্রাহ্মণগণের আবাসস্থানসমূহ অপবিত্রীকৃত ও সমস্ত পৃথিবী (ভারতবর্ষ) বিপ্লবপূর্ণ হইয়াছে। ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছেন। পাপিগণের বলবৃদ্ধি হওয়ায় ধার্ম্মিকগণ দুর্ব্বল ও দেবতাগণ অত্যাচার-ভয়ে লুক্কায়িত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তিলকমালা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যবনদিগের অনুকারী হইয়াছে। সকলের সুখসম্মান লোপ পাইয়াছে। যবনগণ দুর্ব্বল প্রজাকুলের প্রতি বিবিধ কটুভাষা প্রয়োগ করে ও তাহাদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দেয়।"

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে যে দেশের অবস্থা এই প্রকার শোচনীয় ছিল, মদোদ্ধত মোগল সেনা প্রভঞ্জন-বেগে যে দেশের গ্রাম নগরাদির উৎসদান করিয়া বেড়াইত, সেই দেশে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-কালে একজন হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনকারী অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। এই মহাপুরুষ সহ্যাদ্রির অঙ্কদেশস্থিত কোঙ্কণ প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে সাধারণ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া স্বীয় অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে মহারাষ্ট্রবাসীর অধিনায়কত্ব লাভ করেন। সমুদ্র-বলয়াঙ্কিতা ভারত-ভূমিকে বিধর্ম্মী রাজার দাসত্ব-পাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া হিন্দুস্থানে অখণ্ড হিন্দু-সাম্রাজ্য-সংস্থাপন ও উচ্ছিন্ন-প্রায় হিন্দু ধর্ম্মের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা—এই মহাপুরুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় নাই। তথাপি তাঁহার স্বল্প আয়ুষ্কালের মধ্যে তিনি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মোসলমান শক্তিকে দমিত করিয়া ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর ক্ষুদ্র "স্বরাজ্যকে" দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা-তীর হইতে উত্তরে যমুনাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া একটি বিশাল হিন্দু-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের বিগত সহস্র বৎসরের ইতিহাসে, এমন কি, দুর্দ্ধর্ষ শিখ ও রাজপুতদিগের ইতিবৃত্তেও এরূপ মহতী চেষ্টার

উদাহরণ—এরূপ অসাধ্য-সাধনের দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না। যে মহাপুরুষ মোগলশাসিত ভারতে এই দুষ্কর কার্য্য সাধন-পূর্ব্বক চির-প্রণষ্ট হিন্দু-গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম **বাজী রাও**।

ভারতবর্ষের বিগত সহস্র বৎসরের ইতিহাসকে যাঁহারা হিন্দু জাতির পরাধীনতার ইতিহাস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, বিজ্ঞ ঐতিহাসিকেরা কখনই তাঁহাদিগের মতের সমর্থন করিতে পারেন নাই। মোসলমানেরা দীর্ঘকালের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু হিন্দুদিগের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার জন্য তাঁহারা কখনও অধিক দিন নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। মোসলমান-দিগের বারংবার বহু বিক্রম প্রকাশসত্ত্বেও হিন্দুগণই বাহুবলে ভারতের অধিকাংশ আপনাদিগের শাসনাধীন রাখিয়াছিলেন। কেবল মোগলদিগের সাম্যনীতিমূলক শাসনকালে কিছুদিনের জন্য ভারতে হিন্দু-শক্তির প্রাধান্য খর্ব্ব হইয়াছিল। কিন্তু ঐ অবস্থায় এক শতাব্দী কাল অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই ভারতের নানাস্থানে আবার হিন্দুশক্তি অঙ্কুরিত হইয়া ভারতে হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিল। দুর্দ্ধর্ষ মোসলমান শক্তির সহিত সংগ্রামে পরিশেষে হিন্দুশক্তিই সম্পূর্ণ ভাবে জয়ী হইল। ইংরাজ সেই সমর-ক্লান্ত হিন্দু শক্তিকে ছলে, বলে, কৌশলে পরাভূত করিয়া এদেশে বৃটিশ শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

ফলতঃ ভারতে মুসলমান আমলের বিগত সহস্র বৎসরের ইতিহাসকে পরাধীনতার ইতিহাস না বলিয়া হিন্দুসমাজের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস—এমন কি, সফল জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস নামে আখ্যাত করাই বিধেয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেবও এই মতের পক্ষপাতী। (১)

---

(1) The popular notion *that India fell an easy prey to the Mussulmans is opposed to the historical facts.* Mahomedan rule in India consists of a series of invasions and partial conquests, during eleven centuries from Usman's raid in 636 to Ahmed Shah's tempests of invasion in 1761 A. D. They represent in the Indian History the overflow of the nomad trides of Central Asia to the south east ; as the Huns, Turks and various Tartar tribes disclose in early European annals the westward movement of the same great breading-ground of Nations. *At no time was Islam triumphant throughout all India. Hindu dynasties ruled over a large area.* At the height of the Mahomedan power, the Hindu princes paid tribute and sent agents to the Imperial court. But even this modified supremacy of Delhi lasted for little over a a century (1678—1707). Before the end of that period *the Hindus had again begun the work of reconquest.* The native chivalry of Rajputana was closing in upon Delhi from the south east, and the religious confederation of the Sikhs was growing into a military power in the north-west. The Marathas combined the fighting power of the low castes with the statesmanship of the

দিগ্বিজয়ী মোগলগণের সার্ব্বভৌম শাসনকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দুশক্তির পুনরভ্যুদয় সংঘটিত হইয়াছিল। রাজপুতনায় ক্ষত্রিয়গণ, দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্রীয়গণ, বুন্দেলখণ্ডে বুন্দেলা জাতি, এবং পঞ্জাবে শিখগণ মোগল-শাসনের সম্পূর্ণ বা আংশিক উচ্ছেদ-সাধন-পূর্ব্বক হিন্দু সাম্রাজ্য বা স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইঁহা-দিগের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় জাতির চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সফলতা লাভ করিয়াছিল। মহাত্মা শিবাজী ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে তোরণ দুর্গ অধিকার করিয়া যে স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের সূত্র-পাত করিয়াছিলেন, এক শত বৎসরের মধ্যে তাহা অসংখ্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ইংরাজেরা বণিগ্‌বেশে এদেশে পদা-র্পণের পর যখন ভারতবর্ষে রাজনীতিক প্রাধান্য-স্থাপনের সংকল্প করিতেছিলেন, তখন শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত ও বাজী রাওয়ের চেষ্টায় পরিপুষ্ট রাজ-শক্তিই ভারতে চক্রবর্ত্তিত্ব

Brahmans, and subjected the Muhamedan kingdoms throughout India to tribute. So far as can now be estimated, the advance of the English power of the beginning of the present (19th) Century, alone saved the Mughal-Empire *from passing to the Hindus.* * * * The British won India *not from the Mughals* but from the Hindus—W. W. Hunter's *History of the Indian people.*

করিতেছিল। পঞ্জাব, আজমীর মালব, নাগপুর, বেরার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাট প্রভৃতি প্রদেশে মহারাষ্ট্র শাসন তখন বদ্ধমূল হইয়াছিল। বঙ্গদেশ, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ ও অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশের নবাবেরাও মহারাষ্ট্র রাজ-শক্তির সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া নিয়মিতরূপে মহারাষ্ট্রবাসী হিন্দুদিগকে করদান করিতেছিলেন। (১)

নয় শত বৎসরের (৬৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) অক্লান্ত চেষ্টায় মহম্মদ-পন্থীরা ভারতবর্ষে যে রাজনীতিক প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,(২) হিন্দুদিগের অর্দ্ধ শতাব্দীর উদ্যমে তাহা বসন্ত-বাতাহত শিশির-শ্রীর ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। আহম্মদ শাহ আবদালীর সাহায্যে হিন্দুশক্তিকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিয়াও ভারতবর্ষে ইস্‌লাম আপনার বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দুশক্তি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিকট অজেয় হইয়া রহিল।

---

(১) বঙ্কিমবাবু বলেন, "শিবাজীর আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। চিরজয়ী মুসলমান হিন্দু কর্ত্তৃক বিজিত হইল। সমুদয় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদানত হইল। অদ্যাপি মার্হাট্টা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে।" ভারত-কলঙ্ক।

(২) ভীরুতার অপবাদগ্রস্ত বাঙ্গালী জাতিকে জয় করিতেও মোসলমানের তিন শতাধিক বৎসর লাগিয়াছিল। বঙ্গীয় হিন্দু শক্তিও নানাস্থানে নানা সময়ে মোসলমান শাসনের উচ্ছেদ-পূর্ব্বক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়াছিল।

হিন্দুশক্তির এই অজেয়তার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ প্রায়ই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকে কল্পনা করিয়াছেন, দস্যুজন-সুলভ দুর্নিবার ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান লুণ্ঠন-প্রবৃত্তিই এই শক্তিকে অতীব ভীষণ ও অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাসলেখক গ্রাণ্ট ডফ্ মহোদয়ও পূর্ব্বোক্ত কল্পনারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া তিনি মহারাষ্ট্রীয় দিগের অভ্যুদয়কে সহ্যাদ্রির দাবানলের ন্যায় আকস্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বলা বাহুল্য, বিধর্ম্মী ও বিজেতৃ-জাতির দ্বারা বিজিত জাতির ইতিহাস লিখিত হইলে তাহাতে এবম্প্রকার ভ্রম-সংঘটন কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এদেশে ধর্ম্ম ভিন্ন কখন কোন জাতির বা কোন সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় নাই। শিখজাতির উন্নতির সহিত গুরু নানকের প্রচারিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাণনাথ নামক জনৈক মহাপুরুষ বুন্দেলখণ্ডে যে নব ধর্ম্ম-ভাবের প্রবর্ত্তন করেন, তাহারই ফলে বুন্দেলা জাতি মোগল-শাসনের উচ্ছেদ-সাধনে সমর্থ হয়। মুসলমান আমলে রাজপুতনায়, পঞ্জাব ও বুন্দেলখণ্ডের ন্যায় নবধর্ম্মের উদ্দীপনা ও পরিপ্লাবন সংঘটিত হয় নাই বলিয়া

সেখানে আমরা হিন্দু শক্তির বিজয়িনী মূর্ত্তি দেখিতে পাই নাই। স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় রাজপুতদিগের সমস্ত শক্তি মুসলমান-দিগের বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষায় ও পরিশেষে আত্ম-কলহে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাঁহারা দিগ্বিজয়ীর বেশে কখনও সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই।

যে সকল কারণের সমবায়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র ভারতব্যাপী হিন্দু-সাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, মহারাষ্ট্র দেশে ধর্ম্ম-সংস্কার ও ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস তাঁহাদিগের দেশের ধর্ম্ম-শিক্ষক ভক্ত কবিগণের জীবনের কার্য্যাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। মহারাজ শিবাজীর জীবনীর সহিত ঐ সকল সাধুপুরুষের সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ। খৃষ্টান ইতিহাস-লেখকগণ দক্ষিণাপথের হিন্দুদিগের এই ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন শিবাজীর অভ্যুদয় ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অজেয়তার কল্পিত কারণাবলী নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শিবাজী ও তাঁহার অনুযায়ী মহারাষ্ট্রীয়গণ দুর্নিবার লুণ্ঠন প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। নবোদ্দীপিত ধর্ম্মানুরাগই তাঁহাদিগকে মুসলমান প্লাবিত ভারতে অসাধ্যসাধন করিতে সমর্থ করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণের রাষ্ট্রোন্নতির সহিত তাঁহাদিগের ধর্ম্মোন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বাজী রাওয়েরও

সাম্রাজ্য-বিস্তার-নীতির মূলে যে ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল, তাহা এই ক্ষুদ্র চরিতাখ্যান হইতে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শিবাজী যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্রীয়েরা সে মন্ত্র বিস্মৃত হন নাই। ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম্মকে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপাত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর সপ্তবিংশতি বর্ষকাল অওরঙ্গজেবের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা মহারাষ্ট্র দেশকে পরকীয় শাসনপাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করেন। তাহার পর তাঁহাদিগকে বীরবেশে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে "যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি" রবে উপস্থিত হইতে দেখা যায়। খৃষ্টান লেখকেরা এই ঘটনাকে তাঁহাদিগের দুর্নিবার লুণ্ঠন প্রবৃত্তির নিদর্শন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু সে কালের মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত ও সরদারদিগের পত্রাদিতে এই দেশ বিজয় কার্য্য "দেশের উদ্ধার-সাধন" নামে অভিহিত হইয়াছে। স্বধর্ম্ম-রক্ষারূপ মহাভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ মোসলমানের হস্ত হইতে "উদ্ধার" করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা মহারাষ্ট্রীয়দিগের ঐতিহাসিক কাগজ পত্র পাঠ করিলে সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

অওরঙ্গজেবের বিশাল বাহিনীকে (কাফি খাঁর মতানুসারে এই বাহিনী বিংশতি লক্ষ সেনাসমন্বিত ছিল) পরাস্ত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা-সম্পাদনের পর মহারাষ্ট্রীয়েরা

দেখিলেন, দিল্লীতে যত দিন মুসলমান শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন তাঁহাদিগের নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। এই কারণে তাঁহারা দিল্লীতে মহারাষ্ট্রীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে দিল্লীর কেন্দ্র শক্তি দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকিলেও উহার অসংখ্য শাখা প্রশাখা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই শাখা-শক্তিসমূহ ক্রমশঃ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া মোসলমান সাম্রাজ্যের প্রধান অবয়ব-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সূত্রে ভারতবর্ষ-শাসনের অধিকারও ন্যায়ানুসারে তাঁহা-দিগেরই প্রাপ্য বলিয়া মোসলমান সুবেদারদিগের ধারণা হইয়াছিল। কাজেই তাঁহারা আপনাদিগের প্রভূত্ব—ভারতে মোসলমান-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

এই কারণে যে সকল মোসলমান আমলদার ও সুবেদার সমগ্র ভারতবর্ষকে লতা-গুল্মের ন্যায় পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দমন-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র মহারাষ্ট্র শক্তির চক্রবর্ত্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আপনাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতে হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র-কেশরী শিবাজীর সময় হইতেই এই নীতির সূত্রপাত হইয়াছিল। শিবাজী মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সম্পাদনের পর কর্ণাটক প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। তদবধি দক্ষিণ ভারতে প্রায় কুমারিকা পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাজী-

রাও নর্ম্মদা পার হইয়া উত্তর ভারতে আপনাদিগের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বালাজী বাজীরাও রামদাস স্বামীর উপদেশের অনুবর্ত্তন করিয়া সমগ্র মারাঠা জাতিকে মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে সমবেত করিয়াছিলেন। তিনি "ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য দেশ-বিজয়"-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একাদশ বৎসরের মধ্যে মহারাষ্ট্র-সেনা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অন্যূন ৪২টী যুদ্ধাভিযান করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রবাসী হিন্দুসন্তানের এই সময়কার অধ্যবসায় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হয়। বালাজীর পিতৃব্যপুত্র ভাউসাহেব হিন্দুকুশ অতিক্রম পূর্ব্বক কনষ্টান্টিনোপলে মহারাষ্ট্র বিজয়কেতু উড্ডীন করিবার ইচ্ছাও সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-শক্তি পরাস্ত হইবার অল্পদিন পরেই দিল্লীর দ্বারদেশ আবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের সিংহনাদে কম্পিত হইয়াছিল। পানিপথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, পেশওয়ে প্রথম মাধব রাও স্বীয় চেষ্টায় তাহার সম্যক্ পরিপূরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় পুনর্ব্বার ভাতবর্ষে একচ্ছত্র হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সহসা অকালে মাধব রাওয়ের মৃত্যু ঘটায় ও বণিগ্‌বেশী ইংরাজদিগের কূট নীতির জাল বিস্তারিত হওয়ায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

রামদাস স্বামীর নিকট মহাত্মা শিবাজী ও তাঁহার অনুগামী মহারাষ্ট্র সমাজ যে অপূর্ব্ব দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে মোসলমান প্লাবিত ভারতে হিন্দু-শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুশক্তির প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিধর্ম্মীর চক্ষে অরাজকতার ইতিহাসরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুর চক্ষে এই ইতিহাস তাঁহাদিগের গৌরব কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ভারত-ব্যাপিনী বিরাট মোগলশক্তিকে দমিত ও হিন্দুশক্তির চক্রবর্ত্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে যে দীর্ঘকালব্যাপী সমর-সত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছিল, তাহা বিপ্লবের নামান্তর নহে, উহা হিন্দুজাতির অতি গৌরব-কর সফল জীবন-সংগ্রাম। এই সংগ্রামে দেশের কল্যাণ-শ্রী বিদলিত না হইয়া অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। গুণ-গ্রাহী সারজন স্যালিভ্যান যথার্থই বলিয়াছেন—

Pray do not give the enemy an advantage by speaking in unqualified terms of the bad government of our predecessors. Considering the incessant wars and revolutions in which they had been engaged for a full century after the Moghal Empire broke up, it is quite a wonder that there was any government at all. Yet in the midst of these incessant wars *the civil institutions were undisturbed and almost every where the country*

was flourishing. Since our last good piece of work when we put down the Pindari ravages in 1818, we have held India with such an iron grasp that hardly a shot had been fired in our territory. But what have we made of this quiet interval? The government is more in debt and I doubt if the people are so rich.

সে যাহা হউক, এক্ষণে যে নীতি অবলম্বন করিয়া বাজী রাও মহাত্মা শিবাজীর আরব্ধ দুষ্কর কার্য্যসাধনে যত্নশীল হইয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে এই পূর্ব্বভাষে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী এই নীতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্রীয় বীরেরা উহার অনুসরণ করিয়া দক্ষিণাপথে আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করেন। কিন্তু বাজী রাওয়ের বুদ্ধিকৌশলে ও শৌর্য্য-বলেই ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ঐ নীতির বৈদ্যুতিক ক্রিয়া আরব্ধ হয় এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ মোসলমানদিগের শাসন-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজচ্ছত্রতলে আশ্রয় লাভ করে। বাজী রাওয়ের পূর্ব্বে এরূপ ভাবে কেহ এই নীতির পরিচালনা করেন নাই—করিবার অবসরও পান নাই। তাঁহার স্বসম-সময়ের সহযোগী রাজপুরুষগণের মধ্যেও তিনি ভিন্ন আর কেহই এই নীতির ঈদৃশ পরিচালনে সাহসী হন নাই। ইহাই বাজী রাওয়ের চরিত্রের

রামদাস স্বামীর নিকট মহাত্মা শিবাজী ও তাঁহার অনুগামী মহারাষ্ট্র সমাজ যে অপূর্ব্ব দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে মোসলমান প্লাবিত ভারতে হিন্দু-শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুশক্তির প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিধর্ম্মীর চক্ষে অরাজকতার ইতিহাসরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুর চক্ষে এই ইতিহাস তাঁহাদিগের গৌরব কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ভারত-ব্যাপিনী বিরাট মোগলশক্তিকে দমিত ও হিন্দুশক্তির চক্রবর্ত্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে যে দীর্ঘকালব্যাপী সমর-সত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছিল, তাহা বিপ্লবের নামান্তর নহে, উহা হিন্দুজাতির অতি গৌরব-কর সফল জীবন-সংগ্রাম। এই সংগ্রামে দেশের কল্যাণ-শ্রী বিদলিত না হইয়া অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। গুণ-গ্রাহী সারজন স্যালিভ্যান যথার্থই বলিয়াছেন—

Pray do not give the enemy an advantage by speaking in unqualified terms of the bad government of our predecessors. Considering the incessant wars and revolutions in which they had been engaged for a full century after the Moghal Empire broke up, it is quite a wonder that there was any government at all. Yet in the midst of these incessant wars *the civil institutions were undisturbed and almost every where the country*

was flourishing. Since our last good piece of work when we put down the Pindari ravages in 1818, we have held India with such an iron grasp that hardly a shot had been fired in our territory. But what have we made of this quiet interval? The government is more in debt and I doubt if the people are so rich.

সে যাহা হউক, এক্ষণে যে নীতি অবলম্বন করিয়া বাজী রাও মহাত্মা শিবাজীর আরব্ধ দুষ্কর কার্য্যসাধনে যত্নশীল হইয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে এই পূর্ব্বভাষে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী এই নীতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্রীয় বীরেরা উহার অনুসরণ করিয়া দক্ষিণাপথে আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করেন। কিন্তু বাজী রাওয়ের বুদ্ধিকৌশলে ও শৌর্য্য-বলেই ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ঐ নীতির বৈদ্যুতিক ক্রিয়া আরব্ধ হয় এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ মোসলমানদিগের শাসন-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজচ্ছত্রতলে আশ্রয় লাভ করে। বাজী রাওয়ের পূর্ব্বে এরূপ ভাবে কেহ এই নীতির পরিচালনা করেন নাই—করিবার অবসরও পান নাই। তাঁহার স্বসম-সময়ের সহযোগী রাজপুরুষগণের মধ্যেও তিনি ভিন্ন আর কেহই এই নীতির ঈদৃশ পরিচালনে সাহসী হন নাই। ইহাই বাজী রাওয়ের চরিত্রের

একটী প্রধান বিশেষত্ব। এ বিশেষত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে তৎপূর্ব্বে অপরিজ্ঞাত ছিল। বাজী রাঁওয়ের প্রায় এক শতাব্দী পরে ইংরাজেরা এই নীতির সময়োচিত সংস্কারপূর্ব্বক অনুসরণ করিয়া সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে সমর্থ হন। ইংরাজী ইতিহাসে ইহা The system of subsidiary alliance নামে পরিচিত। ইহার মহারাষ্ট্রীয় নাম "চৌথাই" বা চৌথ-পদ্ধতি।

মোগলদিগের আমলে দেশের শান্তি-রক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য-রক্ষার আয়োজনে সাধারণতঃ রাজস্বের চতুর্থাংশ ব্যয়িত হইত। মহাত্মা শিবাজীর চেষ্টায় মহারাষ্ট্র-শক্তি যখন দেশ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিল, তখন মহারাষ্ট্র-নরপতিগণ দুর্ব্বল প্রতিবেশী রাজ্যের শান্তি-রক্ষার ও শত্রুর আক্রমণ-নিবারণের ভার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কাজেই সেই আশ্রিত রাজ্যের রাজস্বের চতুর্থাংশ বা চৌথ তাঁহাদিগের প্রাপ্য হইল। ফলতঃ "চৌথ" অপরের রাজ্য-রক্ষার্থ সৈন্য-পোষণের বেতন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপ বেতন-লাভ করিয়া স্বকীয় সৈন্য-পোষণের ব্যয়-ভার লাঘব করিবার কল্পনা সর্ব্বপ্রথমে শিবাজীই উদ্ভাবন করেন। তিনি বহু দিন হইতে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতানদিগের এবং মোগল বাদশাহের নিকট তাঁহাদিগের রাজ্য বা রাজ্যাংশ-রক্ষার ভার-গ্রহণ ও তাহার বেতনস্বরূপ

"চৌথ"-স্বত্বের প্রার্থনা করিতেছিলেন। পরিশেষে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে মোগলদিগের আক্রমণের ভয়ে বিপন্ন হইয়া দক্ষিণা-পথের সুলতানেরা শিবাজীকে চৌথস্বরূপ বার্ষিক আট লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন ও তাঁহার সৈন্য-সাহায্য-লাভ করেন। সে সময়ে কেবল শিবাজীর সহায়তার ফলেই বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা রাজ্য মোগল সম্রাটের সর্ব্বনাশ-কর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এইরূপে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ ভারতে "চৌথ" প্রথার প্রবর্ত্তন হয়।

বলা বাহুল্য, আত্ম-রক্ষিণী নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই রাজ-নীতিবিৎ শিবাজী এই চৌথ-পদ্ধতির উদ্ভাবন ও অনুসরণ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পর-রাজ্য-রক্ষার দায়িত্ব লইয়া তদ্বিনিময়ে তত্রত্য রাজস্বের চতুর্থাংশ লাভ করিতে না পারিলে ভারতে মহারাষ্ট্র-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। কারণ, ইহা দ্বারা প্রথমতঃ পররাষ্ট্রের ব্যয়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সৈন্য-সংখ্যা ও সামরিক বলের বৃদ্ধি সম্পাদিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল রাজ্য মহারাষ্ট্র-সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবে, সে সকল রাজ্য হইতে মহারাষ্ট্র-রাজশক্তির বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, "চৌথ" নামে শান্তিরক্ষার বেতন হইলেও কার্য্যতঃ উহা সামন্তের নিকট প্রধান রাজশক্তির প্রাপ্য করেরই নামান্তর। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নহে যে, খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মার্কুইস অব

ওয়েলেস্‌লি মহোদয়ের প্রবর্ত্তিত "সব্‌সিডিয়ারি সিষ্টেম"-ও এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা শিবাজীর ইহলোক-ত্যাগের পূর্ব্বেই দক্ষিণ ভারতের যাবতীয় হিন্দু ও মোসলমান রাজশক্তির সম্মতিক্রমেই তাঁহাদিগের রক্ষার ভারগ্রহণ ও তাহার বিনিময়ে চৌথ আদায় করিবার প্রথা মহারাষ্ট্র-সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্রাট্ অওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বাধীনতা-হরণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রিয় মহারাষ্ট্রীয় বীরগণের অসাধারণ শৌর্য্যগুণে তাঁহার সমস্ত যত্নই বিফল হয়। বিংশতি বৎসর যুদ্ধের পর খৃষ্টীয় ১৭০৫ অব্দে সম্রাট্ তাঁহাদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে এক সনন্দপত্র দান করেন। অধিকন্তু দেশের অশান্তি-নিবারণের মানসে তিনি তাঁহাদিগকে দক্ষিণ ভারতস্থিত মোগল-শাসিত প্রদেশের 'সরদেশমুখী' স্বত্ব বা সমগ্র রাজস্বের দশমাংশ—বার্ষিক এক কোটী অশীতি লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতেও স্বীকৃত হন। এজন্য অবশ্য সরদেশমুখের ন্যায় স্বকীয় সৈন্যের দ্বারা দক্ষিণাপথের বাদশাহী প্রদেশের শান্তি-রক্ষার ভার তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে বলা হইল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহাতে সম্মত ও সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা বাদশাহের নিকট সরদেশমুখীর সহিত শিবাজীর উদ্ভাবিত চৌথ-পদ্ধতির প্রবর্ত্ত-

নাধিকারও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কারণ, সে সময়ে দেশে যেরূপ অসংখ্য রাজ্যের ও স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় রাজপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাতে পররাষ্ট্রে যথোপযুক্ত সৈন্য-রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে দেশে শান্তি-স্থাপনের ও মহারাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সম্রাট্ মারাঠাদিগকে সে স্বত্ব-দানে অসম্মত হওয়ায় পুনর্ব্বার উভয় পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হয়। পরিশেষে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে অওরঙ্গজেবের পুত্র ফরুখশিয়র আংশিক ভাবে ও তৎপরবর্ত্তী সম্রাট্ মহম্মদ শাহ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণভাবে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সরদেশমুখী স্বত্বের ও চৌথ-পদ্ধতি-প্রবর্ত্তনের সনন্দ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। বাজী রাওয়ের পিতা বালাজী বিশ্বনাথ স্বয়ং দিল্লীতে গমন করিয়া শেষোক্ত সনন্দপত্র আনয়ন করিয়াছিলেন।

সনন্দ লাভ করিয়াও মহারাষ্ট্রীয়েরা সর্ব্বত্র চৌথ-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। দিল্লীশ্বরের সুভেদারেরা ও অপর স্বতন্ত্র-প্রায় রাজন্যবর্গ বিনা যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-শক্তির রক্ষণাধীন হইতে অসম্মত হইলেন। নিজাম-উল্-মুল্ক এ বিষয়ে প্রধান প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। এজন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ২০ বৎসর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। বাজী রাও এই যুদ্ধের নেতৃত্ব-গ্রহণ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পর্য্যুদস্ত হইয়া নিজামকে মহারাষ্ট্রীয়-দিগের রক্ষণাধীনতা-স্বীকার ও তাঁহাদিগকে চৌথ প্রদান

করিতে হয়। দক্ষিণাপথের অপর ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজারাও ক্রমে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাধান্য-স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ফলতঃ বালাজী বিশ্বনাথ মোগল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাঁহার স্বদেশবাসীর জন্য যে স্বত্বের সনন্দ আনয়ন করেন, বাজী রাওয়ের জীবন-ব্যাপী চেষ্টাতেই মহারাষ্ট্রবাসিগণ তাহার প্রকৃত ফলভোগের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন।

কেবল তাহাই নহে। বাদশাহী সনন্দ অনুসারে উত্তর ভারতে চৌথ আদায়ের অধিকার মহারাষ্ট্রীয় জাতির ছিল না। এই কারণে আর্য্যাবর্ত্তে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক চৌথ-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিবার কল্পনা বাজী রাওয়ের পূর্ব্বে কাহারও মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই। বীরশ্রেষ্ঠ বাজী রাওয়ের বিশাল চিত্তক্ষেত্রেই সর্ব্বপ্রথম সমগ্র ভারতবর্ষকে চৌথ-পদ্ধতি-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমাচলের শিখরদেশস্থিত "আটক" নগর পর্য্যন্ত বিশাল প্রদেশের শান্তি-রক্ষার বা শাসন ও পালনের ভার-গ্রহণ করিবার মহনীয় আকাঙ্ক্ষা সমুদিত হয়। মহারাজ শাহুর মন্ত্রি-সমাজ ও সেনানীগণ বাজী রাওয়ের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা-দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দু-শক্তির ও হিন্দু-ধর্ম্মের পুনর্ব্বার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও বিধর্ম্মীর শাসনপাশ হইতে সমগ্র ভারতবাসীর উদ্ধার-সাধন করা প্রত্যেক মহারাষ্ট্র সুসন্তানের

কর্ত্তব্য—এই কথা বলিয়া বাজী রাও সকলের উৎসাহানল প্রজ্বলিত করেন। এই প্রসঙ্গে মহারাজ শাহুর দরবারে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণে সমস্ত মহারাষ্ট্র সর্দ্দারেরা একমত হইয়া ভারতে হিন্দুর প্রাধান্য-স্থাপনে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। শিবাজীর প্রবর্ত্তিত চৌথ-পদ্ধতির সাহায্যে ভারতবর্ষে হিন্দুসাম্রাজ্য-সংস্থাপনের জন্য অগ্রগমন-নীতির (Forward policy) প্রচারই বাজী রাওয়ের চরিত্রের বিশেষত্ব। ঐ নীতির অনুসরণে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়কে সমবেতভাবে নিয়োজিত করাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান মহত্ত্ব। সেই মহত্ত্বের প্রভাবে হিন্দুস্থানে শতবর্ষপর্য্যন্ত হিন্দুজাতির প্রাধান্য পরিরক্ষিত হইয়াছিল। এই কারণে সেই মহত্ত্বের ইতিহাস আমাদের সকলেরই আলোচনীয়। যাঁহারা হিন্দু নহেন, তাঁহারাও এই ইতিহাসে শিক্ষণীয় অনেক কথা পাইবেন।

বাজী রাও।

প্রথম অধ্যায়।

জন্ম-ভূমি—পিতৃ-পরিচয়—জন্ম—শৈশবে বিপত্তি—দেশের অবস্থা।

মহারাষ্ট্র।

দক্ষিণ ভারতের যে অংশ মহারাষ্ট্র দেশ নামে পরিচিত, তাহার উত্তর দিকে সুরত (সুরাট) প্রদেশ ও সাতপুড়া (সাতপুরা) নামক শৈল-শ্রেণী, পশ্চিম দিকে আরব সমুদ্র, দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণা ও মলপ্রভা নদী এবং পূর্ব্বদিকে গোণ্ডবন (গণ্ডওয়ানা) ও তেলঙ্গণ (তেলিঙ্গানা) প্রদেশ অবস্থিত। মহারাষ্ট্র দেশের পরিমাণ প্রায় একলক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র বর্গমাইল। ইহা আয়তনে ইংলণ্ডদেশের দ্বিগুণ অপেক্ষাও বৃহত্তর। এই দেশের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটী। মহারাষ্ট্রদেশ সাধারণতঃ পর্ব্বত-বহুল ও অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর। এই কারণে এই দেশের লোকেরা দৃঢ়কায়, কষ্টসহিষ্ণু ও বলশালী। মহারাষ্ট্র দেশের জল-বায়ু ভারতবর্ষের অনেক স্থানের জলবায়ু অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সহ্য পর্ব্বত বা পশ্চিমঘাট নামক গিরি-শ্রেণীর উত্তরাংশ মহারাষ্ট্র দেশকে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সহ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশ কোঙ্কণ (দেশীয় ভাষায় কোঁকণ) নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রদেশের এক দিকে নিয়ত গর্জ্জনশীল, ঝটিকাবর্ত্তময় আরব সমুদ্র প্রসারিত ও অপর দিকে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ সহ্যাদ্রির শ্বাপদ-সঙ্কুল, সহস্র-শীর্ষ বিশাল দেহ বিরাজমান। কোঙ্কণ প্রদেশের দৈর্ঘ্য প্রায় চারিশত মাইল; কিন্তু উহার সর্ব্বাপেক্ষা আয়ত অংশের বিস্তার ৫০ মাইলেরও অধিক নহে। এই সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ড অধিকাংশ স্থলেই শৈলময় অরণ্য-শ্রেণীতে সমাবৃত। এখানকার অধিবাসীরা প্রকৃতি-দত্ত গুণে আত্ম-রক্ষায় কুশল, শ্রমশীল, সরলস্বভাব ও স্বল্প-সন্তুষ্ট।

কোঙ্কণ।

কোঙ্কণ প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে "জঞ্জীরা" নামে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপটী এক্ষণে কুলাবা (কোলাবা) জিলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইংরাজদের এদেশে রাজ্য-স্থাপনের পূর্ব্বে জঞ্জীরা দ্বীপ ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ আবিসীনীয় বা হাব্সীদের অধিকারভুক্ত ছিল। হাব্সীগণ দক্ষিণাপথে "সিদ্দি" নামে ও তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-অধিকৃত ভূমি-ভাগ অদ্যাপি "হাব্সান" নামে পরিচিত। হাব্সান প্রদেশের পরিমাণ ৩২৫ বর্গ মাইল ও উহার বর্ত্তমান রাজস্ব-সংক্রান্ত আয় বৎসরে সাড়ে

জঞ্জিরা।

তিন লক্ষ টাকা। আবিসীনীয়দিগের তদানীন্তন রাজধানী জঞ্জীরা দ্বীপে এক্ষণে ইংরাজের এক জন সহকারী (আসিষ্ট্যাণ্ট) পোলিটিক্যাল এজেণ্ট বাস করেন।

শ্রীবর্দ্ধন।

জঞ্জীরা দ্বীপের ১২ মাইল দক্ষিণে, বাণকোট নামক সাগর-প্রণালীর উত্তর তীরে, সাবিত্রী নদীর মোহানার নিকট "শ্রীবর্দ্ধন" নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামের লোক-সংখ্যা তিন সহস্রের অধিক নহে; তন্মধ্যে প্রায় এক সহস্র ব্রাহ্মণ। কোঙ্কণের অন্তর্গত অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই গ্রামেও আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কদলী ও সুপারি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানকার সুপারি অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া মহারাষ্ট্র দেশের সর্ব্বত্র বিশেষ আদৃত। প্রাচীনকালে এই গ্রাম বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

শ্রীবর্দ্ধন গ্রামে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে (খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে) একজন সদ্বংশজাত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম বিশ্বনাথ ভট্ট। তিনি গার্গ্য-গোত্রোৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জনার্দ্দন

আদি পুরুষ।

ভট্ট। তিনি জঞ্জীরার সিদ্দিদিগের অধীনতায় শ্রীবর্দ্ধন পরগণার দেশমুখ ও গ্রাম-লেখকের কার্য্য করিতেন। মহালের জমাবন্দীর কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণ ও পরগণার রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কার্য্যের ভার

তাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল। সে কালে রাজায় রাজায় বিবাদ ঘটিলে এই দেশমুখেরা যাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন, তাঁহার পক্ষে দেশ জয় করা সহজসাধ্য হইত। দেশমুখেরা বিরোধী হইলে রাজার পক্ষে খাজনা আদায় বা দেশ-শাসন অসম্ভব হইয়া উঠিত। শ্রীবর্দ্ধনের ভট্টবংশের হস্তে দেশমুখের কার্য্য ন্যস্ত থাকায় দেশে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ও মহারাষ্ট্রের রাজনীতিক ব্যাপারের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সম্বন্ধ ছিল।

বালাজী বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ ভট্ট চারিটি পুত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথম দুই পুত্রের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার তৃতীয় পুত্র জানোজী বা জনার্দ্দন ভট্ট পৈত্রিক পদের উত্তরাধিকারিরূপে শ্রীবর্দ্ধনে থাকিয়া দেশমুখের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। কনিষ্ঠ বালাজী (বল্লালজী) বিশেষ উদ্যমশীল ছিলেন। তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল ও ভ্রাতার গলগ্রহ না হইয়া অর্থোপার্জ্জনের স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করেন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে তিনি সিদ্দিদিগের অধীনতায় নিকটবর্ত্তী চিপ্‌লুণ তালুকের কর-সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন "মীঠ বন্দর" নামক স্থানের লবণের কারখানাগুলিও তাঁহার ইজারা ছিল। এজন্য তাঁহাকে প্রায়ই চিপ্‌লুণে থাকিতে হইত। এই বালাজী পরিশেষে "পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহারাষ্ট্র-

দেশে আত্ম-নামের সহিত পিতৃ-নাম সংযুক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত থাকায় বালাজীর নামের সঙ্গে তাঁহার পিতার "বিশ্বনাথ" নাম সাধারণতঃ একত্র লিখিত হইয়া থাকে। বালাজী বিশ্বনাথ স্বজন-সমাজে "বালাজী পন্ত" (১) নামে পরিচিত ছিলেন। বালাজী পন্তের ঔরসে, তদীয় গুণবতী ভার্য্যা রাধা বাঈর গর্ভে সম্ভবতঃ ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে বর্ণিতব্য ইতিহাসের নায়ক মহাবীর বাজী রাও বল্লালের জন্ম হয়।

বাজী রাও।

বাল্য জীবনে বিপত্তি অনেকেরই ভবিষ্য-জীবনের মহত্ত্ব সূচিত করিয়া থাকে। বাজী রাওয়ের জীবনেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বাল্য-দশায় তাঁহাকে বহুবার বিষম সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। তিনি চতুর্থ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিতে না করিতে তাঁহাকে বিপন্ন হইয়া পিতার সহিত স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, তদুপলক্ষে তাঁহার কারাবাসও ঘটিয়াছিল।

এই সময়ে সিদ্দি কাশিম খান জঞ্জীরা দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার শৌর্য্যে প্রীত হইয়া সম্রাট্ অওরঙ্গজেব তাঁহাকে মোগল

বিপৎপাত।

(১) এই 'পন্ত' শব্দ পণ্ডিত শব্দের অপভ্রংশ-জাত। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের নামের শেষে যেরূপ "ঠাকুর" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মহারাষ্ট্রে সেইরূপ "পন্ত" শব্দের প্রয়োগ সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়।

নৌ-সেনার অধিনায়ক করিয়াছিলেন। ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর সময় হইতেই সিদ্দি কাশিম মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কারণে মারাঠা সেনানায়কগণের সহিত তাঁহার প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত : হিন্দু প্রজাদিগের উপর অত্যাচারও নিতান্ত অল্প হইত না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান-সমূহের অধিকার লইয়া তদানান্তন মহারাষ্ট্রীয় নৌ-সেনার অধিপতি কাহ্নোজী আংগ্রের সহিত সিদ্দিগণের শত্রুতা চলিতেছিল। বাজী রাও যখন অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে প্রতিবেশী বালকগণের সহিত শৈশব-ক্রীড়ার আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাহ্নোজী আংগ্রে ও সিদ্দি কাসিমের বিবাদানল অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। কাহ্নোজী সিদ্দির কর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত করিয়া স্বদল-ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে, বালাজী বিশ্বনাথ গোপনে আংগ্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, এইরূপ সংবাদ সিদ্দি কাসিমের কর্ণগোচর হয়। এ রটনা যতদূর সত্য হউক, কাশিম তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শ্রীবর্দ্ধনের ভট্ট পরিবারকে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। প্রথমে বালাজীর অগ্রজ জানোজী ধৃত হন। সিদ্দি বিনা বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন। হতভাগ্য জানোজীকে একটা বস্তার মধ্যে পূরিয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করা হয়। (১৭০১ খৃষ্টাব্দ)

এই দুর্ঘটনায় অতিমাত্র ভীত হইয়া বাজী রাওয়ের পিতা

স্বদেশ-ত্যাগ।

আত্ম-রক্ষার জন্য সপরিবারে সিদ্দির অধিকার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বাণকোট-প্রণালীর দক্ষিণ-তীর-স্থিত 'ওয়েলাস' গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে হরি মহাদেব ভানু নামক এক সজ্জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বালাজীর সহিত তাঁহার পূর্ব্বপরিচয় ছিল। বালাজী ভবিষ্য-কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কোঙ্কণ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সহ্যাদ্রির পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত কোনও স্থানে গিয়া নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহার পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ। ভানু-পরিবারের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। বিশেষতঃ অত্যাচারী সিদ্দির রাজ্যে বাস করিতে তাঁহাদিগেরও অনিচ্ছা ছিল। এই কারণে তাঁহারাও বালাজী পক্ষের অনুবর্ত্তী হইলেন।

পথে বিপত্তি।

অতঃপর ভট্ট ও ভানু কিয়ৎ দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই সিদ্দির অনুচরগণের দ্বারা বালাজী ধৃত ও "অঞ্জনবেল" দুর্গে বন্দি-ভাবে প্রেরিত হন। অঞ্জনবেল দুর্গ প্রসিদ্ধ সুবর্ণ দুর্গের ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সিদ্দির আদেশে তাঁহাকে ঐ দুর্গে সপরিবারে ১৫ দিন বাস করিতে হয়। এই বিপৎকালে হরি মহাদেব ভানু ও তাঁহার উভয় সহোদর বহু যত্ন করিয়া অঞ্জনবেলের দুর্গপতিকে বশীভূত করেন। ফলে বালাজীর মুক্তিলাভ ঘটে।

তখন সহ্যাদ্রি উত্তীর্ণ হইয়া ভট্ট ও ভানু পুণার নিকটস্থিত 'সাসবড়' গ্রামের অম্বাজী ত্র্যম্বক পুরন্দরে (গ্রাণ্ট ডফের বর্ণিত আবাজীপন্ত পুরন্দরে) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অম্বাজী পন্ত তাঁহাদিগকে মহারাষ্ট্র দেশের তদানীন্তন রাজধানী সাতরা নগরীতে লইয়া গেলেন।

দেশের অবস্থা।

এই সময়ে পূর্ব্ব-মহারাষ্ট্রে ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল। শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্রাট্ অওরঙ্গজেব দ্বাদশ লক্ষ মোগল সেনা লইয়া মহারাষ্ট্র দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সাম্ভাজী মোগল আক্রমণে বাধা দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু বুদ্ধি-দোষে তাঁহাকে মোগলদিগের হস্তে প্রাণ-ত্যাগ করিতে হয়। তাঁহার স্ত্রী 'এসু বাঈ' (যশোদা বাঈ) ও পুত্র শাহু দিল্লীশ্বরের বন্দী হন। তখন শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মোগলদিগের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭০০ খৃঃ মহারাজ রাজারামের দেহাত্যয় ঘটিলে, তদীয় মহিষী তারা বাঈ মহারাষ্ট্র রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। মোগলেরা ভাবিয়াছিলেন, রাজারামের মৃত্যুতে মহারাষ্ট্রীয়েরা হতাশ হইয়া শান্তভাব ধারণ করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। তারা বাঈর উত্তেজনায় মহারাষ্ট্রীয়েরা মোগলদিগকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রাণ-পণে যুদ্ধ পরিচালন করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ শিবাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সাম্ভাজীকে মোগলেরা অতীব নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করায় মহারাষ্ট্র জাতির মনে যে বিষম উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা কাল ক্রমে হ্রাস পাওয়া দূরে থাকুক, অওরঙ্গজেবের ব্যবহারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। সাম্ভাজীর বিনাশে এবং বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা রাজ্যের বিলোপ-সাধনে সাফল্যলাভ করায় সম্রাট্ জয়োল্লাসে অতীব উৎফুল্ল হইয়া হিন্দুধর্ম্মীদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ধর্ম্মোন্মাদ এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, তিনি স্বীয় অধীন হিন্দু সৈনিকদিগেরও ধর্ম্ম-নাশে উদ্যত হইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ মহারাষ্ট্রদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু তাঁহার এইরূপ অবিবেচনা-প্রসূত কার্য্যে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ঘটিবার সম্ভাবনা হইল; হিন্দু সেনাদল বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠায় তাঁহাকে সে উদ্যম পরিত্যাগ করিতে হইল। সে যাহা হউক, প্রথমে মহারাজ শিবাজীর পুত্র সাম্ভাজীর নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা, ও তৎপরে মোগলদিগের হস্তে স্বধর্ম্মের নিগ্রহ-দর্শনে তেজস্বী মহারাষ্ট্রীয়গণের ক্রোধানল প্রবুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহাদিগের নরপতি রাজারাম তখন স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া মোগলদিগের ভয়ে মান্দ্রাজ অঞ্চলস্থিত "জিঞ্জি" দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, রায়গড় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দুর্গ-সমূহ মোগলদিগের হস্তগত হইয়াছিল, মহারাষ্ট্রীয়দিগের

স্বাধীনতার জন্য সমর।

মধ্যে সুশিক্ষিত সৈনিকের সংখ্যাও তখন অতি অল্প ছিল, সমাজে দুই চারি জন দেশ-বৈরীরও অভাব ছিল না। কিন্তু এই সকল প্রতিকূল ঘটনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া মহা-রাষ্ট্রীয়েরা মোগলদিগের হস্ত হইতে স্ব-ধর্ম্ম ও স্বরাজ্যের রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; ধর্ম্মোৎসাহে প্রমত্ত হইয়া প্রচণ্ড সাগর-তরঙ্গ-সদৃশ মোগল-সেনার গতিরোধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যিনি কোন রূপে এক খানি অস্ত্র-সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তিনি মোগলদিগের আক্রমণ-নিবারণে যত্ন-প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ভীষণ রণোন্মাদ দেখিয়া স্বয়ং মোগল সম্রাটেরও হৃদয়ে গভীর ভীতি ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছিল।

এইরূপে মারাঠারা স্ব-ধর্ম্মের ও স্বদেশের রক্ষার জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জনে কৃত-সঙ্কল্প হওয়ায় তাঁহাদিগের হস্তে নানা স্থানে বাদশাহী সৈন্যের পরাভব ঘটিতে লাগিল। দ্বাদশ লক্ষ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্যের সাহায্যে মুষ্টিমেয় মারাঠাগণের সহিত সপ্তদশ-বর্ষ-কাল অনবরত সংগ্রাম করিয়াও সম্রাট্ অওরঙ্গজেব জয়-লাভের কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না। এদিকে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বাবিংশ বৎসরের মধ্যে একে একে শিবাজী, সাম্ভাজী ও রাজারাম লোকান্তরিত হইলেন, তথাপি মারাঠাগণের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। যেরূপ—

"ছিন্নোঽপি রোহতি তরুশ্চন্দ্রঃ ক্ষীণোঽপি বর্দ্ধতে"

সেইরূপ উপর্য্যুপরি বিপৎপাত-সত্ত্বেও মারাঠাগণের অধ্যবসায় ও বিক্রম দিন দিন বাড়িতে লাগিল। অব্যবস্থিত যুদ্ধ-নীতি (Guerrila warfare) অনুসারে তাঁহাদিগের অকস্মাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাব, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় সমান উৎসাহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিশ্রামের প্রতি অমনোযোগ এবং দুর্ব্বার সমরোদ্যম প্রভৃতি দর্শনে মোগল সেনানীগণ বলিতে লাগিলেন,—"মরহট্টে লোগ আদমি নহি হ্যায়—একো ভূতখানা হ্যায়!" শুদ্ধ তাহাই নহে, মারাঠাগণের নামও মোগল তুরঙ্গদলের বিভীষিকা-স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কথিত আছে যে, মারাঠা দলপতিগণের নাম কর্ণগোচর হইলেও মোগলদিগের অশ্ব চমকিয়া জলপান পরিত্যাগ করিত, মহারাষ্ট্রীয় সেনানীর কালান্তক মূর্ত্তি কল্পনা-ক্ষেত্রে উদিত হইয়া তাহাদিগের হৃদয়ে বিষম ভীতির সঞ্চার করিত!

বালাজী যখন "সাসবড়ে" পদার্পণ করেন, তখন তারাবাঈর অমাত্য রামচন্দ্র পন্ত, প্রতিনিধি পরশুরাম ত্র্যম্বক, সচিব শঙ্করজী নারায়ণ ও সেনাপতি ধনাজী যাদব প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের বীর্য্যবিক্রমে সমগ্র দক্ষিণাপথ কম্পিত হইতেছিল। মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের রুদ্রমূর্ত্তি-দর্শনে ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন। কিন্তু মারাঠাদিগের বিক্রমে তাঁহাদিগের পক্ষে পলায়ন করাও অতীব বিঘ্নকর

হইয়া উঠিয়াছিল। মোগল-শাসিত প্রদেশে ক্রমশঃ মহা-রাষ্ট্র আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছিল। সুতরাং কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে এ সময়ে মহারাষ্ট্রদেশে কার্য্য-ক্ষেত্রের অভাব ছিল না। বালাজীও উদ্যমশীল ও কার্য্যকুশল ব্যক্তি ছিলেন। এই কারণে রাজধানী সাতারায় পদার্পণ করিবার অল্প দিবসের মধ্যেই তাঁহার রাজকার্য্যে প্রবেশ-লাভ ঘটিল।

কার্য্য-লাভ।

সাতারায় মহাদেব কৃষ্ণ জোশী নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার সহিত ভানুদিগের পরিচয় ছিল। এই জোশী মহোদয়ের চেষ্টায় বালাজী ও তাঁহার সহচরেরা তারা বাঈর প্রতিনিধি পরশুরাম ত্র্যম্বকের নিকট হইতে একটি তালুকের রাজস্ব আদায় করিবার ইজারা প্রাপ্ত হইলেন। সে কার্য্যে তাঁহা-দিগের দক্ষতা দেখিয়া রাজপ্রতিনিধি মহাশয় বালাজী ও অম্বাজীকে সেনাপতি ধনাজী (ধনঞ্জয়জী) যাদব রাওয়ের অধীনতায় রাজস্ব-বিভাগে কারকুনের পদে বার্ষিক শতমুদ্রা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। (১৭০৬) ভানু-ত্রিতয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ রামাজী (রামজী) মহাদেব সচিব শঙ্করজী নারায়ণের অধীনতায় কর্ম্ম পাইলেন। অবশিষ্ট দুইজন বালাজীর আশ্রয়েই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাল্য-শিক্ষা—নানা অভিযানে পিতার সাহচর্য্য—দিল্লী-গমন—পিতৃ-বিয়োগ।

বাল্য-শিক্ষা।

রাজধানী সাতারায় বাজী রাওয়ের শিক্ষারম্ভ হয়। কারঃকুনের পুত্র তৎকালে প্রচলিত লেখা পড়ায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে বর্ত্তমান কালের ন্যায় সেকালে লেখা পড়া শিক্ষাই বাল্য-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। বালকগণের মানসিক শক্তির বিকাশের দিকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ দৃষ্টি রাখিতেন, তাহাদের শারীরিক শক্তিসমূহের পরিস্ফূর্ত্তির দিকেও তাঁহাদিগের সেইরূপ যত্ন থাকিত। বরং পুস্তকগত বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিয়া পণ্ডিত উপাধি-লাভ অপেক্ষা পুরুষোচিত গুণ-গ্রাম লাভ করিবার দিকে তাঁহারা সমধিক মনোযোগ করিতেন। বিশেষতঃ বাজী রাও যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে এদেশে বীরত্বের বড় গৌরব ছিল। এই কারণে বালাজী বিশ্বনাথ স্বীয় পুত্রকে পুস্তক-লেখনী-গতা বিদ্যার সহিত অশ্বারোহণ ও অসি-ভল্ল-সঞ্চালনাদির কৌশলেও

অভিজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাতারার রাজকর্ম্মে প্রবেশ করিয়া বালাজী বিশ্বনাথকে প্রায় সমস্ত জীবনই যুদ্ধাভিযানে অতিবাহিত করিতে হয়। পুত্রকে সর্ব্বপ্রকার পৌরুষ-গুণে অলঙ্কৃত করিবার জন্য তিনি সকল অভিযানেই বাজী রাওকে আপনার সঙ্গে রাখিতেন। সুতরাং অল্প বয়সেই বাজী রাও শৌর্য্য-সাহসের আধার হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার সহিত সর্ব্বদা রাজসভায় গমন ও নানা দেশ ভ্রমণ করিবার সুযোগ পাওয়ায় রাষ্ট্র-সম্পর্কীয় সকল কার্য্যই তিনি অনায়াসে শিক্ষা করিতে সমর্থ হন। বালাজী বিশ্বনাথের অনুষ্ঠিত কার্য্য-কলাপের সহিত এই শিক্ষার ও বাজী রাওয়ের ভবিষ্য জীবনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এই কারণে আমাদিগকে তদ্‌বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

পদোন্নতি

যে সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ ধনাজী যাদবের অধীনতায় কর্ম্মলাভ করেন, সেই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া মোগলেরা সাম্ভাজীর পুত্র শাহুকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে শান্ত করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে দক্ষিণাপথের সরদেশমুখী (সমগ্র রাজস্বের দশমাংশ) স্বত্বের সনন্দও প্রদান করেন। শাহু স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় রাজ্যাংশ লইয়া তারা বাঈর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কিন্তু শাহুকে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধি-

কারী জানিয়া প্রধান সেনাপতি ধনাজী যাদব তাঁহার শত্রুতাচরণে বিরত হন। সুতরাং সহজেই তারা বাঈর পরাজয় ঘটিল। (১৭০৭ খৃঃ) এত দিন মহারাষ্ট্র রাজ্যে যে বিপ্লব চলিতেছিল, শাহু সিংহাসনে আরোহণ করিলে, তাহার কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হইল। সুতরাং বালাজী বিশ্বনাথ রাজস্ববিভাগের কার্য্যে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিবার অবকাশ পাইলেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা-গুণে অল্প দিবসের মধ্যেই রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্যের বিশেষ সুব্যবস্থা সম্পাদিত হইল। তিনি কৃষিকার্য্যে উৎসাহদান-পূর্ব্বক কৃষকদিগের উন্নতির পথ উন্মুক্ত ও রাজ্যের আয়-বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার এইরূপ কার্য্য-দক্ষতার পরিচয় পাইয়া সেনাপতি যাদব রাও তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইলেন। মহারাজ শাহুর নিকটেও বালাজী বিশ্বনাথের কার্য্য-তৎপরতার কথা অবিদিত রহিল না। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ধনাজী যাদবের মৃত্যু হইলে মহারাজ শাহু রাজস্ব-বিভাগের সমস্ত ভার বালাজী বিশ্বনাথের উপর অর্পণ করিলেন। যাদব রাওয়ের পুত্র চন্দ্রসেনের হস্তে কেবল সামরিক বিভাগের ভার রহিল। পরন্তু বালাজীর উপর সেনাপতি চন্দ্রসেনের আর কর্ত্তৃত্বও রহিল না। এই ঘটনায় বালাজীর প্রতি চন্দ্রসেনের বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। তদবধি তিনি এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

১৭১১ খৃষ্টাব্দে একদিন মৃগয়া-প্রসঙ্গে বালাজীর অধীন কোনও অশ্বারোহীর হস্তে দৈবক্রমে চন্দ্রসেনের জনৈক ভৃত্য আহত হয়। এতদুপলক্ষে বালাজী বিশ্বনাথকে বিপন্ন করিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়া সেনাপতি স্বীয় সৈন্যদলসহ সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করেন। বালাজীর সঙ্গে জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজী রাও, কনিষ্ঠ পুত্র চিমণাজী আপ্পা, বন্ধু অম্বাজী পন্ত পুরন্দরে এবং অতি স্বল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তাঁহাদিগের সহিত পলায়নপূর্ব্বক তিনি প্রথমে সাসবড় গ্রামে ও পরে তথা হইতে পুরন্দর-দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তত্রত্য প্রধান কর্ম্মচারী ইচ্ছা-সত্ত্বেও সেনাপতির ভয়ে বালাজীকে আশ্রয়দান করিতে পারিলেন না। সুতরাং সেনাপতির সৈন্যদল কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বালাজী বিশ্বনাথ "পাণ্ডবগড়" নামক একটি নিকটবর্ত্তী গিরিদুর্গের অভিমুখে আশ্রয়ার্থ অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদিগের বহু চেষ্টায় পথিমধ্যে পাঁচ ছয় শত সমর-কুশল ব্যক্তি সংগৃহীত হয়। তাহাদিগের সাহায্যে বালাজী সাহসপূর্ব্বক নীরা নদীর তীরে চন্দ্রসেনের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু সৈন্যসংখ্যার অল্পতাপ্রযুক্ত তাঁহাকে পরাজয়-স্বীকার-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পলায়ন করিতে হইল। চন্দ্রসেনও তাঁহার অনুসরণে ক্ষান্ত হইলেন না।

সেনাপতির বৈরিতা।

বহুকষ্টে বালাজী পাণ্ডবগড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেনাপতির সৈন্যদল কর্ত্তৃক ঐ দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। এদিকে মহারাজ শাহু স্বীয় কার্য্যদক্ষ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর এই বিপদ্‌বার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহাকে অভয়-পত্র প্রেরণ-পূর্ব্বক সেনাপতিকে সাতারায় আহ্বান করিলেন। বালাজীর প্রতি মহারাজের বিশেষ প্রীতি-দর্শনে চন্দ্রসেন অতীব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি আর সে বিরাগ গোপন করিতে না পারিয়া মহারাজ শাহুকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "বালাজীকে আমার হস্তে সমর্পণ না করিলে আমি শত্রুপক্ষের সহিত মিলিত হইব।" সেনাপতির এইরূপ ঔদ্ধত্য-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া শাহু তাঁহার দমনের জন্য সরলস্কর হয়বৎ রাও নিম্বালকরকে প্রেরণ করিলেন। নিম্বালকরের সহিত যুদ্ধে চন্দ্রসেনের পরাজয় ঘটে। পরান্ত সেনাপতি প্রথমে তারা বাঈর ও পরে মোগল সুভেদ্দার নিজাম-উল্-মুল্কের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বালাজী বিশ্বনাথ সেই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া পুত্রদ্বয়সহ সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

সেনাকর্ত্তা।

এদিকে প্রধান সেনাপতি শত্রুপক্ষ অবলম্বন করায় মহারাজ শাহুর সৈন্যসংখ্যা কমিয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া তারা বাঈ চন্দ্রসেনের সাহায্যে নানা উপায়ে শাহুর অপর সর্দ্দারগণকে স্বপক্ষ-ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ স্বীয় অপূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশ না করিলে শাহুকে বিপন্ন

হইতে হইত। বালাজীর বুদ্ধি-কৌশলে শাহুর সর্দ্দারগণ তারা বাঈর দলে মিলিত হইতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি বহু সংখ্যক নূতন সৈন্যসংগ্রহ করিয়া শাহুর সৈন্যাভাব দূর করিলেন। এই কারণে মহারাজ শাহু তাঁহাকে ১৭১১ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট "সেনাকর্ত্তা" এই গৌরব-সূচক উপাধি প্রদান করিলেন। (১)

বালাজী ইতঃপূর্ব্বে দেশের কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি-সাধনের উপায় অবলম্বন ও রাজস্ব-বিভাগে সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেশের মঙ্গলের জন্য রাজ্যের অপরাপর বিশৃঙ্খলার নিবারণে তিনি মনোযোগী হইলেন। এই

অরাজকতা।

সময়ে মহারাষ্ট্র রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা অতীব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শাহুর সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তারাবাঈ স্বীয় পুত্রকে ছত্রপতি বলিয়া ঘোষণা-পূর্ব্বক কোহ্লাপুরে এক নূতন রাজধানীর স্থাপন করিয়াছিলেন। কাজেই মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের মধ্যে কেহ শাহুর পক্ষ, কেহ বা কোহ্লাপুরাধিপতি সাম্ভাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেহ বা মোগলগণের দলেও মিলিত হইয়াছিলেন। আবার

(১) গ্রাণ্ট ডফ্ "সেনাকর্ত্তা" শব্দের অর্থ Agent in charge of the army করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। "সেনাকর্ত্তা" অর্থে "সৈন্যদলের সংগঠন-কর্ত্তা" হওয়াই উচিত। ডফ সাহেব এই ঘটনাকে ১৭১৩ খৃঃ অব্দের ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

কেহ কেহ কোনও পক্ষাবলম্বী না হইয়া স্ব-প্রধান ও স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ, মোগল সেনার সহিত স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের মস্তিষ্কে স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর ভ্রম-পূর্ণ সংস্কার-সমূহ স্থান-লাভ করিয়াছিল, প্রায় বিংশতিবর্ষকাল একরূপ নেতৃ-বিহীন অবস্থায় মোগল-দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা স্বভুজ-বলে যে স্বাধীনতা-লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আংশিক ভাবেও পরিত্যাগ করিয়া কাহারও অধীনতা স্বীকার করা তাঁহাদিগের নিকট ঘোর অপমানজনক বলিয়া মনে হইতেছিল মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যশ্লোক শিবাজীর বংশধরেরও নিকট মস্তক অবনত করিতে তাঁহাদিগের চিত্তে দ্বিধা উপস্থিত হইতেছিল। তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা এত দুর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাঁহারা মহারাজ শাহুরও প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশ করিয়া নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ হইতে বল-পূর্ব্বক চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিতেছিলেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর সর্দ্দারগণের মধ্যে দামাজী (দামোদরজী) থোরাত ও উদাজী (উদয়জী) চৌহানই প্রধান ছিলেন। উদাজীর উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শাহু তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের একাংশের চৌথ আদায়ের স্বত্ব প্রদান করিতে বাধ্য হন। কাহ্নোজী আংগ্রে কোহ্লাপুরপতি সাম্ভাজীর পক্ষাবলম্বন করিয়া শাহুর অধিকৃত কল্যাণ প্রদেশ জয় করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। অপর দিকে কৃষ্ণ রাও খটাওকর নামক

রাজা উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যমধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ মরাঠা-সামন্ত শাহুর অধীনতা স্বীকার করিতেন না।

কৃষ্ণরাওয়ের দমন।

এই সকল অরাজকতার দমন ভিন্ন স্বদেশবাসী প্রজা-পুঞ্জের সুখ স্বচ্ছন্দতা-বিধান করা সম্ভবপর ছিল না। কাজেই মহারাজ শাহুর অনুমতি লইয়া বালাজী বিশ্বনাথ প্রথমে কৃষ্ণ রাও থটাও-করের দমন করিতে যাত্রা করিলেন। সেই সময়েই সচিব নারায়ণ-শঙ্কর দামাজী থোরাতের বিরুদ্ধে এবং পেশওয়ে ভৈরব পন্ত পিঙ্গলে কাহ্নোজী আংগ্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। ইঁহাদিগের মধ্যে বালাজী বিশ্বনাথই এ যাত্রায় সফলতা-লাভ করিয়াছিলেন। আউন্ধ নামক স্থানের নিকটে তিনি বিদ্রোহী থটাওকরকে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে পরাভূত করেন। থোরাতের সহিত যুদ্ধে নারায়ণ-শঙ্কর ও আংগ্রের সহিত যুদ্ধে ভৈরবপন্ত পরাজিত হইয়া বন্দী হন। আংগ্রে কেবল ভৈরব পন্তকে বন্দী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি লৌহগড় ও রাজ-মাচী প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া শাহুর রাজধানী সাতারা নগরী আক্রমণেরও উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

আংগ্রের সহিত সন্ধি।

তখন বালাজী-বিশ্বনাথকে আংগ্রের দমনের ভার গ্রহণ করিতে হইল। তিনি বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ আংগ্রের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া

লৌহগড় প্রভৃতি দুর্গ অধিকার ও শত্রু-সৈন্যের পরাজয়-সাধন করিলেন। অতঃপর তিনি কাহ্নোজীকে, সন্ধি করিয়া মহারাষ্ট্র-রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী শাহুর শরণাপন্ন হইবার জন্য বিবিধযুক্তিপূর্ণ একখানি পত্র লিখিলেন। বালাজীর এই সামনীতি সুফল-প্রদ হইল। আংগ্রে কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শাহুর পক্ষাবলম্বন করিলেন। তখন বালাজীর মধ্যস্থতায় যে সন্ধি স্থাপিত হইল, তাহার ফলে পেশওয়ে ভৈরব পন্ত কারামুক্ত হইলেন, আংগ্রে শাহুর যে সমস্ত দুর্গ বল-পূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন, "রাজমাচী" ব্যতীত তৎসমস্তই তিনি প্রত্যর্পণ করিলেন। এই সন্ধির বিনিময়ে আংগ্রেও শাহুর নিকট দশটী সুদৃঢ় দুর্গ, ১৬টী সামান্য দুর্গ এবং শাহুর পক্ষে মহারাষ্ট্র-রণতরি-সমূহের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত কাহ্নোজীকে "সর্খেল" উপাধিও প্রদত্ত হইল।

এইরূপে পেশওয়ে ভৈরব পন্তের উদ্ধারসাধন ও আংগ্রের সহিত সন্ধি-স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বালাজী পন্ত ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মহারাষ্ট্র-রাজধানী সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহারাজ শাহু তাঁহার এই সকল কার্য্য-পরম্পরায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিলেন। ভৈরব পন্ত পিঙ্গলে আংগ্রের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন বলিয়া ও

পেশওয়ে পদলাভ।

তাঁহার কার্য্য-দক্ষতার অভাব-দর্শনে মহারাজ শাহু তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার কার্য্য-কুশলতার পুরস্কারস্বরূপ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নবেম্বর তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। "শ্রীমন্ত" উপাধি এই সময়েই পেশওয়েগণের নামের সহিত প্রথম সংযুক্ত হইল। তদনুসারে বালাজী সরকারী কাগজপত্রে "শ্রীমন্ত বালাজী বিশ্বনাথ পন্ত (পণ্ডিত) প্রধান" এই নামে উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার রাজমুদ্রা এইরূপ ছিল,—

"শাহু নরপতি হর্ষ-নিধান।
বালাজী বিশ্বনাথ মুখ্য প্রধান।" (১)

বালাজী বিশ্বনাথকে পেশওয়ে-পদ প্রদানকালে তদীয় বন্ধু অম্বাজী পন্ত পুরন্দরকে তাঁহার মুতালিক বা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। বালাজীর অনুরোধে মহারাজ শাহু হরি মহাদেব ভানুকে পেশওয়ের অধীন ফড়নবীশের (Audit) কার্য্যে

---

(১) পেশওয়েদিগের রাজমুদ্রায় এইরূপ উণ্টা "ন" লিখিবার কারণ এই,—পূর্ব্বে শিবাজীর সময় হইতে পিঙ্গলে-বংশীয় পুরুষেরা পেশ-ওয়ে-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ শাহু পিঙ্গলে-বংশের হস্ত হইতে পেশওয়ে পদের অধিকার "ভট্ট" বংশের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই বংশান্তরের চিহ্নরূপে "প্রধান" শব্দের নকার বিপরীত ভাবে লিখিবার প্রথা শাহু কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়।

অনেকে বালাজী বিশ্বনাথকেই প্রথম পেশওয়ে বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ তাহা নহে, বালাজী মহারাষ্ট্র-রাজ্যের প্রথম পেশওয়ে নহেন। তিনি ভট্টবংশীয় পেশওয়েগণেরই প্রথম।

নিযুক্ত করেন। এইরূপে যে বালাজী বিশ্বনাথ দশ বৎসর পূর্ব্বে সিদ্দিদিগের ভয়ে স্বদেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ও সাতারায় আসিয়া বার্ষিক এক শত মুদ্রা বেতনে সামান্য কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ-লাভ করিয়া স্বীয় বন্ধু-দিগকেও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

সিদ্দির পরাজয়।

শাহুর সহিত সন্ধির বলে আংগ্রে যে সকল দুর্গ পাইয়াছিলেন, শ্রীবর্দ্ধন প্রভৃতি কতিপয় স্থান তাহার অন্তর্গত ছিল। সিদ্দিগণের নিকট হইতে ঐ সকল স্থানের উদ্ধার-সাধনের জন্য কাহ্নোজী পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। বালাজীর সহায়তায় কাহ্নোজীর হস্তে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সিদ্দিগণের পরাজয় ঘটে।

থোরাতের হস্তে বন্দী।

এক্ষণে দামাজী থোরাতের দমন আবশ্যক হইয়া উঠিল। কারণ, তিনি কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া শাহুর রাজ্যে লুণ্ঠনাদি করিতেন। তিনি পুণার ৪০ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত "হিঙ্গন" গ্রামের সুদৃঢ় ক্ষুদ্র দুর্গের অধিপতি ছিলেন। হিঙ্গনদুর্গের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় বিংশতি ক্রোশ-ব্যাপী প্রদেশ থোরাতের শাসনে ছিল। বালাজীর সমরায়োজন দেখিয়া দামাজী কপটতা-পূর্ব্বক সন্ধিপ্রার্থী হইলেন এবং বিল্বপত্র ও

হরিদ্রাস্পর্শপূর্ব্বক বশ্যতা-স্বীকারের শপথ করিয়া তাঁহাকে দুর্গ সমর্পণ করিলেন। কিন্তু বালাজী সদলে দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দুষ্ট থোরাত তাঁহাদিগকে বন্দী করিল। (১৭১৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর) অন্যান্য অভিযানের ন্যায় এই অভিযানেও কিশোরবয়স্ক বাজী রাও ও তৎকনিষ্ঠ চিমণাজী আপ্পা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক থোরাত তাঁহাদিগের নিস্ক্রয়-স্বরূপ বহু অর্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাঁহারা ক্ষুধায় কাতর হইলে পাপিষ্ঠ তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সম্মুখে একটি করিয়া উত্তপ্ত ভস্মপূর্ণ কবল-পাত্র (তোবরা) রাখিয়া দিল। মহারাষ্ট্রপতি শাহু বালাজী বিশ্বনাথের মুক্তির জন্য থোরাতের প্রার্থিত অর্থ দান করিতে বাধ্য হইলেন।

থোরাতের দমন।

সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বালাজী সেনাপতি মানসিংহ মোরে ও সর-লস্কর হয়বৎ রাও নিম্বাল-করের সহযোগে দামাজীর বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার অভিযান করিলেন। সচিব নারায়ণ-শঙ্কর থোরাতের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। অতএব দামাজীর বিরুদ্ধে সহসা যুদ্ধযাত্রা করিলে পাছে সেই দুর্বৃত্ত সচিবকে নিহত করে, এই ভয়ে বালাজী বিশ্বনাথ প্রথমে তাহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত না হইয়া নিস্ক্রয়-প্রদান-পূর্ব্বক সচিবকে মুক্ত করিলেন। সচিব অক্ষত শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে থোরাতের গড় আক্রান্ত হইল। বালাজীর তোপে গড় ভূমিসাৎ ও দামাজী বন্দী

হইয়া ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে সাতারায় নীত হইল। এইরূপ কার্য্য-দক্ষতাগুণে মহারাজ শাহুর দরবারে বালাজী বিশ্বনাথই সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত রাজ্যের প্রায় কোনও কার্য্য সংসাধিত হইত না।

দিল্লীর সংবাদ।

এই সময়ে উত্তর-ভারতে দিল্লীর দরবারে এক ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। অওরঙ্গজেবের প্রপৌত্র ফরুখ্‌শিয়র দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। সৈয়দ আব্দুল খান ও সৈয়দ হুসেন আলী খান নামক দুইজন সর্দ্দারের হস্তে তাঁহাকে অনেকটা ক্রীড়া-কন্দুকবৎ থাকিতে হইত। এই কারণে তিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ সৈয়দ-যুগলের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছিলেন। এদিকে দক্ষিণ ভারতের সমস্ত বাদশাহী প্রদেশে চৌথ-পদ্ধতি-প্রবর্ত্তনের অধিকার পাইবার জন্য মহারাষ্ট্রীয়েরা ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বালাজী বিশ্বনাথ যখন অন্তর্ব্বিগ্রহের নিবারণে সময়ক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে খণ্ডে রাও দাভাড়ে ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়কদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে সুভেদার সৈয়দ হুসেন আলী জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপ উভয় সঙ্কটে পতিত হওয়ায় সৈয়দেরা মহারাজ শাহুর সহিত সন্ধি করিয়া দক্ষিণাপথে শান্তি-স্থাপন ও আপনাদের বল-বৃদ্ধি করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু বাদশাহ মহারাষ্ট্রীয়-

দিগকে চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব দিতে সম্মত হইলেন না। এই মতভেদ উপলক্ষে পরিশেষে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সৈয়দের সহিত বাদশাহের প্রকাশ্য যুদ্ধের সূচনা হইল। তখন সৈয়দ হুসেন আলী মহারাজ শাহুর নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মহারাষ্ট্রপতি যদি এই সময়ে তাঁহাকে ১৫ সহস্র সৈন্য দানে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি বাদশাহের দ্বারা মহারাজ শাহুকে নর্ম্মদার দক্ষিণস্থিত সমস্ত মোগল রাজ্যে চৌথ ও সরদেশমুখী প্রবর্ত্তন করিবার সনন্দ প্রদান করাইবেন। তদ্ভিন্ন ঐ সৈন্যের ব্যয়-ভার মাসিক ১৫ লক্ষ টাকা বহন করিতেও তিনি প্রস্তুত হইলেন।

এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় মহারাষ্ট্র-রাজ্যে অন্তর্ব্বিগ্রহের পরিসমাপ্তি হইয়া সর্ব্বত্র শাহুর একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। কাজেই সৈয়দ-যুগলকে সৈন্য-সাহায্য করা এ সময়ে মহারাষ্ট্রপতির পক্ষে দুঃসাধ্য হইল না। তখন

সন্ধির সর্ত্ত।

বালাজী বিশ্বনাথ এই সহায়তার পুরস্কার-স্বরূপ মহারাজ শাহুর পক্ষ হইতে দিল্লীশ্বরের মন্ত্রীর নিকট নিম্নলিখিত স্বত্বগুলি প্রার্থনা করিলেন,—

১। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর উপার্জ্জিত স্বরাজ্যের সম্পূর্ণ উপস্বত্ব যাহাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা নির্ব্বিরোধে ভোগ করিতে পারেন, তাহার সনন্দ। (এই সনন্দ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত দীর্ঘকাল-ব্যাপী সমরে পরাস্ত হইয়া শাহুকে মুক্তিদানের সময়ে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া-

ছিল। কিন্তু দক্ষিণাপথের সুভেদার নিজাম-উল-মুল্ক তাহাতে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্যের অনেক স্থান পুনঃপুনঃ অধিকার করিবার চেষ্টা করায় শাহুকে নূতন বাদশাহের নিকট হইতে নূতন সনন্দ গ্রহণের প্রস্তাব করিতে হয়।)

২। দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিজাপুর, হায়দরাবাদ, কর্ণাটক, তঞ্জোর ত্রিচিনপল্লী ও মহীসুর এই ছয়টী বাদশাহী প্রদেশে চৌথ পদ্ধতি প্রবর্ত্তন ও সরদেশমুখী (রাজ্যের মোট আয়ের দশমাংশ) আদায় করিবার স্বত্ব মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদান।

৩। মহাত্মা শিবাজীর জন্মস্থান শিবনেরী দুর্গ ও ত্রিম্বক (ত্র্যম্বক) দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রত্যর্পণ।

৪। শাহুর মহারাষ্ট্রে আগমন-কালে তাঁহার জননী ও অপর আত্মীয়-গণ তদীয় প্রতিভূরূপে দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের অনুমতি-প্রদান।

৫। গোণ্ডবন ও বেরারের যে সকল প্রদেশ "সেনা সাহেব সুভে" কাহ্নোজী ভোঁস্‌লে কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, সেগুলি মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্য-ভুক্ত করিবার আদেশ-দান।

৬। মহাত্মা শিবাজী ও তাঁহার পিতা শাহজীর চেষ্টায় কর্ণাটকের যে সকল অংশ অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা মারাঠাদিগকে প্রত্যর্পণ।

৭। খানদেশে যে সকল স্থানে শিবাজীর অধিকার ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত পণ্ঢরপুর প্রভৃতি প্রদেশ-দান।

বাদসাহ এই সকল স্বত্ব-প্রদান করিলে মহারাষ্ট্র-পতি শাহু নিম্ন লিখিত সর্ত্ত পালনে স্বীকৃত হইবেন বলিয়া বালাজী অঙ্গীকার করেন :—

১। ছত্রপতি মহারাজ শাহু দিল্লীশ্বরের সম্মান রক্ষার জন্য দশলক্ষ টাকা উপঢৌকন প্রদান করিবেন।

২। সরদেশমুখী স্বত্ব-লাভের প্রতিদানে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দেশের শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী হইতে হইবে। যে সকল প্রদেশ হইতে তাঁহারা সরদেশমুখী আদায় করিবেন, সেই সকল প্রদেশে দস্যু-তস্করের উপদ্রব ঘটিলে তাঁহাদিগকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে।

৩। চৌথ আদায়ের স্বত্বের বিনিময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ১৫ সহস্র সৈন্যসহ বাদশাহের সহায়তা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যখন যে কোনও স্থানে প্রয়োজন হইবে, তখন সেই স্থানেই বাদশাহী সুভেদারকে ১৫ সহস্র সৈন্য-সাহায্য প্রদান করিতে হইবে।

৪। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজী ও তাঁহার পক্ষীয় সর্দ্দারগণ কর্ণাটক, বিজাপুর ও হায়দারাবাদ প্রভৃতি বাদশাহী প্রদেশে উপদ্রব অত্যাচার করিলে মহারাজ শাহুকে তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। এমন কি, সাম্ভাজীর অত্যাচারে বাদশাহী প্রজার ক্ষতি ঘটিলেও মহারাজ শাহু তাহার পরিপূরণ করিয়া দিতে বাধ্য হইবেন।

দিল্লী-যাত্রা।

হুসেন আলী এই সকল সর্ত্তের প্রায় সকলগুলিতেই সম্মতি-দান করিতে স্বীকৃত হইলে মহারাজ শাহু সেনাপতি মান সিংহ মোরে, পরসোজী ভোঁসলে, সন্তাজী ভোঁসলে, বিশ্বাস রাও পবার প্রভৃতি সেনানীদিগকে ১৫ সহস্র সেনা লইয়া সৈয়দের সাহায্যার্থ দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিবার আদেশ করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের উপর এই সমস্ত সেনানীর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল। বালাজী বিশ্বনাথের দিল্লী-গমন-কালে মহা-

রাজা শাহু তাঁহাকে বাদশাহের নিকট হইতে দৌলতাবাদ ও চাঁদা দুর্গ এবং গুজরাথ ও মালব-প্রদেশে চৌথ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিবার স্বত্ব-গ্রহণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই মহারাষ্ট্র সেনা ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সাতরা ত্যাগ করিয়া দিল্লী যাত্রা করিল। যুবক বাজী রাও-ও পিতার সহিত মোগল রাজধানী দর্শনার্থ গমন করিলেন।

মহারাষ্ট্র-সেনা দিল্লীতে উপস্থিত হইলে দিল্লীর গোলযোগ বাড়িয়া উঠিল। সেই বিপ্লবে ফরুখ্‌শিয়র নিহত এবং মহম্মদ শাহ সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। সৈয়দেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে চৌথের সনন্দ দান করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় দিল্লীবাসীরা তাঁহাদিগের প্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মারাঠাদিগের উপরও তাঁহাদের ক্রোধের উদয় হইয়াছিল। একদিন বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দ-গণের সহিত বাদশাহের দরবারে গমন করিলে দিল্লীবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া মারাঠাদিগকে আক্রমণ করে। এই দুর্ঘটনায় সন্তাজী ভোঁসলে, বালাজী মহাদেব ভানু ও প্রায় ১৫ শত মারাঠার জীবন বিনষ্ট হয়। কিন্তু সৈয়দ অর্থদানে যথাসাধ্য তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণ করিলেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ হুসেন আলী নূতন বাদশাহের মুদ্রাঙ্কিত একটী সনন্দ দ্বারা মারাঠাগণকে তাঁহাদিগের স্ব-রাজ্যের সম্পূর্ণ স্বত্ব, এবং দক্ষিণাপথে চৌথ-প্রবর্ত্তন ও সরদেশমুখী স্বত্ব আদায় করিবার

সনন্দ লাভ।

অধিকার প্রদান করিলেন। মহারাজ শাহুর জননী ও অপর আত্মীয়গণও এই সময়ে মুক্তিলাভ করেন। দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে চৌথ, সরদেশমুখী ও স্বরাজ্যের (১) সনন্দ লাভ করায় তদানীন্তন ভারতবাসীর নিকট মহারাষ্ট্র শক্তি ন্যায়-সঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচিত হইল (২)।

শাহুর পক্ষ হইতে বালাজী বিশ্বনাথের প্রার্থিত যে সমস্ত অধিকার সৈয়দেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদান করিলেন না, তাহারও এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক। সেগুলি এই,—

(১) খানদেশের মধ্যে যে সকল দুর্গে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকার ছিল, তাহা।

(২) ত্রিম্বক দুর্গ ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ।

(৩) তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণস্থিত যে সকল প্রদেশ মারাঠারা জয় করিয়াছিলেন, তাহা।

---

(১) স্বরাজ্য—ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর অধিকৃত প্রদেশগুলি মহারাষ্ট্র দেশে "স্বরাজ্য" নামে পরিচিত। স্ব-রাজ্য বলিলে প্রধানতঃ পুণা, সুপা, ইন্দাপুর, ওয়াই, তারলে, সাতারা, কহ্লাড়, খটাও, মাণ, ফলটন, মলকাপুর, পহ্লালা, অম্বেরা, জুন্নর, কোহ্লাপুর, কোঙ্কণ, এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তর অংশস্থিত কোপল, গদক ও হল্যাল পরগণা—এই সমস্ত ভূভাগ বুঝায়।

(২) This acquisition gained to the Maratha power that legitimacy, in the absence of which it is not possible to distinguish power from force.

Justice M. G. Ranade's "*Rise of the Maratha Power.*"

(৪) তদ্ভিন্ন সেনাসাহেব সুভে কাহ্নোজী ভোঁস্লে বেরার অঞ্চলে যে সকল প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা স্বরাজ্য-ভুক্ত করিয়া দিতেও সৈয়দ হুসেন আলী অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

(৫) গুজরাথ ও মালব প্রদেশে চৌথ-প্রবর্ত্তনের অধিকার তাঁহারা মারাঠাগণকে সময়ান্তরে প্রদান করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ সেই সনন্দ আদায় করিবার জন্য দেব রাও হিঙ্গণে নামক জনৈক সুচতুর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে দিল্লীতে দূত-স্বরূপে রাখিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পথিমধ্যে জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, প্রভৃতি স্থানের রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বালাজী শাহুর সহিত তাঁহাদিগের মিত্রতা-সূচক সন্ধি স্থাপন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়েরা (১৭১৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি) দুই মাস দিল্লীতে ছিলেন। যমুনার দক্ষিণ তীরে তাঁহাদিগের শিবির ছিল। তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের ক্ষেত্রস্থ শস্য যাহাতে সৈনিকেরা বিনষ্ট না করে, সে বিষয়ে যথোচিত উপায় অবলম্বন করিবার জন্য বালাজী বিশ্বনাথ সামরিক কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ সর্দ্দার মহ্লার রাও হোলকর তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া একদা স্ব-দলস্থ

বাজী রাওয়ের অবজ্ঞা।

অশ্বাদির জন্য কোন কৃষকের ক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক শস্য-সংগ্রহ করেন। অল্প ক্ষণের মধ্যেই, মহারাষ্ট্রীয় সেনা ক্ষেত্র-স্থিত শস্য বিলুণ্ঠন করিয়াছে, এই মর্ম্মে পেশওয়ের নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইল। তখন বাজী রাও প্রকৃত অপরা-ধীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিবিরস্থিত প্রত্যেক অশ্বশালার পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে, মহ্লার রাওয়ের অশ্ব-দলের সম্মুখে সদ্যশ্ছেদিত শস্যরাশি দেখিতে পাইলেন। সুতরাং অশ্বরক্ষক অনুচরকে অপরাধী জানিয়া বাজী রাও হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা তাহাকে প্রহার করেন। অদূরবর্ত্তী মহ্লার রাও তদ্দর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাজী রাওয়ের প্রতি লোষ্ট্র-নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাঁহাকে অবজ্ঞাত করিলেন। বলা বাহুল্য, মহ্লার রাও তখনও পেশওয়ের বেতনভোগী সর্দ্দারের শ্রেণীভুক্ত হন নাই। তিনি কেবল তাঁহার সহকারি-রূপে সদলে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অনুশাসনে অনুরাগ।

সেই সময়ে বাজী রাও সাধারণ যুবজনের ন্যায় ধৈর্য্যচ্যুত হইলে মহ্লার রাওয়ের সহিত তৎক্ষণাৎ তাঁহার দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হইত। কিন্তু তিনি ক্ষমা-প্রকাশ-পূর্ব্বক নীরবে আপনার শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এবং, বিদেশে—মিত্র-রাজ্যে, মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকগণ সামরিক অনুশাসনে উপেক্ষা করত এইরূপ যথেচ্ছাচার করিলে তাহার পরিণাম কিরূপ অনিষ্টকর হইতে পারে,

পিতাকে তদ্বিষয়ে চিন্তা-পূর্ব্বক ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎশ্রবণে বালাজী বিশ্বনাথ প্রথমতঃ মহ্লার রাওয়ের সর্ব্বস্ব-হরণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে অপর কয়েকজন সামরিক কর্ম্মচারীর অনুরোধে তিনি মহ্লার রাওয়ের অপরাধের মার্জ্জনা করিলেন।

প্রাণ-সঙ্কটে মৈত্রী।

এই ঘটনায় বাজী রাওয়ের প্রতি মহ্লার রাও জাতক্রোধ হইলেন এবং তাঁহাকে বিপন্ন করিবার অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি এক দিন পথিমধ্যে বাজী রাওকে একাকী ও নিরস্ত্র দেখিতে পান। তৎক্ষণাৎ তাঁহার জিঘাংসা উদ্দীপিত হইয়া উঠে। তিনি সহসা বাজী রাওকে আক্রমণ ও তাঁহার বক্ষঃস্থলে স্বীয় ভীষণ ভল্ল স্থাপন করত বলিলেন, "এক্ষণে আমি তোমার প্রাণহরণ করিলে, কে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে?" এই আকস্মিক বিপৎপাতে বাজী রাও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক বলিলেন, "আমার হস্তে তরবারি থাকিলে আমি এ কথার উপযুক্ত উত্তর দিতে পারিতাম। যাহা হউক, অভি-যানকালে আমি তোমার সাহস ও সমরকৌশল দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি আক্রোশ ত্যাগ করিয়া আমার সহিত মিত্রতা স্থাপন কর।" এই কথায় মহ্লার রাও

শান্তভাব ধারণ করিলেন। তদবধি এই উভয় বীরের মধ্যে যে অকৃত্রিম প্রণয়ের সঞ্চার হইল, তাহা আজীবন ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

দিল্লী হইতে সনন্দ লইয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৯ খৃঃ ৪ঠা জুলাই সাতারায় উপস্থিত হইলেন।

রাজ-সম্মান।

মহারাজ শাহু তাঁহার বিজয়ী পেশওয়ের সম্মানার্থ মহাসমারোহ সহকারে স্বয়ং প্রত্যুদ্‌গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। এই সনন্দ লাভ করায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বরাজ্যের মধ্যে যে সকল মোগল থানা ছিল, তাহার সকলগুলি উঠিয়া গেল। "স্বরাজ্যের" মধ্যে আর কোনও স্থানে মোসলমান অধিকার রহিল না। তদ্ভিন্ন শাহুর প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইল। মহারাজ শাহু এই সকল কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপে বালাজী বিশ্বনাথকে পুণা জেলার অন্তর্গত পাঁচটী মহালের সরদেশমুখী স্বত্ব ও কয়েকখানি গ্রামের সমস্ত উপস্বত্ব-ভোগের অধিকার প্রদান করিলেন। খান্দেশ ও বালেঘাট অঞ্চলের শাসন-ভার তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাবধি অর্পিত ছিল।

বালাজী বিশ্বনাথ রাজ্যের বহিঃশত্রুগণের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া এক্ষণে কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাদির সংস্কার সাধনে মনোযোগী হইবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। এতদিন পর্য্যন্ত রাজ্যের আয় ব্যয়ের ও বিজিত রাজ্যে সর্দ্দারগণের প্রাপ্য

অংশের সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত নিয়ম না থাকায় প্রায়শঃ অংশিগণের মধ্যে কলহ ঘটিত। বালাজী বিশ্বনাথ তাহা নিবারণের জন্য জমাবন্দীর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হিসাব দেখিয়া আয়-ব্যয়ের সম্বন্ধে কতিপয় বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন। এই অভিনব নির্দ্ধারণের ফলে রাজকার্য্যের অনেক গোলযোগ নিবৃত্ত হইল এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের দিকে সকলের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিল। তদ্ভিন্ন মোসলমানদিগের হস্ত হইতে নিত্য নূতন-প্রদেশ-গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষাও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হৃদয়ে বলবতী হইল। সর্দ্দারদিগের মধ্যে একজনের ক্ষতিবৃদ্ধির সহিত অপর সর্দ্দারের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ করিয়া তিনি মারাঠাগণের মধ্যে একতা-সংস্থাপনের পথ প্রসারিত করেন। এই জন্য অল্প দিনের মধ্যেই মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের সাম্রাজ্য সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাঁহার চেষ্টায় মোসলমান-বিপ্লবে জর্জ্জরিত কৃষক-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত ও দেশের চৌরভয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়।*

---

*Of course there were seeds of dissolution and decay in the arrangement of Balaji, but they were fairly held in check for nearly a century. We have the testimony of Mr. M. Elphinstone and his coadjutor that though the system was theoretically full of defects, it practically ensured peace and prosperity and succeeded in making the Maratha power respected and feared by all its neighbours. *Rise of Maratha Power. pp. 217.*

ইতঃপূর্ব্বে দামাজীর হস্ত হইতে সচিবকে রক্ষা করায় তাঁহার জননী কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপে বালাজী বিশ্বনাথকে স্বীয় অধিকারস্থিত পুরন্দর দুর্গ ও পুণাপ্রদেশ দান করিয়াছিলেন। বালাজী শাহু মহারাজের অনুমতি ও সনন্দ-পত্র লইয়া তাহা গ্রহণ করেন। এই সময়ে পুণা প্রদেশ মোগল পক্ষীয় সর্দ্দার বাজী কদম নামক এক ব্যক্তির অধিকার-ভুক্ত ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা কেবল তাহার "চৌথ" পাইতেন। পুণার "চৌথ" সচিব মহোদয়ের প্রাপ্য ছিল। সচিব-জননী তাহারই স্বত্ব বালাজীকে দান করিয়াছিলেন। বালাজী মোগল সর্দ্দারকে বশীভূত করিয়া পুণায় স্বীয় সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিলেন (১৭১৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর)। এত দিন সাসবড় গ্রামে বালাজীর পরিবারবর্গ বাস করিতেন। এক্ষণে পুরন্দর দুর্গের আশ্রয়ে পুণায় তিনি স্বীয় বাস-স্থান নির্দ্দেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তদ্বিষয়ে মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শাহু তাঁহার কার্য্য-কলাপে প্রীত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি পুণা প্রদেশ বালাজীকে ইনাম (পুরস্কার) স্বরূপে দান করিতে বিলম্ব করিলেন না। স্বল্প দিবসের মধ্যেই বালাজীর চেষ্টায় পুণার চৌর-ভয় নিবারিত হইল এবং কৃষককুলের অবস্থারও উৎকর্ষ ঘটিল।

পুণা লাভ।

মহারাষ্ট্র-রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার প্রণয়নে ও

স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে কিছু দিন অনবরত পরিশ্রম করিয়া বালাজী বিশ্বনাথের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়। এই অবস্থাতেও তাঁহাকে দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর তিনি জল বায়ুর পরিবর্ত্তন ও কিছুদিন বিশ্রাম-লাভের বাসনায় মহারাজ শাহুর অনুমতি লইয়া "সাসবড়" গ্রামে গিয়া বাস করেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্বাস্থ্য আর পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতে পারিল না। ঐ স্থানে অবস্থান-কালেই ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল (গ্রাণ্ট ডফের মতে অক্টোবর মাসে) তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। বালাজীর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে মহারাজ শাহু অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

চরিত্র-সমালোচনা।

বালাজী বিশ্বনাথ সমর-কুশল বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিতে না পারিলেও সাহসী যোদ্ধা ও রাজনীতি-বিশারদ বলিয়া বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ধনাজী যাদবের অধীন কর্ম্ম করিবার সময় অপরের সহায়তা ভিন্ন সামরিক অশ্বে আরোহণ করিতেও পারিতেন না; অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতন-নিবারণের জন্য তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই জন লোকের সর্ব্বদা উপস্থিতি ও অনুসরণ আবশ্যক হইত। কিন্তু পরিশেষে শিক্ষা ও সংসর্গগুণে তিনি অধিকাংশ সমরাভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বিশেষ যশস্বী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সরল-প্রকৃতি

ও অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। মহারাজ শাহু বাল্যকালে মোগল রাজ-পরিবারে থাকিয়া প্রতিপালিত হওয়ায় বহু পরিমাণে বিলাসিতার দাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের ন্যায় কার্য্যদক্ষ পেশওয়ের সহায়তা না পাইলে তিনি কখনও মহারাষ্ট্র দেশে এরূপ প্রতিপত্তি-লাভ করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। বালাজীর প্রতিভা ও স্বদেশ-হিতৈষণা মহারাষ্ট্র সমাজকে যে নূতন শক্তি দান করিয়াছিল, তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া পরলোকগত বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানাডে মহোদয় মহারাষ্ট্র ইতিহাসে তাঁহাকে মহাত্মা শিবাজীর পরবর্ত্তী স্থান দান করিয়াছেন। (৩)

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রী রাধা বাঈ, পুত্র বাজী রাও ও চিমণাজী আপ্পা তাঁহার নিকটেই ছিলেন। ইহার পর ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে রাধা বাঈর মৃত্যু হয়। পুত্রদ্বয় ভিন্ন বালাজীর দুইটী কন্যাও ছিল।

(৩) বালাজীর চরিত্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

Mere force and daring did not represent the want of the time, there was more than enough of it. What was needed was organization, a far seeking patriotism, the skill to temporise and establish an accord in the jarring elements of strife and a determination to turn them to account not for private purposes of self-aggrandisement, but for carrying out into effect the traditions which the great Shivaji had fifty years ago left behind as a legacy to his people. Balaji Vishwanath combined in himself the virtues of which the country then most stood in want. *Rise of the Maratha Power. pp.* 201.

তৃতীয় অধ্যায়।

পেশওয়ে পদ-লাভ—দেশের অবস্থা—নিজাম-উল্-মুল্ক—পুণা—সন্ততি।

পিতার মৃত্যুকালে বাজী রাওয়ের বয়স প্রায় একবিংশ বৎসর ছিল। নবম বর্ষ বয়স হইতে পিতার সহিত প্রায় সকল অভিযানেই উপস্থিত থাকিয়া

যোগ্যতা

তিনি সমর-বিদ্যায় যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সর্ব্বদা রাজ-কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সেইরূপ রাজনীতি-বিশারদ ও কার্য্য-কুশল হইবারও সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই কারণে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর মহারাজ শাহু বাজী রাওকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য বলিয়া মনে করিলেন। প্রতিনিধি শ্রীপতি রাও * এবিষয়ে শাহুকে অন্য প্রকার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথের মহৎ কার্য্যাবলীর বিষয় স্মরণ

---

* ইনি প্রতিনিধি পরশুরাম ত্র্যম্বকের পুত্র। ছত্রপতি শিবাজীর সময়ে পেশওয়ের পদই মন্ত্রি-সমাজের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তৎপুত্র রাজারামের শাসন-কালে রাজকার্য্য-নির্ব্বাহের সৌকর্য্যার্থ প্রতিনিধির পদ সৃষ্ট হয়। ঐ পদের বার্ষিক বেতন ১৫ হাজার হোণ বা কিঞ্চিদধিক ৫৬ হাজার টাকা ছিল।

করিয়া এবং যুবক বাজী রাওকে মেধাবী ও রাজ-কার্য্যে উৎসাহ-সম্পন্ন দেখিয়া মহারাজ প্রতিনিধির অসূয়ামূলক কথায় সংকল্প-চ্যুত হইলেন না।

পেশওয়ে পদ-লাভ।

বালাজীর মৃত্যুর পূর্ব্বে, তদীয় নির্দ্দেশ-ক্রমেই, বাজী রাও সৈয়দগণের প্রতিনিধি আলম আলীর সহায়তা করিবার জন্য একদল সৈন্যসহ খানদেশে গমন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহাকে সাসবড়ে উপস্থিত হইতে হয়। তথায় বালাজীর শ্রাদ্ধ কর্ম্মাদি শেষ হইতে না হইতে মহারাজ শাহু বাজী রাওকে পিতৃ-পদের ভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। মহারাজের পত্র পাইয়া বাজী রাও, অম্বাজী পন্ত পুরন্দরে, রামচন্দ্র পন্ত ভানু ও চিমণাজী আপ্পা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী সাতারায় উপস্থিত হন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল বাজী রাওকে পেশওয়ে পদে বরিত করিবার দিন স্থির হয়। এতদুপলক্ষে মহারাজের আদেশে রাজ্যের সমস্ত সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আহূত হন। যথাসময়ে সেনাপতি ও অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ শাহু দরবার গৃহে সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে প্রতিনিধি শ্রীপতি রাও শুভ্রবেশধারী বাজী রাওকে যথাবিধানে পেশওয়ে পদে বরণ করিলেন। সেই সময়ে সর্ব্ব-জন সমক্ষে তাঁহাকে রাজসম্মানের ও নূতনপদ-লাভের

চিহ্নস্বরূপ সনন্দ-পত্র সহ, (১) চাদর, (২) সুবর্ণ-সূত্র-খচিত উষ্ণীষ, (৩) জামেওয়ার নামক পরিচ্ছদ, (৪) কটিবন্ধনী, (৫) সুবর্ণাঙ্কিত উত্তরীয় বস্ত্র, (৬) কিংখাব, (৭) রাজমুদ্রা ও ছুরিকা, (৮) অসি ও চর্ম্ম, (৯) 'জরী পট্‌কা' নামক জাতীয় পতাকা, (১০) চৌঘড়া নামক রাজসম্ভ্রম-সূচক বাদ্যভাণ্ড, (১১) তিনটী হস্তী, ১২) একটী অশ্ব, (১৩) শিরপেঁচ, (১৪) মুক্তার মালা, (১৫) চোগা, (১৬) মুক্তাযুক্ত কর্ণভূষণ, (১৭) মুক্তাগুচ্ছময় শিরোভূষণ ও (১৮) সুবর্ণ-নির্ম্মিত লেখনী-পাত্র বা সোনার কলমদান প্রদত্ত হইল।

পেশওয়ে শব্দবিচার।

এই স্থলে "পেশওয়ে" শব্দের ইতিহাস ও উক্ত পদের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলে তাহা নিতান্ত অপ্রীতিকর বা নিরর্থক হইবে না। পেশওয়ে শব্দ পারসীক "পেশওয়া" শব্দেরই রূপান্তর জাত। ছত্রপতি শিবাজীর আদেশে রচিত "রাজ-ব্যবহার কোষ" নামক সংস্কৃত-পারসীক অভিধানে লিখিত আছে,—"প্রধানঃ পেশওয়া তথা।"

প্রধান কাহাকে বলে ও তাঁহার কার্য্য কি কি, তৎ-সম্বন্ধে 'শুক্রনীতি' গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়—

"পুরোধাশ্চ প্রতিনিধিঃ প্রধানঃ সচিবস্তথা।
মন্ত্রী চ প্রাড্‌বিবাকশ্চ পণ্ডিতশ্চ সুমন্ত্রকঃ।
অমাত্য দূত ইত্যেতা রাজ্ঞঃ প্রকৃতয়ো দশ॥"

রাজার এই দশ প্রকৃতির মধ্যে—

"সর্ব্বদর্শী প্রধানস্তু সেনাবিৎ সচিবস্তথা ॥" ৮৪ ॥

"সত্যং বা যদি বাসত্যং কার্য্যজাতঞ্চ যৎ কিল।
সর্ব্বেষাং রাজকৃত্যেষু প্রধানস্তদবিচিন্তয়েৎ ॥" ৮৯ ॥

ফলতঃ সমস্ত রাজপুরুষদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর ও সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যের যিনি পরিদর্শক, সেই সর্ব্বদর্শী রাজপুরুষ পুরাকালে 'প্রধান' নামে পরিচিত ছিলেন।

মোসলমান নৃপতিগণের, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য সুলতান-দিগের প্রধান মন্ত্রিগণ পেশওয়া নামেই অভিহিত হইতেন। মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর প্রধান মন্ত্রীও প্রথমে পেশওয়া উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। মহারাজ শিবাজী স্বীয় রাজ্যাভিষেক-কালে সেই উপাধির পরিবর্ত্তে প্রাচীন হিন্দু নীতিশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া "পণ্ডিত প্রধান" উপাধির প্রবর্ত্তন করেন। তদবধি সকল মহারাষ্ট্র-রাজমন্ত্রীই "পণ্ডিত প্রধান" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন *। তথাপি পারসীক পেশওয়া শব্দের প্রচার হ্রাস পায় নাই। বরং শিবাজীর পৌত্র মহারাজ শাহুর রাজত্বকালে দেশে পারসীক শব্দের সমধিক প্রচারের সহিত "পেশওয়ে" শব্দ আবার রাজ-দরবারে পূর্ব্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু তখনও ইতিহাসে উক্ত শব্দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাবীর

* এতদন্তর্গত "পণ্ডিত" শব্দ ব্রাহ্মণত্বের সূচকরূপে ব্যবহৃত হইত।

বাজী রাও ও তৎপুত্র বালাজী বাজী রাওয়ের অসাধারণ বিক্রমে ভারতের শাসন-চক্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় "পেশওয়ে" নাম ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করে।

পেশওয়ের কর্ত্তব্যাদি।

পেশওয়ে পদের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে মহাত্মা শিবাজীর সময়ে যাহা নির্দ্ধারিত হয়, তাহা এই,—(১) রাজ-কার্য্য বিষয়ক মন্ত্রণা, (২) সকল কর্ম্মচারীর ঐকমত্য-সাধন-পূর্ব্বক রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ ও সকলের প্রতি সমদর্শিতা (৩) অনলসভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে রাজ্যের হিতসাধনে মনোযোগ, (৪) সৈন্যবলের সাহায্যে নব দেশ-বিজয় (৫) শত্রুপক্ষীয় ও পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ-সংগ্রহ, (৬) রাজকার্য্য-বিষয়ক পত্রাদি রাজমুদ্রাঙ্কিত ও স্বনামাঙ্কিত করা। প্রধানের পদের বেতন বার্ষিক ১৩ সহস্র হোণ বা প্রায় ৪৯ হাজার টাকা ছিল।

বাজী রাওয়ের মুদ্রা।

বাজী রাও পিতৃ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার উপর এই সকল কার্য্যেরই ভার অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দিগ্বিজয় ও সন্ধি-বিগ্রহাদি-ব্যাপারে অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন বলিয়া তদীয় ভ্রাতা চিমণাজী মহারাজের নিকট থাকিয়া সকল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই কারণে মহারাজ শাহু তাঁহাকে "নায়েব পেশওয়ে"র পদ প্রদান করিয়াছিলেন। 'মহা-রাজ শাহুর রাজত্ব-কালে "পেশওয়ে' নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি-

লাভ করিলেও সরকারি কাগজপত্রে "মুখ্যপ্রধান" ও "পণ্ডিত প্রধান" প্রভৃতি সংস্কৃত উপাধিরই ব্যবহার হইত। তদনুসারে বাজী রাওকে রাজসরকার হইতে "সমস্ত-রাজ-কার্য্য-ধুরন্ধর শ্রীমন্ত রাজমান্য রাজশ্রী বাজী রাও বল্লাল পণ্ডিত প্রধান" এইরূপ পাঠযুক্ত পত্রাদি লিখিত হইত। বাজী রাওয়ের রাজমুদ্রায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল।—

" শাহু নরপতি হর্ষনিধান।
বাজীরাও বল্লাল মুখ্য প্রধান॥"

বাজী রাও যখন পেশওয়ের পদলাভ করেন, তখন ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। তাহা হইলে পাঠক বাজী রাওয়ের কার্য্যপ্রণালীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

দেশের অবস্থা।

এই সময়ে মারাঠা-সর্দ্দারগণের আত্ম-বিগ্রহ বহুল পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল। তবে রাজবংশের কলহে কতিপয় সর্দ্দার শাহুর পক্ষ ও অপরে কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তথাপি বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় মহারাজ শাহুর পক্ষই প্রবলতালাভ করিয়াছিল এবং দেশের দস্যুদলও সম্পূর্ণ দমিত হইয়াছিল। দিল্লীর রাজপরিবর্ত্তন-

স্বদেশ।

ব্যাপারে মহারাষ্ট্রীয়গণ সহায়তা করায় তাঁহাদিগের প্রতিপত্তি উত্তর-ভারতে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজ শক্তি।

ভারতবর্ষ মণিকাঞ্চনের জন্মভূমি, এই সংবাদ অবগত হইয়া পাশ্চাত্য-বণিক্‌গণ ইহার পূর্ব্বেই এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রথমে পর্ত্তুগীজ বণিকেরাই মহারাষ্ট্রে আগমন করেন। কিন্তু দেশের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা স্বল্পদিনের মধ্যে বাণিজ্য বৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাজকীয় ব্যাপারে প্রবেশ-লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এদেশীয় রাজন্যবর্গের ছিদ্রান্বেষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত শক্তি-পরীক্ষার বাসনাও পর্ত্তুগীজদিগের হৃদয়ে বলবতী হইল। পশ্চিমসমুদ্রের তীরবর্ত্তী বহুসংখ্যক বন্দর তাঁহারা অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বাজী রাও রাজ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, পর্ত্তুগীজগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের বলিষ্ঠ শত্রুর শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারেন।

ফরাসী ও ইংরাজ।

পর্ত্তুগীজদিগের সমৃদ্ধি দেখিয়া ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকেরাও আমাদের দেশের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনের জন্য পশ্চিম ভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। গোয়া, দমন, দীউ, বোম্বাই, খম্বায়ৎ, সাষ্টী (Salsette) সুরাত, চৌল, বসই, (Bassein) রাজাপুর, বেঙ্গুর্লে, প্রভৃতি স্থানে এই সকল বৈদেশিক

বণিকের পণ্য-শালা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও ফরাসী অথবা ইংরাজেরা এ দেশের রাজ্য-শাসন ব্যাপারের বিশেষ সংস্রবে আসিতে পারেন নাই। কাহ্নোজী আংগ্রে এই সকল বৈদেশিক বণিক্ সম্প্রদায়ের শক্তি-বৃদ্ধির পথে যথেষ্ট বাধা-দান করিতেছিলেন।

দিল্লীর অরাজকতা।

উত্তর ভারতবর্ষে মোগল বাদশাহের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছিল। সৈয়দগণের চেষ্টায় মহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে অতীব বিলাসপ্রিয় ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গেরও অকর্ম্মণ্যতা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সুতরাং রাজদরবার যথেচ্ছাচার ও বিলাস-ব্যসনের লীলাভূমি হইবে, বিচিত্র কি? এই কারণে প্রজার উপর ঘোর অত্যাচার হইতেছিল; অথচ ব্যবস্থার দোষে বাদশাহের দৈনন্দিন ব্যয়-নির্ব্বাহের উপযুক্ত রাজস্বও আদায় হইত না। বাদশাহকে ক্রমাগত ঋণ করিতে হইত। ঋণ-পরিশোধের জন্য প্রজার উপর নিত্য নূতন কর বসিতেছিল। দুর্ব্বল প্রজার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করে, উত্তর ভারতে এরূপ কেহ ছিল না।

নিজাম-উল্-মুল্ক।

এই সময়ে অওরঙ্গজেবের আমলের একজন সুদক্ষ রাজনীতিবিশারদ সর্দ্দার স্বীয় বাহুবলে ও বুদ্ধি-কৌশলে ভারতে মোসলমানদিগের

প্রণষ্ট-প্রায় গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবর্দ্ধমান মহারাষ্ট্র-শক্তির গতিরোধের জন্য তিনি যে চেষ্টা করেন, তাহা বহু পরিমাণে সফল হয়। তাঁহার আবির্ভাব না হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র হিন্দু-শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইতেন। সেই প্রসিদ্ধ সর্দ্দারের নাম মীর কমরুদ্দীন। খৃষ্টীয় ১৬৪০ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। সম্রাট্ অওরঙ্গজেবের সময়ে তিনি "চিন [illegible]চ খাঁ" ও ফরুখ্-শিয়ারের আমলে "নিজাম-উল্-মুল্ক" অর্থাৎ রাজ্যের সু-ব্যবস্থাকারী উপাধি লাভ করেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সৈয়দেরা তাঁহাকে মালবের সুভেদাররূপে দক্ষিণাপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাদশাহকে করতল-গত করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। কিন্তু তখন দিল্লীর দরবারে সৈয়দগণের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইহা দেখিয়া নিজাম-উল্-মুল্ক দক্ষিণ ভারতে ক্ষমতা-বিস্তার-পূর্ব্বক আপনার বল বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

সৈয়দদিগের সর্ব্বনাশ।

নিজাম-উল্-মুল্ক প্রথমতঃ 'আসিফজা' উপাধি গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহ-ঘোষণা এবং মালব হইতে নর্ম্মদা-তীর পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ আক্রমণ করেন। তিনি আশীরগড় দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হওয়ায় অধিকাংশ মোগল সর্দ্দার তাঁহার পক্ষভুক্ত হন। সৈয়দেরা এই সংবাদ পাইয়া দিলাবর খান নামক জনৈক

সেনানীকে নিজাম-উল্-মুল্কের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। অওরঙ্গাবাদ হইতে হুসেন আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র আলম্-আলীও তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আলম্-আলীর সাহায্যার্থ খণ্ডে রাও দাভাড়ে, দমাজী গায়ক-ওয়াড ও বাজী রাও প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সেনানীগণ গমন করিয়াছিলেন। বাজী রাও এই যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না। এই যুদ্ধে নিজামের হস্তে আলম্-আলী ও দিলাবর খাঁকে পরাস্ত হইতে হয়। তাঁহাদিগের পরাভব-বার্ত্তা-শ্রবণে হুসেন আলী দিল্লী হইতে বাদশাহকে লইয়া নিজামের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে, বোধ হয় বাদশাহের ইঙ্গিতক্রমেই, তাঁহাকে গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইতে হয় (খৃঃ ১৭২০ অক্টোবর)। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা আব্দুলও বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

নিজাম ও বাজী রাও।

এইরূপে বিনা আয়াসে নিজাম-উল্-মুল্কের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইল। বাদশাহ মহম্মদ শাহ তাঁহাকে স্বীয় প্রধান মন্ত্রীর পদে বরিত করিয়া রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু বাজী রাওয়ের প্ররোচনায় বিজাপুর অঞ্চলে একটা বিদ্রোহের সূচনা হওয়ায় ১৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিজাম দিল্লী গমনের অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। সে যাহা হউক, এইরূপে বাজী

রাওয়ের পেশওয়ে-পদ-লাভ-কালে মোসলমানদিগের মধ্যে নিজাম-উল্-মুল্কই তাঁহার একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দক্ষিণ ভারতে বিরাজ করিতেছিলেন।

পুণার উন্নতি।

পেশওয়ে-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাজী রাও পুণার উন্নতি-বিধানে মনোযোগী হইলেন। বাপুজী শ্রীপতি নামক এক ব্যক্তি পুরন্দর দুর্গের অধিপতি ছিলেন। বাজী রাও তাঁহাকে পুণার সুভেদারপদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি রস্তাজী যাদব নামক এক জন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে বাপুজীর অধীনতায় থাকিয়া পুণাগ্রামকে সহরে পরিণত করিবার ভার অর্পণ করেন। রস্তাজী যাদবের চেষ্টায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুণা বহুসংখ্যক শিল্পী ও ব্যবসায়ীর বসতি স্থান হওয়ায় উহা ক্রমে একটি প্রসিদ্ধ নগরীতে পরিণত হইল।

শনিবার বাড়া।

১৭২৯ খৃঃ বাজী রাওয়ের আদেশে তদীয় বাসের জন্য পুণায় একটি সৌধ-নির্ম্মাণের-কার্য্য আরব্ধ হয়। উহার কিয়দংশ নির্ম্মিত হইলে তিনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তথায় সপরিবারে বাস করিতে গমন করেন। তৎপূর্ব্বে সাসবড় গ্রামে তাঁহাদিগের বাসস্থান ছিল। এই সৌধনির্ম্মাণের কার্য্য ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে পরিসমাপ্ত হয়। প্রায় পাঁচ বিঘা পরিমিত স্থানের উপর উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদানীন্তন রীতিক্রমে উহার চতুর্দ্দিক্ সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা

বেষ্টিত হয়। তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি বুরুজ ও পাঁচটি বড় বড় দ্বার ছিল। তন্মধ্যে প্রধান দ্বারটি 'দিল্লী দরজা' নামে খ্যাত। কথিত আছে, উত্তর মুখে এই সিংহ দ্বার নির্ম্মিত হইতেছে শুনিয়া মহারাজ শাহু অসন্তোষ-প্রকাশ-পূর্ব্বক বলেন যে, "দিল্লীশ্বর আমার প্রভু; অতএব দিল্লীর দিকে প্রধান দ্বার থাকিলেও যুদ্ধবেশে সেই দ্বারপথে নিক্রান্ত হইলে দিল্লীর অবজ্ঞা করা হইবে।' বাল্যে অওরঙ্গজেবের দরবারে লালিত পালিত হওয়ায় শাহুর হৃদয়ে দিল্লীশ্বরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। এই কারণে বাজী রাওয়ের ইচ্ছা-সত্ত্বেও শাহুর জীবনকালে ঐ উত্তর দিকের দ্বার-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হয় নাই। মহারাজের মৃত্যুর পর বাজী রাওয়ের পুত্র বালাজী বাজী রাও উহার শেষ করেন। বাজী রাওয়ের সময়ে এই সৌধ চিত্রাদি বিবিধ উপকরণে সুসজ্জিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে পেশওয়েদিগের বৈভববৃদ্ধির সহিত এই অট্টালিকা রাজপ্রাসাদের শোভা ধারণ করে। সহরের যে অংশে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, তাহা "শনিবার পেঠ" নামে পরিচিত। তদনুসারে এই বাটী "শনিবার-বাড়া" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্ত্তমান ইংরাজ রাজপুরুষেরা উহার অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তথায় এক্ষণে পুণার ফৌজদারী আদালত স্থাপন করিয়াছেন।

বাজী রাওয়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে পুণা সহর কত দূর সমৃদ্ধ

হইয়াছিল, তাহা "গর্ডন" নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারীর বর্ণনা পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে। শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে গর্ডন সাহেবই প্রথমে পুণায় পদার্পণ করেন। তিনি ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পুণার অবস্থা দেখিয়া লিখিয়াছেন,—

পুণার সমৃদ্ধি।

"পুণার ন্যায় সুন্দর নগরী ভারতবর্ষে অতি অল্পই আছে। আমার চক্ষে এই সহর অতীব সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বোধ হইল। বাজারে শাকশ[illegible]প দেখিলে সকলেরই বিস্ময় জন্মে। লোহার ও কামান প্রস্তুত ক[illegible]র কারখানা সহরের অনেক স্থানেই দেখিতে পাইলাম। এখানকার তন্তুবায়, মালাকার ও শিল্পীদিগের হস্ত-কৌশল দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। পুণার বাজারে পৃথিবীর যাবতীয় মালের আমদানি হয়। নগরবাসীদিগকে সুখ-সম্পদের ক্রোড়ে লালিত বলিয়া মনে হইল। এখানে ধনবানের সংখ্যাই অধিক। নাগরিকগণের সুন্দর বপু প্রচুর সুবর্ণরত্নাদিতে অলঙ্কৃত। এখানকার বাণিজ্য-ব্যবসায় অতি বিস্তৃত। পুণা হইতে প্রত্যহ সহস্র সহস্র পণ্যবাহী শকট দেশের সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকে। দিন দিন পেশওয়ের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সহিত পুণার বাণিজ্য-বৈভবেরও বৃদ্ধি হইতেছে।"

পুত্র-লাভ।

পেশওয়ে পদে অধিষ্ঠিত হইবার স্বল্পদিন পরে, ১৭২১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বাজী রাও প্রথম পুত্র লাভ করেন। মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে বাজী রাও স্বীয় পিতার নামে তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন। এই বালক ভবিষ্যতে বালাজী বাজী রাও নামে প্রসিদ্ধ হয়। বাজী রাও যে মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে জীবনপাত করিয়াছিলেন,

বালাজী বাজী রাওয়ের চেষ্টায় তাহা বহু পরিমাণে সুসিদ্ধ হয়। বালাজী বাজী রাওয়ের শাসন-সময়ে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে হিন্দু সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। আবার তাঁহারই শাসন-কালে মহারাষ্ট্র-শক্তি পানিপথে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কিছু দিনের জন্য বিনম্র হইয়া পড়ে।

রঘুনাথ রাও।

সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা বাজী রাওয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বিক্রমে বহুলাংশে পিতার সমকক্ষ হইয়াছিলেন। 'আটক' নগরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার বাজী রাওয়ের যে সংকল্প ছিল, তাহা রঘুনাথ রাও নিজ শৌর্য্য-বলে সত্য ঘটনায় পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনীতিক দূর দৃষ্টির অভাবে এবং স্ত্রীর বশীভূত হওয়ায় রঘুনাথের শেষ জীবন কলুষময় ও বিড়ম্বনার আধার হইয়া উঠে। সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যেরও বহুল ক্ষতি সাধিত হয়। সে যাহা হউক, এতদ্ভিন্ন বাজী রাও আরও দুইটি অপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম রামচন্দ্র ও জনার্দ্দন পন্ত। তাঁহারা উভয়েই অল্পবয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বাজী রাও স্বীয় পুত্রগণকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। বালাজী ও রঘুনাথ রাওকে যুদ্ধবিদ্যার সহিত রঘুবংশ প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যও আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

মালবে অভি[illegible]ন—দরবারে [illegible]তা—চরিত্র ও চিত্র—নূতন সৈন্য—[illegible]ট-যাত্রা।

নিজাম-উল্-মুল্কের বিদ্রোহের জন্য ১৭২০ খৃষ্টাব্দে খানদেশ হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখী সংক্রান্ত রাজস্ব আদায়ে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বাজী রাও পেশওয়ে হইয়াই শুনিলেন যে, খানদেশের মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদিগের আদায় কার্য্যে বাধা দিতেছেন। এই কারণে তিনি রামচন্দ্র গণেশ নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় সেনানীকে খানদেশে চৌথ ও সরদেশমুখী-সংক্রান্ত প্রাপ্য আদায়ের জন্য প্রেরণ করিলেন। মোগলেরা রামচন্দ্র গণেশকে প্রাণপণে বাধা দিতে ত্রুটী করিলেন না। তথাপি সর্দ্দার রামচন্দ্র বাহুবলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমস্ত প্রাপ্য আদায় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরবর্ত্তী বৎসরেও আদায়ে গোলযোগ ঘটায় বাজী রাও উদয়জী পওয়ারকে (প্রমারকে) সসৈন্যে গুজরাথে ও

মালবে বাজী রাও।

খানদেশে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে তিনি তাঁহাকে মালব দেশ আক্রমণ করিতেও আদেশ করেন। খৃষ্টীয় ১৬৯৮ অব্দ হইতেই মহারাষ্ট্রীয়েরা মালব দেশে চৌথ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৭১৯ খৃঃ বালাজী বিশ্বনাথকে দিল্লীর দরবার হইতে মালবে চৌথ প্রবর্ত্তনাধিকার-দানের আশ্বাস প্রদত্ত হয়। বাজী রাও বাহু-বলে এই স্ব[illegible]লাভের চেষ্টা করেন। খানদেশে গমন কালে উদয়জী, বাজী রাওয়ের নিকট হইতে মালবের প্রত্যেক পরগণার রাজপুরুষের নামে, নির্ব্বিবাদে চৌথ-দান সম্বন্ধে মহারাজ শাহুর নামযুক্ত আদেশপত্র পাইয়াছিলেন। তিনি ১৭২২।২৩ খৃষ্টাব্দে বাহুবলে মালব হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী সংক্রান্ত সমস্ত প্রাপ্য আদায় করিয়া লইয়া আসেন। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উদয়জী পওয়ারের সহিত স্বয়ং বাজী রাও ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিমণাজী আপ্পা মালবে উপস্থিত হন। রাজা গিরিধর নামক কোনও নাগর ব্রাহ্মণ তথাকার সুভেদার ছিলেন। তিনি মোগলদিগের পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক সমর-লিপ্সু হইয়া তাঁহাদিগের গতিরোধে যত্ন-প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিতে হয়।

বাজী রাওয়ের নীতি।

সে কালে মহারাষ্ট্র দেশের পক্ষে মালব প্রদেশ উত্তর ভারতে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ ছিল। এই কারণে বাজী রাও ঐ প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে

স্ব-করতল-গত করিয়া ক্রমে ক্রমে মোগলদিগের শাসিত উত্তর ভারতে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য-বিস্তারের সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি শৌর্য্য, সাহস ও উৎসাহের অবতার ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কারণে তিনি রাজ-প্রতিনিধি শ্রীপতি রাওয়ের বিশেষ ঈর্ষ্যার ভাজন হইয়াছিলেন। বাজী রাও যাহাতে স্বীয় বিক্রম ও কার্য্য-দক্ষতা প্রকাশ করিয়া মহারাজ শাহুর অধিকতর প্রিয়-পাত্র হইতে না পারেন, প্রতিনিধি মহাশয় সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিতেন। বাজী রাও মহারাজ শাহুর নিকট উত্তর ভারতবর্ষে অভিযান করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই শ্রীপতি রাও নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া তাহার অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইতেন। বাজী রাওয়ের ন্যায়, মহারাজ শাহুরও উত্তর ভারতে আধিপত্য-বিস্তারের বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রতিনিধি শ্রীপতি রাও কয়েকবার এইরূপ প্রতিবাদ করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এ বিষয়ের শেষ সিদ্ধান্ত করিবার জন্য মহারাজ একদিন সভা আহ্বান করিলেন। দরবারে সকল সর্দ্দার ও সামন্তগণ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ প্রতিনিধি মহাশয় বাজী রাওয়ের প্রস্তাবের উল্লেখ ও তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—

"পেশওয়ে স্বপক্ষীয় বলাবলের বিচার না করিয়া কেবল আগ্রহাতিশয় বশতঃ উত্তর ভারতবর্ষ-বিজয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে

বর্ত্তমান সময়ে একটী সামান্য বিদ্রোহ-দমনেরও আমাদিগের সামর্থ্য নাই। নিজামের মহাবল-পরাক্রম সৈন্যসমূহ আমাদিগের দ্বারদেশে আসিয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছে। তাহাদিগেরও রণকণ্ডূতি নিবৃত্ত করিতে আমরা অসমর্থ। অধিক কি বলিব, আমাদিগের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্বই আমরা সর্ব্বত্র নির্ব্বিরোধে আদায় করিতে পারিতেছি না। এ অবস্থায় বিদেশ-জয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া অ[illegible] স্ব-রাজ্যের দৃঢ়তা-সম্পাদনে যত্নশীল হওয়াই কর্ত্তব্য। কোহ্লাপু[illegible] সাম্ভাজীর সহিত আমাদিগের যে বিরোধ আছে, তাহার মীমাংসা ও কর্ণাটক অঞ্চলে মহাত্মা শিবাজী যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধার না করিয়া উত্তর ভারতে অভিযান করা আমি কিছুতেই রাজ্যের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করি না। পেশওয়ের ন্যায় আমারও শৌর্য্য-সাহস আছে। কিন্তু বিদেশে গিয়া শৌর্য্য-প্রকাশের ইহা উপযুক্ত সময় নহে।”

প্রতিনিধির বক্তৃতা।

বাজী রাও একজন সুবক্তা ছিলেন। তিনি প্রতিনিধির এইরূপ প্রতিবাদের উত্তরে ওজস্বিনী ভাষায় যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ —

“প্রতিনিধির উপদেশ অতীব বিস্ময়কর। দেশের বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থা তাঁহার আদৌ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। বাস্তব পক্ষে মোগল-সাম্রাজ্য-রূপ মহাতরু এক্ষণে জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার এতদপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত অবসর আর হইতে পারে না। কারণ, মোগল বাদশাহেরাও এখন মারাঠাগণের মুখাপেক্ষী হইয়াছেন। বীরশ্রেষ্ঠ মারাঠাগণেরই সাহায্যে এখন মোগলগণ আপনাদের অধিকার রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে-

রাও বাজীর বক্তৃতা।

ছেন। এ অবস্থায় আমরা যথোচিত বিক্রম প্রকাশ করিতে পারিলে সমগ্র ভারতবর্ষে আমাদিগেরই স্ব-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—মোগল বাদশাহীর পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে হিন্দু-সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইবে। নিজাম-উল্‌-মুকের ভয়ে মোগল-রাজ্য-বিনাশের এ সুযোগ ত্যাগ করা আমি কখনই সুবুদ্ধির কার্য্য বলিয়া মনে করি না। এরূপ ভীত হইলে রাজ্যবৃদ্ধি হইবে কিরূপে? পরলোকগত মহারাজ শিবাজী, দৌলতাবাদে অওরঙ্গজেবের ন্যায় প্রবল শত্রুর অবস্থিতিকালেও বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে [illegible] হন নাই এবং উক্ত সুলতানদিগকে সম্পূর্ণ দমিত করিবার পূর্ব্বে কর্ণাটক অধিকারের সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। মহারাজ সাম্ভাজীর মৃত্যুর পর মহারাজ রাজারামকেও বহুবার এরূপ সাহস প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং মহারাজ (শাহু) তখন মোগলের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশ দিল্লীশ্বরের হস্তগত হইয়াছিল। তথাপি, সুদূর জিঞ্জি দুর্গে অবস্থিতি করিয়াও মহারাজ রাজারাম মোগল শাসন উচ্ছেদের চেষ্টা করিয়াছিলেন—স্বদেশে এইরূপ ঘোর বিপত্তি-সত্বেও তাঁহার সর্দ্দারেরা অওরঙ্গাবাদ-প্রভৃতি মোগল প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধির ন্যায় ভীরুতা প্রকাশ করিলে তাঁহারা কোনও কার্য্যই সাধন করিতে পারিতেন না। ফলতঃ নিজাম-উল্‌-মুককে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর সহিত যখন ইচ্ছা সন্ধি-স্থাপন করিয়া কর্ণাটকের সুব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হইবে না। ঈশ্বরের কৃপায় যখন আমরা মোগলদিগের হস্ত হইতে মহারাজের মুক্তি ও প্রণষ্টপ্রায় স্ব-রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিতে পারিয়াছি, বাদশাহের সহায়তা ও প্রতিষ্ঠা করিয়া যখন অলৌকিক যশোলাভ করিয়াছি, তখন মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের বীর্য্য-বলে আমরা হিমালয়ের শিখরদেশস্থিত "আটকে" ছত্রপতির বিজয়পতাকা রোপণ করিতে

পারিব—হিন্দুদিগের জন্মভূমি হিন্দুস্থান হইতে বৈদেশিক রাজশক্তি বিলুপ্ত করিতে পারিব। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যদি মহৎকার্য্য সাধন করিতেই না পারিলাম, তাহা হইলে রাজ্যের উচ্চপদ লাভ করিয়া ফল কি *? মহারাজ আমাকে কেবল সনন্দ-পত্র দান করুন, আমি নূতন সৈন্যদল গঠন করিয়া মোগল-সাম্রাজ্য অধিকার করিতেছি। নিজাম-উল্-মুক্কের দমন করিবার ভারও আমার উপর থাকিল! সমগ্র যবন-রাজ্যের উচ্ছেদপূর্ব্বক ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র হিন্দু-সাম্রাজ্য-স্থাপন করিবার জন্য ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল। অকাল মৃত্যুর জন্য তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। মহারাজের (শাহুর) পুণ্যবলে আমি সে কার্য্য সাধন করিতেছি। বিশেষতঃ পিতৃদেবের সহিত উত্তর-ভারতে গিয়া আমি সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। হিন্দুস্থানের দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আমাদিগের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। এখন কেবল মহারাজের আদেশ পাইলেই আমি কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারি। কর্ণাটকের ও কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর ব্যাপার যদি প্রতিনিধি মহাশয়ের নিকট বিশেষ গুরুতর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্প্রতি যে সৈন্য সজ্জিত আছে, তাহা লইয়া কতিপয় বড় বড় সর্দ্দারের সহিত তিনি সেদিকে গমন করুন। উত্তর-ভারত-বিজয়ের ভার মহারাজের আদেশ পাইলে আমি গ্রহণ করিতেছি।"

মহারাজের প্রশংসা-বাদ।

বাজী রাওয়ের এই উৎসাহ ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মহারাজ শাহু অতীব প্রীত হইলেন এবং তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"বালাজী পন্তের ঔরসে

* বাজী রাওয়ের এই বাক্যে প্রতিনিধির অন্তরে বোধ হয় বিষম আঘাত লাগিয়াছিল।

আপনার ন্যায় শৌর্য্যশালী ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিরই জন্ম-গ্রহণ সম্ভবপর। আপনার ন্যায় কর্ম্মচারী যাহার অধীন-তায় থাকেন, তাঁহার পক্ষে হিমালয়ের অপর পারস্থিত 'কিন্নরখণ্ডে' বিজয়পতকা রোপণ কিছুমাত্র বিস্ময়কর ব্যাপার নহে—হিন্দুস্থান বিজয় ত অতি তুচ্ছ কথা! অতএব আপনি উত্তর-ভারতে গমন করুন; নিজাম-উল্‌মুল্কের ও কর্ণাটক-বিজয়ের ভার আমাদিগের উপর রহিল।” এই বলিয়া মহা-রাজ শাহু সুবর্ণ ছত্র-দণ্ড-ভূষণ-পরিচ্ছদাদি দানে তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। সেদিনকার দরবারে বাজী রাওয়ের বক্তৃতার ফলে মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার-সমাজে তাঁহার প্রশংসার সীমা রহিল না। সাতারার দরবারে প্রতিনিধি শ্রীপতি রাওয়ের যে গৌরব ও প্রভুত্ব ছিল, এই ঘটনায় তাহা বিলক্ষণ হ্রাস পাইল। মহারাজ শাহুও বাজী রাওয়ের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে উত্তর ভারত-বিজয়ের জন্য সনন্দ-পত্র প্রদান করিলেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে এই স্মরণীয় ঘটনা ঘটে।

রাজসভায় বাজী রাও যেরূপ বীররসপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন, তাঁহার শৌর্য্য ও সাহসও তদনুরূপ ছিল। তিনি এরূপ সুস্থকায় ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন যে, যুদ্ধাভিযান-কালে সময়ে সময়ে ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত অশ্ব-পৃষ্ঠে, কাঁচা ছোলা ও ভুট্টা হস্ত-

বাজীরাওয়ের স্বভাব।

সংঘর্ষে চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ-পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার বুদ্ধিও অতীব বিশাল ছিল। রাজকার্য্যে তাঁহার ন্যায় ধুরন্ধর ব্যক্তি সে সময়ে মহারাষ্ট্রে আর কেহ ছিলেন না। তিনি অমায়িক ও ঋজু-স্বভাব ছিলেন, এবং কোনও প্রকার আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না।

স্ব-তাঁহার চিত্র।

উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও অভিযানাদির সময়ে তিনি সামান্য সৈনিকের ন্যায় একাকী অশ্বারোহণে ধাবিত হইতেন। এই কারণে কেহ তাঁহাকে সহজে সেনানী বলিয়া চিনিতে পারিত না। নিজামের সহিত তাঁহার বহু বার সংগ্রাম ঘটিলেও ১৭২৮ খৃঃ পর্য্যন্ত নিজাম তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। একদা তিনি বাজী রাওয়ের চিত্রদর্শনেচ্ছু হইয়া একজন সুদক্ষ চিত্রকরকে তাঁহার চিত্রাঙ্কনের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। বাজী রাও যখন মালব-বিজয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়ে চিত্রকর তাঁহার সমীপবর্ত্তী হয় এবং তাঁহার তদবস্থার চিত্র অঙ্কিত করে। বাজী রাও তখন একটী ৭।৮ বিঘত উচ্চ বীর্য্যবান্ অশ্বে আরূঢ় হইয়া, স্কন্ধদেশে ভীমাকৃতি ভল্ল-স্থাপন-পূর্ব্বক ভুট্টা ও কাঁচা ছোলার দানা হস্তে মর্দ্দন ও ভক্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার মস্তকে বস্ত্রাচ্ছাদিত শিরস্ত্রাণ, অঙ্গে লৌহময় কবচ, তদুপরি তুলা-ভরা কুর্ত্তা, কটিদেশে উলঙ্গ অসি ও তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, পদে

পাদবন্ধ, গলদেশে গ্রীবা-বন্ধ, সঙ্গে অশ্বের কবল-পাত্র ও তন্মধ্যে অশ্ববন্ধনের শঙ্কুনিচয়। কথিত আছে, বাজীরাওয়ের এইরূপ অপূর্ব্ব বীরমূর্ত্তি দেখিয়া নিজাম স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"আল্লা পানাঃ ইয়ে ইন্সান্ হ্যায়, লেকিন্ মানিন্দ শয়তানকে হ্যায়; লাজিম্ হ্যায় কি ইস্‌সে সাথ হোষিয়ারি ঔর হিফাজৎসে রহনা চাহিয়ে!" অর্থাৎ এই ব্যক্তি মনুষ্য হইলেও শয়তানের সহচরবৎ অপ্রতিহত শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার সহিত বিশেষ সাবধানতা-সহকারে চলা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন-সত্ত্বেও নিজাম বাহাদুরকে বহুবার এই অসাধারণ বীরের হস্তে বিড়ম্বিত হইতে হয়।

সেনাদল গঠন।

মহারাজ শাহুর অনুমতি পাইয়া বাজী রাও দুই লক্ষ মুদ্রা ঋণ পূর্ব্বক নূতন সৈন্য-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। এতদিন লুণ্ঠনের ভাগ দিবার অঙ্গীকার করিয়া সৈনিকদিগকে অস্থায়ি-ভাবে নিযুক্ত করা হইত। কিন্তু বাজী রাও সে প্রথা বহুল পরিমাণে রহিত করিয়া পর্য্যাপ্ত বেতন-দান-পূর্ব্বক স্থায়ী সৈন্য-পোষণের ব্যবস্থা করিলেন। উত্তর ভারতে মহারাষ্ট্র-ক্ষমতা-বিস্তারের জন্য তিনি যে সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হন। মহ্লার রাও হোলকর, রাণোজী শিন্দে (সিন্দিয়া), গোবিন্দ রাও

বুন্দেলা ও উদয়জী পওয়ার প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য (১)। উদয়জী পওয়ার ভিন্ন ইঁহারা সকলেই পূর্ব্বে অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। কিন্তু পরে মহাবীর বাজী রাওয়ের সঙ্গ লাভ করিয়া ইতিহাসে অমরত্ব পাইবার যোগ্য হন।

মালবে

উত্তর ভারতবর্ষ বিজয়ের সনন্দ লাভ করিয়া বাজী রাও স্বল্পকাল প্রথমতঃ মালব-প্রদেশে দুইবার অভিযান করেন। উভয় বারই সেখানকার রাজা গিরিধরের পরাজয়-সাধনপূর্ব্বক তিনি তাঁহাকে

---

(১) মহ্লার রাওয়ের পিতা পুণা জিলার অন্তর্গত নীরা নদীর তীরবর্ত্তী হোল নামক গ্রামের চৌগুলা বা গ্রাম-রক্ষকের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন। মেষ-পালন তাঁহার পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় ছিল। মহ্লার রাও বাল্যকালে মেষচারণ করিতেন। যৌবনে তিনি মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। বাজী রাও তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ও শৌর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ইহার পর ক্রমশঃ তাঁহার উন্নতি হয় ও তিনি বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইলেন।

রাণোজী শিন্দে—গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়া বংশের আদিপুরুষ। তিনি প্রথমে মোগলদিগের অধীনতায় কার্য্য করিতেন। মোগলদিগের অবনতির সূত্রপাত ও স্বজাতির অভ্যুদয়-দর্শনে তিনি পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের নিকট বারগীর বা অশ্বসাদীর কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রথমে সামান্য ভৃত্যভাবেই বহুদিন অতিবাহিত করিতে হয়। রাণোজীর কর্ত্তব্য-পরায়ণতা দেখিয়া বাজী রাও তাঁহার পদোন্নতি করেন। মহ্লার রাওয়ের সহিত ইঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল।

গোবিন্দরাও বুন্দেলা রত্নাগিরি-জেলার অন্তর্গত নেওরে গ্রামের কুলকরণী বা গ্রাম-লেখকের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অন্নকষ্টে পীড়িত

করদানে বাধ্য করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর যে লুণ্ঠন-ক্রিয়া আরব্ধ হয়, তাহাতে বহু সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। মহলার রাও হোলকর, রাণোজী শিন্দে ও উদয়জী পওয়ার এই যুদ্ধে বিশেষ শৌর্য্য-প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বাজী রাও তাঁহাদিগকে মালবের চৌথ ও সরদেশমুখীর টাকা আদায় করিবার বংশপরম্পরানুগামী স্বত্ব দান এবং সৈন্য-পোষণের জন্য "মোকাসা" (১) নামক আয়ের প্রায় অর্দ্ধাংশ (তন্মধ্যে হোলকরকে শতকরা ২২॥৫, শিন্দেকে ২২॥০ ও পওয়ারকে ১০৲ হিসাবে) গ্রহণ করিবার আদেশ করিলেন। (১৭২৫ খৃঃ) ইংরাজ ঐতিহাসিক মালকম সাহেব বলেন,—বাজী রাওয়ের আমলে মহারাষ্ট্রীয় সেনানীদিগের সদ্ব্যবহার-গুণে মোগল শাসনে উৎপীড়িত মালববাসী তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিল। এই কারণে অল্প দিনের মধ্যেই ঐ প্রদেশ বিনা আয়াসে মহারাষ্ট্রীয়গণের সম্পূর্ণ হস্তগত হয়।

কর্ণাটকে অভিযান।

মহাত্মা শিবাজীর চেষ্টায় কর্ণাটক মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত হইয়াছিল। নিজাম দক্ষিণ ভারতের সুভেদারী লাভ করিবার পর ঐ

হইয়া বাজী রাওয়ের সেবকত্ব গ্রহণ করেন। কার্য্য-তৎপরতাগুণে ইনি ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের সুভেদার পদে নিযুক্ত হন। পানিপতের যুদ্ধে ইহার মৃত্যু হয়।

(১) যে কোনও প্রকার রাজস্বের ত্রি-চতুর্থাংশকে মোকাসা বলে।

প্রদেশ আপনার করতলগত করিয়াছিলেন। তাহা পুনরধিকার করিবার জন্ম প্রতিনিধির বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। ১৭২০ খৃষ্টাব্দ হইতে মহারাষ্ট্র সেনানীগণ বহুবার নিজামকে আক্রমণ করিয়া কর্ণাট উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফললাভ হয় নাই। পরিশেষে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিনিধির পরামর্শক্রমে, সমস্ত সেনানীদিগের সমবেত ভাবে চারিদিক্ হইতে নিজামকে আক্রমণ করিবার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইল। তদনুসারে বাজী রাও মালব-বিজয়পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলে প্রতিনিধি মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে মহারাজ শাহু তাঁহাকেও কর্ণাটক প্রদেশ-জয়ার্থ গমন করিতে আদেশ করিলেন। সেই সময় কর্ণাট-দেশে অভিযান করিবার উপযুক্ত অবসর বলিয়া বাজী রাওয়ের নিকট বিবেচিত না হওয়ায় তিনি স্বীয় অভিপ্রায় মহারাজ শাহুর গোচর করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে প্রতিনিধির তুষ্টি-সাধনোদ্দেশে তাঁহাকে সেই সময়েই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। ফলে কর্ণাট হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী সংক্রান্ত সমস্ত প্রাপ্য আদায় এবং ঐ প্রদেশের বহুল অংশের পুনরুদ্ধার সাধিত হইল বটে; কিন্তু সেখানকার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দোষে মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকদিগের অনেকেই রোগ ভোগ করিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিল। (১৭২৬ খৃঃ অঃ)।

পঞ্চম অধ্যায়।

নিজাম-উল্-মুল্কের কুটিলতা—পালখেড়ের যুদ্ধ—নিজামের পরাজয়।

কর্ণাটের যুদ্ধব্যাপারের পর হইতে বাজী রাও নিজাম-উল্-মুল্কের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। এতদিন দুই একটা সামান্য খণ্ড-যুদ্ধে নিজামের কোন কোনও সেনানী বাজী রাওয়ের হস্তে পরাভূত হইলেও তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু কর্ণাটের যুদ্ধে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রচণ্ড শক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের অভ্যুদয়-নিবারণ তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। প্রকৃত পক্ষে মহারাষ্ট্রীয়েরাই এই সময়ে নিজাম-উল্-মুল্কের একমাত্র ভীতির স্থল ছিলেন। দিল্লীর দরবারে প্রাধান্য লাভ করা এতদিন নিজামের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল; কিন্তু এক্ষণে সে লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত হইল। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে গিয়া বাদশাহী দরবারের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শন করিলেন,

নিজামের লক্ষ্য।

তাহাতে বাদশাহের প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ তাঁহার নিকট গৌরবকর বলিয়া বোধ হইল না। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দিল্লীর পদত্যাগ-পূর্ব্বক দক্ষিণাপথে আসিয়া স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির স্বতন্ত্র ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি প্রথমেই দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়া আপনাকে দক্ষিণাপথের স্বাধীন নরপতি বলিয়া [illegible]র করেন। দিল্লীর বাদশাহের জন্য তাঁহার কোনও ভয় ছিল না। দাক্ষিণাত্যে অক্ষুণ্ণ আধিপত্য-স্থাপন-বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়েরাই তাঁহার নিকট বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইলেন। এই কারণে তাঁহাদিগের অধঃপাত-সাধনই এখন হইতে তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইল।

নিজামের সন্তোষ।

মহারাষ্ট্রীয়েরা মালব দেশ বিজয়-পূর্ব্বক গুজরাথ ও উত্তর ভারতে আপনাদের অধিকার বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছেন দেখিয়া নিজাম প্রথমতঃ মনে মনে কিয়ৎ পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৃষ্টি উত্তর-ভারতের দিকে নিবদ্ধ থাকিলে তিনি বলসঞ্চয়ের অবকাশ পাইবেন। তদ্ভিন্ন বাদশাহের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধ-বাধিলে উভয় পক্ষেরই দৌর্ব্বল্য ঘটিবার সম্ভাবনা—অন্ততঃ বাদসাহের শক্তি তাহাতে ক্ষয়িত হইবে। কিন্তু কর্ণাটকের যুদ্ধের মহারাষ্ট্র-শক্তির সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া

প্রতিপন্ন হইল। তখন তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষার উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন।

নিজামের কৌশল।

মোগল বাদশাহের প্রদত্ত সনন্দের বলে মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রতি বৎসর নিজাম-উল্-মুল্কের রাজ্য হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী-বিষয়ক কর আদায় করিতেন। তদুপলক্ষে তাঁহার রাজ্যে প্রতি বৎসর মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিবিধি হইত। তাহা রুদ্ধ করিবার জন্য তিনি শাহুর নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, মহারাজ যদি নিজাম রাজ্যের চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্বত্যাগ করেন, তাহা হইলে নিজাম তাঁহাকে একেবারে কয়েক কোটী টাকা নগদ ও তাঁহার শাসনাধীন ইন্দাপুরের নিকটস্থ কয়েকটী পরগণা নিষ্কর জায়গীর-স্বরূপ প্রদান করিবেন। বাজী রাও এই প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইবেন না, ইহা নিজামের অবিদিত ছিল না। এই কারণে বাজী রাওয়ের রাজধানীতে অনুপস্থিতি-কালে তিনি মহারাজ শাহুর নিকট এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। রাজসভায় তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থনের জন্য তিনি প্রতিনিধি শ্রীপতি রাওকে বেরার অঞ্চলে জায়গীর দিবার লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিয়াছিলেন। প্রতিনিধি মহারাজকে বুঝাইয়া দিলেন যে, নিজামের প্রস্তাব মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে বিশেষ লাভ-জনক হইবে। কাজেই সরলমতি শাহু ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

এমন সময়ে অওরঙ্গাবাদ অঞ্চল হইতে (১) বাজী রাও সহসা সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বিষয় শ্রবণমাত্র নিজামের কৌশল বুঝিতে পারিলেন। তিনি মহারাজ শাহুকে বুঝাইলেন যে, "কোনও কারণে নিজাম রাজ্যে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে উক্ত রাজ্যে আমাদিগের সার্ব্বভৌম প্রতিপত্তির হানি হইবে এবং নিজামের মহারাষ্ট্র-ভীতি কমিয়া গিয়া তিনি আমাদিগের বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিবার সুবিধা পাইবেন।" মহারাজ শাহু পেশওয়ের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে স্বীয় অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এই ঘটনায় প্রতিনিধির উপর মহারাজের অসন্তোষ জন্মিল এবং বাজী রাওয়ের প্রতি শ্রীপতি রাও বদ্ধবৈর হইলেন।

কৌশল-ভেদ।

এই চাতুরী-জাল ছিন্ন হওয়ায় নিজাম আর এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া মহারাষ্ট্র-

নিজামের কুটিলতা।

(১) বাজী রাও কর্ণাট প্রদেশে যাত্রা করিলে নিজাম আপনার কতিপয় সর্দ্দারের প্রতি ঐ অঞ্চলের রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং মহারাষ্ট্রদেশের উত্তরাঞ্চল আক্রমণের আয়োজন করেন। এই কারণে বাজী রাওকে কর্ণাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নিজামের অওরঙ্গাবাদ-স্থিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হয়। সেই অবকাশে নিজাম উল্লিখিত প্রস্তাব শাহুর নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

সমাজে গৃহ-বিবাদানল প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বর্ষশেষে শাহুর কর্ম্মচারিবর্গ চৌথ ও সরদেশ-মুখীর প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য নিজাম-রাজ্যে উপস্থিত হইলে নিজাম বলিলেন, "মহারাজ শাহু ও মহারাজ সাম্ভাজী উভয়েই আমার নিকট মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রাপ্য চৌথ প্রার্থনা করিতেছেন। এ অবস্থায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রকৃত অধিপতি কে, তাহা নির্ণীত না হইলে আমি চৌথ ও সরদেশ-মুখীর টাকা কাহাকেও প্রদান করিতে পারি না।" এই কথা বলিয়া তিনি মহারাজ শাহুর কর্ম্মচারীদিগকে স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। নিজামের এ কৌশলও বাজী রাওয়ের নিকট অপরিজ্ঞাত রহিল না। তিনি বলিলেন, "চৌথ আদায় করিবার বাদসাহী সনন্দ যাঁহার নামে আছে, নিজাম তাঁহাকেই চৌথ দিতে বাধ্য। মহারাষ্ট্র রাজ্যের অধিকারী নির্ণয় করিবার তিনি কে? ফলতঃ মহারাজ সাম্ভা-জীর সহিত আমাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া উভয়ের বিনাশ-সাধনই নিজামের উদ্দেশ্য।" বাজী রাওয়ের এই কথায় শাহু নিজামের কার্য্য গর্হিত বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিবার হুকুম দিলেন। তদনুসারে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাজী রাও রাজ্যের যাবতীয় যোদ্ধৃপুরুষকে লইয়া অভিযানের আয়োজন করিলেন। নিজামও অওরঙ্গাবাদে

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি কোহ্লাপুরের মহারাজ সাম্ভাজীকে ইতঃপূর্ব্বেই হস্তগত করিয়া তাঁহাকে শিখণ্ডীর ন্যায় স্বীয় সেনাদলের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন।

পেশওয়ের কৌশল।

এই সময়ে নিজামের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বাজী রাওয়ের অসাধারণ রণ-নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। তিনি প্রথমে নিজামের শাসনাধীন জাল্না প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মোগলদিগকে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য ইওয়াজ খান নামক নিজামের একজন সর্দ্দার সসৈন্যে অগ্রসর হইলে তাঁহার সহিত কিয়ৎকাল সামান্যভাবে যুদ্ধ করিয়া, বাজী রাও প্রথমে মাহুর নগরের দিকে ও পরে একেবারে অওরঙ্গাবাদের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অতঃপর তিনি বুহ্রানপুর লুণ্ঠন ও ভস্মসাৎ করিবার ভয় দেখাইয়া খানদেশে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে নিজাম স্বীয় দলবল সহ বুহ্রানপুর-রক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নিজামের সমস্ত সৈন্য বুহ্রানপুর অঞ্চলে সমবেত হইয়াছে দেখিয়া বাজী রাও স্বল্পসংখ্যক সৈন্য ঐ প্রদেশে প্রেরণ-পূর্ব্বক প্রধান প্রধান সেনানী সহ সহসা গুজরাথে প্রবেশ ও তথাকার সুভেদার সরবুলন্দ খানকে যুদ্ধে জর্জ্জরিত করিয়া গুজরাথের বহু স্থান লুণ্ঠন করিলেন।

এ দিকে নিজাম তাঁহার অপেক্ষায় বুহ্রানপুরে বহুদিন যাপন করিলেন। অতঃপর, বাজী রাওয়ের গুজরাথ আক্রমণের সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। যুবকের হস্তে এইরূপে প্রতারিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি পুণা দগ্ধ করিবার উদ্দেশে দক্ষিণমুখে যাত্রা করিলেন। বাজী রাও এই সংবাদ-প্রাপ্তি-মাত্র শ্যেনবৎ বেগে গুজরাথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং মোগল-শাসিত প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে আহম্মদনগরের নিকটে আসিয়া নিজামের পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিলেন। বাজী রাওকে পৃষ্ঠোপরি সমাগত দেখিয়া নিজামকে পুণার আভিমুখ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। সুচতুর বাজী রাও তাঁহার সহিত বিবিধ খণ্ডযুদ্ধে ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইয়া গোদাবরী-তীরবর্ত্তী পালখেড় নামক এক অতি বিকট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, নিজাম তখনও স্বীয় বিপদ আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। এদিকে বাজী রাও শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য দগ্ধ করিয়া তাহাদিগের আশ্রয়-গ্রহণের স্থান বিনষ্ট করিলেন। ইহার পর মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টন-পূর্ব্বক সসৈন্য নিজামকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল। তখন নিজাম বাহাদুর স্বীয় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। নিজামের তোপখানা মহারাষ্ট্রীয়দিগের তোপ-

খানা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। সুতরাং সে যুদ্ধে বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্র-সৈন্য বিনষ্ট হইল। তথাপি বাজী রাও বিচলিত হইয়া স্থানত্যাগ করিলেন না, এবং নিজামের সৈন্যদল যাহাতে নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে কোনরূপে খাদ্যাদির সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন।

নিজামের দুর্দ্দশা।

নিজামের সঙ্গে কোহ্লাপুরের মহারাজ সাম্ভাজী ও চন্দ্রসেন যাদব, রাও রম্ভা নিম্বালকর প্রভৃতি মারাঠা সেনানীগণ ছিলেন। নিজাম তাঁহাদিগের সাহায্যে বাজী রাওয়ের পরাভব-সাধনের জন্য মহারাজ সাম্ভাজীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ ঘটায় নিজামের দলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। চন্দ্রসেন বলিলেন,—"আমার সৈন্যদলে মোগল সৈনিকের সংখ্যাই অধিক, তাহারা মারাঠাদিগের ন্যায় সমরকুশল ও কষ্টসহিষ্ণু নহে। এরূপ অবস্থায় আমি একাকী কি করিব"? সাম্ভাজী বলিলেন, আমার সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত সামান্য; পরন্তু আমার কর্ম্মচারীরা গোপনে বাজী রাওয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়াছে বলিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে। অতএব তাহাদিগের হস্তে আমার প্রাপ্য অর্থ প্রদান করিবেন না।" তাঁহার কর্ম্মচারীরা বলিতে লাগিল, "সাম্ভাজীর হস্তে অর্থদান করিলে

তিনি বিলাস-ব্যসনে তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিবেন এবং আমাদিগকে অনশনে কষ্ট-ভোগ করিতে হইবে, সৈনিকেরাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে"। নিজাম বলিতে লাগিলেন, "তোমরাও মহারাষ্ট্রীয়, বাজী রাও-ও মহারাষ্ট্রীয়। তথাপি তোমরা তাহার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং বিপন্ন হইলে এবং আমাকেও বিপন্ন করিলে! তোমাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল!" এইরূপ বৃথা কলহে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। কিন্তু কেহই আসন্ন বিপদ হইতে অব্যাহতি-লাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। এদিকে খাদ্যাভাবে সকলেই দীনভাব ধারণ করিল। বাজী রাওয়ের সৈন্যদল হইতে শন্ শন্ শব্দে গুলি আসিয়া অনেকের ইহ-লীলা সাঙ্গ করিতে লাগিল। তখন নিরুপায় হইয়া নিজাম-উল্-মুল্ক সন্ধিপ্রার্থী হইলেন ও তাঁহার অনশন-ক্লিষ্ট অনুচরগণের জন্য বাজী রাওয়ের নিকট খাদ্য দ্রব্যাদির প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মহত্ব ও সন্ধি।

এই সময়ে অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় সেনানীগণ নিজামের সম্পূর্ণ বিনাশ-সাধনের জন্য বাজী রাওকে কঠোরতা অবলম্বন-পূর্ব্বক যুদ্ধ চালাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহানুভাব বাজী রাও তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, "বিপন্ন শত্রুকে পীড়িত করা বীরধর্ম্মের অনুমোদিত কার্য্য নহে। এই অবস্থায়

নিজামকে রসদ দিয়া ও সহায়তা করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি-স্থাপন করাই আমাদের কর্ত্তব্য।" তদনুসারে উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তায় স্থির হইল,—

(১) নিজাম-উল্-মুল্ক কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর পক্ষ পরিত্যাগ করিবেন।

(২) নিজাম রাজ্যে যে সকল মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী প্রতি বৎসর চৌথ প্রভৃতি আদায় করিতে গমন করেন, তাঁহাদিগের রক্ষার জন্য নিজাম স্বরাজ্যস্থ কতিপয় দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দান করিবেন।

(৩) এবং চৌথ ও সরদেশমুখী সংক্রান্ত সমস্ত প্রাপ্য অবিলম্বে পরিশোধ করিবেন।

১৭২৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ এই সন্ধি স্থাপিত হয়।

পেশওয়ের সাহস।

অতঃপর নিজাম বাজী রাওয়ের অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁহাকে আপনার শিবিরে আহ্বান করিলেন। অসাধারণ-সাহস-সম্পন্ন বাজী রাও দুই তিন জন মাত্র ভৃত্যসহ একাকী শত্রু-শিবিরে গমন-পূর্ব্বক নিজামের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, বাজী রাও নিজামের শিবিরে প্রবেশ করিলে মোগল সুভেদার তাঁহার সাহস পরীক্ষার জন্য একদল অস্ত্রধারী প্রহরীকে আহ্বান করেন। তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে প্রহরিগণ বাজী রাওকে হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া সহসা তাঁহার

বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলিত করে! তখন নিজাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, বাজী রাও! এখন তোমার প্রিয় সর্দ্দার শিন্দে হোলকর কোথায়? এই প্রহরীর দল তোমায় আক্রমণ করিলে এখন কে তোমার রক্ষা করিবে?" এই কথা শুনিবা মাত্র বাজী রাও অসি নিষ্কোশিত করিয়া বলিলেন,—"আমার হস্তে এই তরবারি থাকিলে আমি এরূপ সহস্র প্রহরীর ব্যূহ ভেদ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি। কিন্তু ভবাদৃশ ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাসঘাত করিবেন বলিয়া আমার বোধ হয় না। তবে যদি এরূপ দুর্ঘটনাই ঘটে, তবে আমার শিন্দে হোলকর আমার নিকটেই থাকিবেন।" বাজী রাও এই কথা সমাপ্ত করিতে না করিতে সামান্য ভৃত্যবেশী রাণোজী শিন্দে ও মহ্লার রাও হোলকর অগ্রসর হইয়া নিজামকে অভিবাদন করিলেন! নিজাম এই ব্যাপারে বাজী রাওয়ের অসাধারণ সাহস-দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

"ইস্ মুল্কমে এক বাজী, ঔর সব পাজী!"

এজগতে এক বাজী রাও ভিন্ন আর সকলেই পাজী (অধম)।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বুন্দেলখণ্ডে অভিযান—জেতপুরের যুদ্ধ—হিন্দুরাজ্য-রক্ষা—মস্তানী—বুন্দেলখণ্ডে রাজ্য-লাভ।

পালখেড়ের যুদ্ধ ব্যাপার শেষ করিয়া বাজী রাও ১৭২৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ছত্রসালের নিমন্ত্রণ।

অতপর চারিমাস বর্ষাকাল তিনি বিনা যুদ্ধে অতিবাহিত করেন। শরৎ সমাগমে বিজয়া দশমীর পর তাঁহাকে উত্তর ভারতে অভিযান করিতে হয়। মধ্য ভারতের অন্তর্গত বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রসাল মোগলদিগের আক্রমণে বিপন্ন হইয়া তাঁহাকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। মোসলমানের শাসনপাশ হইতে ভারতবর্ষের উদ্ধার-সাধন এবং হিন্দুস্থানে হিন্দুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই বাজী রাওয়ের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। সুতরাং তিনি অতীব আগ্রহের সহিত ছত্রসালের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর সময়ে বুন্দেলখণ্ডে সর্ব্বত্র মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ছত্রসাল নামক প্রমার বংশীয়

মহম্মদ খান বঙ্গষ

জনৈক ক্ষত্রিয় বীর তাঁহার প্ররোচনায় ঐ প্রদেশ হইতে মোগল শাসন উচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করেন। শিবাজীর উপদেশক্রমে পরিচালিত হওয়ায় তিনি বুন্দেলখণ্ডে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। কিন্তু মোসলমানগণ সহজে বুন্দেলখণ্ডের আশা পরিত্যাগ করিলেন না। অবসর পাইলেই তাঁহারা ঐ প্রদেশ আক্রমণ-পূর্ব্বক পুনরধিকার করিবার চেষ্টা করিতেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ খান বঙ্গষ নামক জনৈক রোহিলা সর্দ্দার এই হিন্দু-রাজ্য নষ্ট করিবার জন্য যত্নশীল হন। তিনি পূর্ব্বে এলাহা-বাদের সুভেদার ছিলেন। ফরক্কাবাদ বা ফরোখাবাদ নগর ইঁহারই দ্বারা স্থাপিত হয়। রাজা ছত্রসাল বিংশতি সহস্র তুরগসৈন্য সহ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াও বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত মহম্মদ খানের আক্রমণ রোধ করিতে পারিলেন না। বঙ্গষের সেনাদল বুন্দেলখণ্ড লুণ্ঠন করিয়া ছারখার করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে নিকটবর্ত্তী হিন্দুরাজন্যবর্গ এ সময়ে বঙ্গষেরই সহায়তা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন নিরুপায় ছত্র-সাল বাজী রাওকে হিন্দুদিগের একমাত্র বন্ধু জানিয়া, তাঁহার নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা-পূর্ব্বক একটী পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের শেষে নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটি লিখিত ছিল,—

"যো গতি গ্রাহ গজেন্দ্রকী, সো গতি ভই হ্যায় আজ।
বাজী জাত বুন্দেলন্‌কী, রাখো বাজী লাজ॥"

অর্থাৎ "পূর্ব্বকালে নক্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গজরাজ যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, আমরাও অদ্য সেইরূপ বিপন্ন হইয়াছি। বুন্দেলাগণ বাজী হারিতেছে, এ সময়ে, হে বাজী রাও! তুমি তাহাদিগের লজ্জা নিবারণ কর।" এই কাতরোক্তিপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া বাজী রাওয়ের হৃদয় মোসলমানদিগের গ্রাস হইতে বিপন্ন হিন্দুরাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি মহারাজ শাহুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বাদশ জন সর্দ্দার ও বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ মহম্মদ খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

খণ্ড যুদ্ধ।

বাজী রাও যখন বুন্দেলখণ্ডে প্রবেশ করিলেন, তখন রাজা ছত্রসাল ও তাঁহার পুত্রগণ বঙ্গষের সৈন্যদল কর্ত্তৃক জেতপুর দুর্গের নিকটে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই কারণে বাজী রাও প্রথমে ঐ দুর্গেরই সমীপবর্ত্তী হইলেন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তাঁহার সহিত বঙ্গষের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাজী রাও স্বীয় সৈন্যদলকে কয়েকটি ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগের একদলকে প্রথমে আক্রমণের আদেশ করিলেন। এই ক্ষুদ্র-দলের সহিত যুদ্ধে বঙ্গষের জয়লাভ হয় ও তিনি স্বস্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হন। তখন মহারাষ্ট্র সৈন্যের অসংখ্য খণ্ড-দলগুলি একবার করিয়া মোসলমানদিগকে আক্রমণ ও এক-বার করিয়া অন্তর্দ্ধান করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের

এই অব্যবস্থিত যুদ্ধ-প্রণালীতে মোসলমানেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ১৬ই মার্চ্চ মহম্মদ খান প্রবল বিক্রমে মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে আক্রমণ করিলে বাজীরাও সসৈন্যে একটি পর্ব্বতের উপত্যকার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং সন্ধ্যাকালে বিদ্যুদ্‌বেগে তথা হইতে বহির্গত হইয়া বঙ্গষের সেনাদলের উপর আপতিত হইলেন। বঙ্গষের সৈন্যগণও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা অগ্রসর হইবা মাত্র তাহাদিগের তোপ-খানা হইতে অজস্রধারায় অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু বাজী রাওয়ের অসাধারণ সমরনৈপুণ্যে সেদিনকার নিশাযুদ্ধে চারি জনের অধিক মহারাষ্ট্র সৈনিক নিহত হইল না। মোসলমানেরা বহু চেষ্টায় মারাঠাদিগের কতিপয় উষ্ট্র ও অশ্ব হস্তগত করিলেন।

বঙ্গষের অবরোধ।

পরদিন আবার উভয় পক্ষের যুদ্ধ আরব্ধ হইল। বাজী রাও স্বীয় খণ্ড-সেনাদলকে মোসলমান-দিগের রসদ আমদানির পথ রুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই মহম্মদ খান বাজী রাওয়ের হস্তে সম্পূর্ণ পিঞ্জরবদ্ধবৎ হইলেন। ক্রমে তাঁহার সৈন্যদলে ঘোর দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার উপস্থিত হইল। অতি কদর্য্য শস্যও ২০ টাকা সের দরে বিক্রীত হইতে লাগিল! তথাপি বঙ্গষ দুই মাস পর্য্যন্ত পরাজয়-স্বীকার করিলেন না। প্রত্যহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে তাঁহার সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল।

বঙ্গষের পরাভব।

ইত্যবসরে মহম্মদ খান বঙ্গষের পুত্র কায়েম খান ত্রিংশৎ সহস্র সৈন্যসহ পিতার সহায়তার জন্য জেতপুর দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সুতরাং বাজী রাওকে স্বীয় সেনাবল-সহ কায়েম খানের অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। জেতপুরের ছয় ক্রোশ দূরে ২৯শে এপ্রিল তারিখে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। তাহাতে কায়েম খানের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়। তাঁহার ১৩টা হস্তী, তিন সহস্র অশ্ব ও ৫০।৬০টি উষ্ট্র মারাঠাগণের হস্তগত হয়। এদিকে অবরুদ্ধ বুন্দেলারা বহির্গত হইয়া মহম্মদ খানের উপর আপতিত হওয়ায় তাঁহারও সম্পূর্ণ পরাভব ঘটিল। তিনি জেতপুরের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তখন মহারাষ্ট্র-সৈন্য জেতপুর অবরোধ করিল। এবার মোসলমানদিগের মধ্যে এরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল যে, তাঁহারা অশ্ব, উষ্ট্র ও গো-গর্দ্দভাদি নিহত করিয়া উদর পূরণ করিতে লাগিলেন। শতমুদ্রার বিনিময়েও একসের গোধূম দুষ্প্রাপ্য হইল! শত্রু পক্ষীয় অনেকে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে শুনিয়া বাজী রাও ঘোষণা করিলেন, "যাহারা অস্ত্রত্যাগ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিবে, তাহাদিগকে মুক্তিদান করা যাইবে।" তখন দলে দলে মোসলমান আসিয়া আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। বাজী রাও সদ্ব্যবহারে তুষ্ট করিয়া সকলকে বিদায় করিলেন। কিন্তু মহম্মদ খান তথাপি বাজী রাওয়ের

শরণাপন্ন না হইয়া স্বীয় পুত্রকে পুনর্ব্বার সসৈন্যে সাহায্য আগমন করিতে পত্র লিখিলেন। পরিশেষে তাঁহার জননী চেষ্টায় ফয়জাবাদ হইতে ক্ষুদ্র একদল মোসলমান সৈন্য ও ৬০ জন পাঠান সর্দ্দার তাঁহার উদ্ধারের জন্য আগম করিলেন। কথিত আছে, তাঁহাদিগের কৌশলে মহম্ম খান বঙ্গষ কোনরূপে অক্ষত শরীরে দুর্গ হইতে পলায় করিতে সমর্থ হন। (১)

পুরস্কার লাভ।

এইরূপে বাজী রাও স্বকীয় পরাক্রম-বলে মহম্মদ খা বঙ্গষকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করি হিন্দুরাজ্য বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষ করিলেন। অতঃপর তিনি ছত্রসালের সহিত সাক্ষাৎ করিে বৃদ্ধ নরপতি হর্ষাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সকলে সমীপে তাঁহাকে স্বীয় তৃতীয় পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য রাজা ছত্রসাল বাজী রাওকে যমুনা-তীরবর্ত্তী ঝাঁশী (ঝানসী) নামক দুর্গ

(১) Vide Syar-ul-Mutakherin, The Bangansh Nawabs of Farrokhabad, Pogson's Boondelas, and the History of the Nawab of Banda.

রস্তম আলির প্রণীত (১৭৪১ খৃঃ) তারিখ-ই-হিন্দ নামক গ্রন্থে বাজী রাওয়ের কয়েকটি অভিযানের প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ আছে। ছত্রসালকে তিনি একলক্ষ তুরগসেনা লইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া রস্তম আলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তচ্চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় সওয়া দুই লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি পুরস্কার-স্বরূপ দান করিয়াছিলেন।

মস্তানী।

এই সময়ে বাজী রাও কয়েক দিন পান্না-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজা ছত্রসাল মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারদিগকে বিবিধ বসন-ভূষণ-দানে সম্মানিত করিলেন। বলা বাহুল্য, বাজী রাওয়ের আদর-সৎকারের সীমা রহিল না। পান্না-নরেশ তাঁহাকে নানা উপঢৌকন-দানে পরিতুষ্ট করিলেন। এই সময়ে বাজী রাও মস্তানী নাম্নী একটি সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপা রমণী-রত্ন প্রাপ্ত হন। এই যুবতী ছত্রসালের কোনও মোসলমান জাতীয়া উপপত্নীর গর্ভজাতা ছিলেন। বাজী রাওয়ের রূপ ও গুণের প্রতি কন্যার পক্ষপাত দেখিয়াই হউক, অথবা তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র ভাবিয়া হউক, ছত্রসাল এই রত্ন-কল্পা কন্যাকে বাজী রাওয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। "বুন্দেলখণ্ডের তওয়ারিখ" নামক উর্দ্দূ ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে, জিতেন্দ্রিয় বাজী রাও বৃদ্ধ রাজার অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও মস্তানীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি এই নৃত্য-গীত-বাদ্য-কুশলা যুবতীর গুণে এরূপ মুগ্ধ হন যে, তজ্জন্য রাজকার্য্যেও তাঁহার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে পারিতেন না। প্রায় সকল অভিযানেই

মস্তানী তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তদ্দর্শনে মহারাজ শাহু অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ভয় প্রদর্শন করেন। কথিত আছে, এজন্য পরিশেষে তাঁহার ভ্রাতা চিমণাজী আপ্পা সন্ন্যাস-গ্রহণ-পূর্ব্বক সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে বাজী রাওয়ের চৈতন্যোদয় হয়।

মস্তানীর বংশ।

পুণার "শনিবার-বাড়া" নামক প্রাসাদে বাজী রাও মস্তানীর বাসের জন্য একটি স্বতন্ত্র "মহল" নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা "মস্তানী মহল" এবং শনিবার-বাড়ার যে দ্বার দিয়া ঐ মহলে গমন করা যায়, 'তাহা মস্তানী দরজা' নামে খ্যাত ছিল। মস্তানীর গর্ভে ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে বাজী রাও একটি পুত্র লাভ করেন। তাহার নাম সমশের বাহাদুর। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সর্ব্বনাশ-কালে সমশের বাহাদুর যথোচিত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি পরবর্ত্তী পেশওয়ের কার্য্য-কালে মহারাষ্ট্র সমাজের প্রসিদ্ধ সর্দ্দার শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আলী বাহাদুর পেশওয়ে মাধব রাও নারায়ণের সময়ে ৪০ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক বুন্দেলখণ্ডের পরস্পর-বিবদমান নরপতি-গণের পরাজয় সাধন করিয়া বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকা আয়ের প্রদেশ অধিকার করেন। পেশওয়ের আদেশে মধ্য ভারতের বান্দা নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি নবাব উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশ-ধরেরা অদ্যাপি "বান্দার নবাব" নামে পরিচিত। ১৮০৩

বান্দার নবাব।

খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রপতি শেষ বাজী রাও যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত মার্কুইস অব ওয়েলেসলির প্রবর্ত্তিত "সবসিডিয়ারি সিষ্টেম"-সূত্রে আবদ্ধ হন, তখন বান্দার নবাবকে ইংরাজের সৈন্য-পোষণের ব্যয়-স্বরূপ বার্ষিক ৩৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা আয়ের রাজ্যাংশ পরিত্যাগ করিতে হয়। কাল-প্রভাবে মস্তানীর বর্ত্তমান-বংশধরেরা এক্ষণে ইন্দোরের রাজকুমার কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া মধ্য ভারতবর্ষের পোলিটিক্যাল এজেণ্টের অধীনতায় বার্ষিক ৩৬ হাজার টাকা বৃত্তি লইয়া বাস করিতেছেন। সে যাহা হউক, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল খানদেশে বাজী রাওয়ের মৃত্যু হইলে মস্তানী তাঁহার চিতায় আরোহণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন।

১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা ছত্রসালের মৃত্যুকালে বাজী রাও

বুন্দেলখণ্ডে রাজ্যলাভ।

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজা তাঁহাকে রাজ্যের তৃতীয়াংশ দান করেন। তদবধি বুন্দেলখণ্ড চৌথ-পদ্ধতিসূত্রে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের আশ্রয়াধীন হয়। এইরূপে বঙ্গষকে পরাজিত করিয়া বাজী রাও বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে বার্ষিক ৩৩৷৷০ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যাংশ ও পান্নার হীরক

খনির তৃতীয়াংশ লাভ করেন। ১৭৩৮ খৃঃ মহম্মদ খান বঙ্গষ দ্বিতীয় বার বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেবারেও বাজী রাও ছত্রসালের পুত্র জগৎরাজের সহায়তায় ধাবিত হন। পুনর্ব্বার বঙ্গষের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। কথিত আছে, তিনি "নারী-বেশে" বাজী রাওয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রাণভিক্ষা ও বুন্দেলখণ্ডকে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন।

গোবিন্দরাও বুন্দেলা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-সর্দ্দারের প্রতি পূর্ব্বোক্ত ৩৩ লক্ষ ৫০ সহস্র মুদ্রা আয়বিশিষ্ট প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করা হয়। কাল্পী ও সাগর প্রভৃতি নগর গোবিন্দ রাও কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে মহারাষ্ট্র শক্তির প্রতাপ গোবিন্দ রাওয়ের বাহু-বলেই অক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। পানিপথের যুদ্ধে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

সপ্তম অধ্যায়।

গুজরাথে চৌথ-প্রবর্ত্তন—ডভইর যুদ্ধে সেনাপতির পরাভব—সিদ্দিদিগের দমন।

গুজরাথের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনেক দিন হইতে দৃষ্টি ছিল। নিজামের সহিত প্রথম যুদ্ধকালে বাজী রাও একবার গুজরাথ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় ভ্রাতা চিমণাজীকে মালবে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বহু সৈন্য সহ গুজরাথে উপস্থিত হইলেন, এবং তত্রত্য সুভেদার সরবুলন্দ খানকে জানাইলেন যে, তিনি যদি মহারাষ্ট্রপতি মহারাজ শাহুর সার্ব্বভৌম শাসনচ্ছত্রতলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া গুজরাথে চৌথ-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন ও সরদেশমুখী স্বত্ব মারাঠাদিগকে দান করেন, তাহা হইলে পেশওয়ে গুজরাথের শান্তি-রক্ষার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। ইহার পূর্ব্বে মহারাজ শাহু তদানীন্তন সেনাপতি ত্র্যম্বক রাও দাভাড়ে, পিলাজী গায়কোয়াড় ও কণ্ঠাজী কদম প্রভৃতি মারাঠা সর্দ্দারের প্রতি গুজরাথ-বিজয়ের আদেশ

গুজরাথের চৌথ।

প্রদান করিয়াছিলেন। তত্রত্য সুভেদার সরবুলন্দ খান প্রথমে প্রাণপণে তাঁহাদিগের গতিরোধের চেষ্টা করেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি দিল্লীর দরবারে সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর তখন বিলাস-সাগরে মগ্ন থাকায় সে প্রার্থনা ফলোপধায়িনী হইল না। কাজেই সরলবুলন্দকে মহারাষ্ট্র সর্দ্দারগণের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইল। তিনি মহারাষ্ট্রপতিকে চৌথ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পিলাজী গায়কোয়াড় ও কণ্ঠাজী কদম প্রভৃতি মারাঠা সর্দ্দারেরা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সমস্ত গুজরাথ পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠন পূর্ব্বক ছারখার করিতে লাগিলেন। গুজরাথবাসীর দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। তদ্দর্শনে দুঃখিত হইয়া বাজী রাও সরবুলন্দ খানের নিকট পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করেন। বলা বাহুল্য, মোগল সুভেদার সে প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। অতঃপর উভয়ের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হইল, তদনুসারে,—

(১) সুরত প্রদেশ ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্ত গুজরাথের চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব মহারাজ শাহুর প্রাপ্য হইল।

(২) গুজরাথ-বাসীকে দস্যু তস্করাদির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মহারাষ্ট্র-পতি সর্ব্বদা সার্দ্ধ দ্বিসহস্র তুরগ-সৈন্য গুজরাথে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

(৩) গুজরাথের বিদ্রোহপ্রিয় জমিদারদিগকে কোনও

মহারাষ্ট্রীয় অতঃপর কোন প্রকারে সহায়তা করিতে পারিবেন না, ইহাও স্থির হইল।

সেনাপতির বিরাগ।

এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকালে বাজী রাও প্রধান সেনাপতি ত্র্যম্বক রাও দাভাড়েকে গুজরাথে মোকাসা ও সরদেশমুখী স্বত্বের একাংশ প্রদান করেন। কিন্তু সেনাপতি দাভাড়ে ও তাঁহার সহচর কদম, গায়কোয়াড় প্রভৃতি সর্দ্দারেরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। কারণ, এই সন্ধির ফলে তাঁহাদিগের যথেচ্ছাচারের পথ রুদ্ধ হইল। বাজী রাওয়ের সর্ব্বত্র প্রতিপত্তিদর্শনে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগের মনে বিদ্বেষের সঞ্চার হইয়াছিল। বিশেষতঃ বাজী রাও এই ব্যাপারে সেনাপতি প্রভৃতির মতামত আদৌ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে অধিকতর অবজ্ঞাত বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

নিজামের কৌটিল্য।

ইতঃপূর্ব্বে নিজাম-উল্-মুল্ক বাজী রাওয়ের হস্তে পরাজিত হওয়ায় স্বীয় অবমাননার প্রতিশোধ লইবার অবসর খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ থাকায় প্রকাশ্যভাবে তাঁহার শত্রুতাচরণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। এই কারণে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে গোপনে সহায়তা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময়ে দাভাড়ে প্রভৃতির অসন্তোষের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর

হয়। তৎশ্রবণে অতীব আনন্দিত হইয়া তিনি এই বিদ্বেষাগ্নিতে ইন্ধন-প্রক্ষেপের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এই গৃহ-বিবাদে সেনাপতিকে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় ত্র্যম্বক রাও সসৈন্যে বাজী রাওকে আক্রমণ করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে নিজাম তাঁহাকে সৈন্যদল বৃদ্ধির জন্য অর্থ-সাহায্য পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। পিলাজী গায়কোয়াড় প্রভৃতি কয়েকজন সেনানী পূর্ব্ববিদ্বেষ-বশে দাভাড়ের সহায় হইলেন। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই সেনাপতি ৩৫ সহস্র সৈন্যসহ গুজরাথ হইতে বাজী রাওয়ের সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য পুণা অভিমুখে অভিযান করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, বাজী রাওয়ের প্রতিপত্তি অতিমাত্র বর্দ্ধিত হওয়ায় মহারাজ শাহুর শক্তি খর্ব্ব হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই কারণে তিনি পেশওয়ের দর্প চূর্ণ করিয়া শাহুর ক্ষমতা অব্যাহত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন এবং দ্বাদশ জন প্রসিদ্ধ মারাঠা সেনানী এই কার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা পরস্পরের প্রতি চিরকাল বদ্ধবৈর ছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকে আপনাদিগের বিবাদ ভুলিয়া এ সময়ে বাজী রাওয়ের বিনাশের জন্য সেনাপতির সহিত যোগদান করিলেন। ফলতঃ অল্পবয়সে বাজী রাওয়ের অসাধারণ উন্নতি ও প্রতিপত্তি অনেকেরই চিত্তে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষের সঞ্চার করিয়াছিল।

বাজী রাও এই সংবাদ অবগত হইয়া প্রথমে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। কিন্তু তিনি যখন

পেশওয়ের ঘোষণা।

শুনিলেন যে, নিজাম-উল্‌-মুল্কের প্ররোচনায় এই গৃহ-বিবাদের উৎপত্তি হইয়াছে এবং সেনাপতির সহায়তার জন্য স্বয়ং নিজাম সসৈন্যে আগমন করিতেছেন, তখন তিনি যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সেনা সংগ্রহ-পূর্ব্বক সেনাপতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, "সেনাপতি হিন্দু হইয়াও নিজামের পরামর্শক্রমে মহারাষ্ট্র-রাজ্যে গৃহবিবাদের সূচনা করিতেছেন। তাঁহার এই কার্য্য হিন্দু ধর্ম্মের ও প্রকৃষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধ। অতএব যাঁহারা স্বরাজ্যের প্রকৃত-মঙ্গলকামী, যাঁহাদিগের ধমনীতে বিন্দুমাত্র হিন্দুশোণিত প্রবাহিত হইতেছে, এ সময়ে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সেনাপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ত্তব্য।" এই ঘোষণার ফলে বাজী রাওয়ের সৈন্যদল কিয়ৎ পরিমাণে পরিপুষ্ট হইল। এইরূপে সৈন্যসংগ্রহের পূর্ব্বে বাজী রাও এই বিপদ্‌বার্ত্তা পত্র দ্বারা মহারাজ শাহুর কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ব্বল মহারাজ সেনাপতির দমনে অসমর্থ হইয়া বাজী রাওকে দাভাড়ের সহিত বিরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাজী রাও ও চিমণাজী আপ্পা আত্ম-রক্ষার জন্য ১৮ সহস্র সৈন্য

সন্ধির প্রস্তাব।

লইয়া সেনাপতি ত্র্যম্বক রাও দাভাড়ের

বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা গুজরাথে উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই সেনাপতির নিকট সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিতেছিলেন। কিন্তু গৃহবিবাদ যে অনর্থের মূল, একথা না বুঝিয়া ও পেশওয়েকে ভীত ভাবিয়া সেনাপতি একেবারে যুদ্ধারম্ভ করিয়া দিলেন। বাজী রাও নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে সহসা পিলাজীর পুত্র দামাজী গায়কোয়াড় তাঁহার জনৈক সর্দ্দারকে অনপেক্ষিতভাবে আক্রমণ-পূর্ব্বক পরাস্ত করায় সন্ধির আশা সুদূরপরাহত হইল। বাজী রাও এই পরাজয়ে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। নিজামের সেনা যাহাতে গুজরাথে প্রবেশ করিতে না পারে, তিনি পূর্ব্বাহ্লেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিজামও বাজী রাওয়ের বিক্রমের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি এ সময়ে প্রকাশ্যভাবে বাজী রাওকে আক্রমণ-পূর্ব্বক সদ্যঃকৃত সন্ধি ভঙ্গ করিতে সাহসী হইলেন না।

সেনাপতির পরাজয়।

বাজী রাও সসৈন্যে ধীরে ধীরে কুচ করিতে করিতে বড়োদা (Baroda)ও ডভই নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী বিশাল প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ঐ স্থানে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম ঘটিল। বাজী রাওয়ের অদ্ভুত সৈনাপত্যগুণে ৩৫ সহস্র সৈন্যসহ বিপক্ষদল পরাজিত হইলেন। স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া

স্বয়ং ত্র্যম্বক রাও হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ হস্তে বাজী রাওয়ের সমীপবর্ত্তী হইলেন ও তাঁহার সৈন্যের বিনাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দুঃখিত হইয়া বাজী রাও তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন,—"শত্রুর সহিত যুদ্ধে এরূপ শৌর্য্য ও সমর-কৌশল প্রকাশ করিলে, মহারাজের সন্তোষ ও যশঃ উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে। আমার উপর এ বীরত্ব-প্রকাশ কেন? আপনি যুদ্ধ স্থগিত করুন, আমি আপনার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেছি।" কিন্তু সেনাপতির রণোন্মাদ কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। তখন বাজী রাও স্বীয় সেনাদলে আদেশ প্রচার করিলেন,—"সেনাপতির প্রতি কেহ অস্ত্র-ত্যাগ করিও না"। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে যখন উভয় পক্ষে আবার ঘোর যুদ্ধ আরব্ধ হইল, তখন একজন সৈনিকের বন্দুকের গুলি সহসা সেনাপতির কর্ণমূল ভেদ করায় তিনি নিহত হইলেন। পিলাজী রাও গায়কোয়াড়ের দুই পুত্রও এই যুদ্ধে নিহত হন। স্বয়ং পিলাজী রাও আহত হইয়া পলায়ন করেন। বাজী রাওয়ের প্রিয় সর্দ্দার হোলকর ও শিন্দে এই যুদ্ধেও বিশেষ বিক্রম-প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এইরূপে বিজয়ী হইয়া পেশওয়ে সাতারায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে প্রতিনিধি শ্রীপতি রাও তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা মহারাজ শাহুর

সখ্য ও সন্ধি।

কর্ণগোচর করিলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে মহারাজ অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাজী রাও তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করায় তাঁহার বিরাগ দূরীভূত হইল। তিনি ভূতপূর্ব্ব সেনাপতির পুত্র যশোবন্ত রাওকে সৈনাপত্য প্রদান-পূর্ব্বক বাজী রাওয়ের সহিত তাঁহার সখ্য স্থাপন করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আর যাহাতে কোনও প্রকারে বিসংবাদ না ঘটে,সে জন্য তিনি উভয়ের নিকট হইতে লিখিত প্রতিজ্ঞা-পত্র গ্রহণ করিলেন (১)। তদবধি গুজরাথের সম্পূর্ণ শাসনভার সেনাপতির উপর অর্পিত হইল। মালবে বাজী রাও সর্ব্ব-প্রধান হইলেন। পরন্তু ইহাও স্থির হইল যে, গুজরাথের রাজস্বের অর্দ্ধাংশ বাজী রাওয়ের হস্ত দিয়া রাজ-

(১)। মহারাজ শাহু, এই প্রতিজ্ঞাপত্র গ্রহণের পর ত্র্যম্বক রাওয়ের জননী উমাবাঈয়ের হস্তে বাজী রাওকে অর্পণ এবং গতানুশোচনার ত্যাগ-পূর্ব্বক পেশওয়ের প্রতি অপত্যবৎ স্নেহ-প্রকাশ করিতে তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। বাজী রাও-ও তাঁহাকে জননী বলিয়া সম্বোধন ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় উমাবাঈয়ের ক্রোধশান্তি হইল। এই রমণী অসামান্যা তেজস্বিনী ছিলেন। পৌত্র যশোবন্ত রাও দাভাড়ের অপ্রাপ্তব্যবহার-কালে তিনি স্বয়ং শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানাদি করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি একদা আহম্মদাবাদের সুভেদার জোরাবর খান বাবী-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি স্বয়ং রণরঙ্গিণী বেশে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক যেরূপ অলৌকিক শৌর্য্য সহকারে যুদ্ধ-পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রীত হইয়া মহারাজ শাহু তাঁহাকে পুরস্কার-স্বরূপ সুবর্ণ-বলয় দান করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে এই বীর রমণীর মৃত্যু ঘটে।

কোষে প্রেরিত হইবে, এবং সরবুলন্দ খানের নিকট হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রদেশের রাজস্ব সেনাপতি স্বয়ং রাজসরকারে প্রেরণ করিবেন। এই সময়ে মহারাজ শাহুর চেষ্টায় পিলাজী গায়কোয়াড়ের সঙ্গেও বাজী রাওয়ের সখ্য হয় এবং গায়কোয়াড় শাহুর নিকট "সেনা-খাস-খেল" উপাধি লাভ করেন (১৭৩১ খৃঃ আগষ্ট)।

দক্ষিণা।

সেনাপতি ত্র্যম্বক রাও দাভাড়ে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে দেশবিদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য অনুসারে তাঁহাদিগকে দক্ষিণাদি দানে পুরস্কৃত করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই দক্ষিণা-দান-কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। মহারাজ শাহুর অনুমতি লইয়া বাজী রাও উহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করেন। এই কার্য্যে তাঁহার বার্ষিক ৬০।৭০ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইত। তাঁহার পুত্র পেশওয়ে বালাজী বাজী রাওয়ের আমলে এই দক্ষিণার ব্যয় বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইংরাজেরাও ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দানকার্য্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে ঐ টাকার একাংশ শাস্ত্রালোচনাপ্রিয় কতিপয় ব্রাহ্মণ-পরিবারকে প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া অবশিষ্ট টাকা "দক্ষিণা প্রাইজ কমিটি"-র কার্য্যে ও "দক্ষিণা ফেলোশিপ'' পরীক্ষায় নিয়োজিত করা হইয়াছে। "দক্ষিণা-প্রাইজ

কমিটি” হইতে অদ্যাপি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় নূতন বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-লেখকেরা যোগ্যতানুসারে ৫০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নিজামের সহিত সন্ধি।

সেনাপতির সহিত বিরোধ-শান্তির পর বাজী রাও নিজামকে এই গৃহবিবাদের মূল জানিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া নিজাম সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তিনি অতঃপর মহারাষ্ট্রীয়-দিগের কোনও ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং বাজী রাওকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বত্র আধিপত্যস্থাপন করিতে দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় বাজী রাও তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। এই সময়ে কিছুদিন সাতারায় অবস্থান-পূর্ব্বক রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার দ্বারা বাজী রাও স্বদেশবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির পথ পরিষ্কৃত করেন। পরবর্ত্তী বর্ষে মালবে গমনকালে নিজামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তখন স্থির হয় যে, মালবে গমনাগমন-কালে বাজী রাওয়ের সৈন্য খানদেশে নিজামের অধিকারভুক্ত স্থানে উপদ্রব করিতে পারিবে না; পক্ষান্তরে নিজামও চৌথ ও সরদেশমুখীর টাকা বিনা তাগাদায় পেশওয়ের হস্তে যথানিয়মে প্রতিবৎসর প্রদান করিবেন।

১৭২৬ খৃঃ হইতে জঞ্জীরার সিদ্দিদিগের সহিত মহারাষ্ট্র-

সিদ্দির অত্যাচার।

পক্তির বিরোধ চলিতেছিল। সিদ্দিগণ কোনও ছিদ্র পাইলেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের দেবমন্দিরাদি ভূমিসাৎ ও অন্য প্রকারে তাঁহাদিগের ক্ষতি-সাধন করিতে বিরত হইতেন না। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পবিত্র শিবরাত্রি দিবসে অঞ্জনবেলের সুভেদার সিদ্দি সাদ কোঙ্কণের অন্তর্গত পরশুরাম ক্ষেত্র আক্রমণ-পূর্ব্বক তত্রত্য দেবমন্দির সম্পূর্ণ বি[illegible]স্ত করেন। শ্রীমদ্‌ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী নামক একজন খ্যাতনামা সন্ন্যাসীর চেষ্টায় সেই দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ, বাজী রাও ও অন্যান্য বহু সংখ্যক মারাঠা সর্দ্দারের দীক্ষা-গুরু ছিলেন। মহারাজ শাহুরও তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। সিদ্দি সাদের অত্যাচার-সম্বন্ধে স্বামীজীর স্বহস্তলিখিত এক-খানি পত্রে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে প্রকাশ যে, দুষ্ট সিদ্দি ২।৩ শত সৈনিকসহ পবিত্র শিবরাত্রি দিবসে পরশুরাম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভার্গবরামের মন্দির ভূমিসাৎ করিয়া নগদ প্রায় ১২ হাজার টাকা ও দেবালয় সংস্পৃষ্ট বহুমূল্য দ্রব্যাদি অপহরণ করে। তদ্ভিন্ন তত্রত্য ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের কর্ম্মচারিগণের গৃহ-লুণ্ঠন এবং অপরাপর লোকদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতেও তাহারা বিরত হয় নাই। পরন্তু স্বামীজীর গুপ্তধনের সন্ধান পাইবার আশায় তাঁহার তিন জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে দুর্ব্বৃত্ত সিদ্দিগণ গুরুতর প্রহারে

মৃতকল্প করিয়া ছাড়িয়া দেয়! ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী সে সময়ে ভিক্ষা-সংগ্রহের জন্য সাওনূর (Savnoor) অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র দুঃখিত হন। অতঃপর পরশুরাম ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক দেবালয় ও দেববিগ্রহের দুর্দ্দশা দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি "দেব-ব্রাহ্মণের উচ্ছেদকারী শীঘ্রই উৎসন্নের পথে যাইবে" বলিয়া সিদ্দিদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

এই ব্যাপারে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রোষানল প্রজ্বলিত হইবে ভাবিয়া সিদ্দি সাদ ভীতচিত্তে স্বামীজীর নিকট আসিয়া কৃত-অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

অত্যাচারে ক্ষমা।

জঞ্জিরার অধিপতি ইয়াকুত খানও এই দুর্ঘটনার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া পরশুরাম ক্ষেত্র হইতে অপহৃত সমস্ত দ্রব্যই স্বামীজীর নিকট প্রতিপ্রেরণ করেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, স্বামীজীর স্বহস্তলিখিত পত্রে প্রকাশ যে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দুইটী গ্রাম দেবোত্তর-স্বরূপ দান করিতেও খান মহোদয় প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী তাহা গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। মহারাজ শাহু ও বাজী রাও সেই সময়েই স্বামীজীর এই অবমাননার প্রতিবিধান করিবেন বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু বাজী রাওয়ের বুন্দেলখণ্ড ও মালব প্রদেশে অবিলম্বে অভিযান করিবার প্রয়োজন উপস্থিত

হওয়ায় এবং মহারাজ শাহু কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর শক্তি-হ্রাস করিবার আয়োজনে ব্যস্ত থাকায় তাঁহাদিগের সিদ্দি সাদের দমনে মনোযোগী হইবার অবকাশ ছিল না। বিশেষতঃ সিদ্দি ইয়াকুত খান তাঁহার সুভেদারের কার্য্যে যেরূপ ক্ষোভ-প্রকাশ-পুরঃসর স্বামীজীর ক্ষতি-পূরণ করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে অগৌণে অভিযান করিবার বিশেষ প্রয়োজনও বোধ হয় তখন অনুভূত হয় নাই।

প্রতিনিধির অভিযান।

মহারাজ শাহু ও বাজী রাওকে অন্যান্য রাজনীতিক সমস্যার মীমাংসায় লিপ্ত দেখিয়া সিদ্দিদিগের সাহস আবার বাড়িয়া গেল। তাহারা প্রথমে গোপনে পরশুরাম ক্ষেত্রবাসীর ও ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর কর্ম্মচারিবৃন্দের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। পরে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রবলপ্রতাপ কাহ্নোজী আংগ্রের মৃত্যু হইলে সিদ্দিগণ নির্ভয়ে কোঙ্কণের অধিবাসী-দিগের উপরও ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিল। এমন কি, মহারাষ্ট্রীয়দিগের শাসনাধীন প্রদেশ হইতে বলপূর্ব্বক কর আদায় করিতেও তাহারা শঙ্কাবোধ করিল না। এই কারণে ১৭৩০ খৃঃ মহারাজ শাহু প্রতিনিধি শ্রীপতি রাও ও অপর কতিপয় সেনানীকে সিদ্দিদিগের বিরুদ্ধে কয়েক বার প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের কেহই সিদ্দিদিগকে

বশীভূত করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে সিদ্দিগণ বিজয়-লাভে উন্মত্ত হইয়া হিন্দু প্রজাদিগকে বল-পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করাইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন! কাজেই হিন্দুজাতির রক্ষক বাজী রাওকে মালব হইতে আহ্বান করিতে হইল। বাজী রাও রাণোজী শিন্দে ও মহ্লার রাও হোলকরকে মালবে রাখিয়া ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে স্বয়ং জঞ্জীরা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বাজী রাও এক দল মহারাষ্ট্র সৈন্য লইয়া স্থলপথে এবং কান্হোজী আংগ্রের পুত্র সেখোজী আংগ্রে ও মানাজী আংগ্রে আপনাদের রণতরণীসমূহ লইয়া জলপথে সিদ্দিদিগকে আক্রমণ করিলেন। বাজী রাওয়ের বিজয়ী সৈন্যদল সংখ্যায় অল্প হইলেও অল্প দিনের মধ্যেই "তলে" "ঘোসালে" নামক দুর্গ এবং অবচিতগড়, বীরবাড়ী, নিজামপুর প্রভৃতি ৭।৮টী স্থান বাহুবলে সিদ্দি-দিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। এদিকে মে মাসের প্রারম্ভে আংগ্রের রণতরীসমূহ সিদ্দিদিগের "জঞ্জীরা" নামক জলদুর্গ আক্রমণ করে। সিদ্দিগণও সেকালে জল-যুদ্ধে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু যখন আংগ্রের তিন শত টন ভারবাহী বহুসংখ্যক সমরপোত হইতে ৯ পাউণ্ড ও ১২ পাউণ্ড ওজনের অগ্নিগোলকসমূহ অজস্র ধারায় বর্ষিত হইতে লাগিল, তখন সিদ্দিদিগের রণতরীসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া

জল-যুদ্ধ।

সমূলে নষ্ট হইল! ফলে সিদ্দিদিগের বহুসংখ্যক কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলা, গুলি ও অন্যান্য যুদ্ধসম্ভারসমূহ মহারাষ্ট্রীয়গণ হস্তগত করিলেন। যুযুৎসু সিদ্দিগণ তথাপি হতাশ হইলেন না। তাঁহারা স্থলপথে বাজী রাওয়ের ও জলপথে আংগ্রের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিয়াও প্রকৃত বীরের ন্যায় অটল রহিলেন এবং বোম্বায়ের ইংরাজ, হায়দ্রাবাদের নিজাম ও দিল্লীর বাদশাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা সে সময়ে বিশেষ ফলোপধায়ক হয় নাই। পোর্ত্তুগীজেরা গোপনে তাঁহাদিগের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু পরাক্রমশালী আংগ্রের নৌবল পোর্ত্তুগীজদিগের দমনে অগ্রসর হইলে তাঁহারা ভীত হইয়া নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিলেন।

জুন মাসের শেষে পেশওয়ে ও আংগ্রের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে জঞ্জীরার সিদ্দিগণ একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন।

ইংরাজের ভয়।

অতুল সাহসের সহিত বার বার যুদ্ধ করিয়াও তাঁহারা বিজয়-লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষায় অসমর্থ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া বোম্বাইস্থিত ইংরাজদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কারণ, ইংরাজেরা সে সময়ে বাণিজ্য-ব্যপদেশে এদেশে আসিয়া পশ্চিম ভারতে—আরব সমুদ্রের উপকূলে আপনাদের শক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। এত-

দুদ্দেশ্যে বিনা শুল্কে ব্যবসায় পরিচালন, মহারাষ্ট্র-শাসনাধীন স্থানসমূহে আপনাদের আধিপত্য-স্থাপন, দেশীয় সমুদ্রযাত্রী-দিগকে অকারণে লুণ্ঠন প্রভৃতি অবৈধ কার্য্যেও তাঁহারা বিরত হইতেন না। এই কারণে মহারাজ শাহু নৌ-সেনাপতি আংগ্রের প্রতি ইংরাজের দমনপূর্ব্বক পশ্চিম সমুদ্রেরতীরবর্ত্তী স্থানসমূহে মহারাষ্ট্র-শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভারার্পণ করিয়াছিলেন। কাহ্নোজী আংগ্রের সময়ে তাঁহার নৌবলের হস্তে কয়েকবার ইংরাজ-রণ-তরীসমূহকে বিশেষ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা পোর্ত্তুগীজ ও সিদ্দিদিগের নৌবলের সাহায্য লইয়াও আংগ্রের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। প্রবলপরাক্রম আংগ্রের নৌবল ঐ সকল বৈদেশিক জাতির সমবেত নৌশক্তিকে পরাস্ত করিয়া মহারাষ্ট্র রাজশক্তির অজেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তাই এক্ষণে সিদ্দিদিগের শক্তি-নাশ ও মহারাষ্ট্রীয় নৌ-বলের অসাধারণ বিক্রম দেখিয়া ইংরাজের হৃদয়ে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হইল। তাঁহারা আংগ্রের দমন ও সিদ্দিদিগের রক্ষার জন্য বোম্বাই হইতে জঞ্জীরায় চারিটী বড় এবং ৬।৭টী ছোট সুসজ্জিত যুদ্ধ-জাহাজ ও খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি প্রেরণ করিলেন। তদ্ভিন্ন সিদ্দি-দিগের অঞ্জনবেল দুর্গের রক্ষার নিমিত্ত একটী প্রকাণ্ড বৃটিশ রণপোত ও উন্দেরী নামক দুর্গস্থিত সিদ্দিদিগের সহায়তার জন্য ১২৫ জন গোরা সৈনিক, ১৩টী তোপ, ৬০ পিপা বারুদ, এক

শত বন্দুক ও অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী বোম্বাই হইতে প্রেরিত হইল। তদ্দর্শনে মহারাষ্ট্র নৌসেনানী ষষ্টি সংখ্যক সমরপোত লইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথম বোম্বায়ের সমীপবর্ত্তী উন্দেরী দুর্গ আক্রমণ করিয়া ভীষণ অগ্নি-বর্ষণে তত্রত্য সিদ্দিদিগকে জর্জ্জরিত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধারম্ভের অল্পকাল পরেই বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় প্রায় চারি মাস কাল যুদ্ধকার্য্য স্থগিত রহিল। ইংরাজকে এই দুর্গে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া আংগ্রে তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে ইংরাজেরা সত্যের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া বলিলেন, তাঁহারা উন্দেরী দুর্গ সিদ্দি-দিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন! বলা বাহুল্য, এই কল্পিত উত্তরে মহারাষ্ট্রীয়গণ সন্তুষ্ট হন নাই।

বর্ষার পর পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইবার পূর্ব্বে দুর্ভাগ্যক্রমে শেখোজী আংগ্রের মৃত্যু হইল। তাঁহার উভয় পুত্রের মধ্যে কলহ উপস্থিত হওয়ায় ইংরাজের দমনে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। ইংরাজও গোপনে এই উভয় ভ্রাতার কলহাগ্নিতে ইন্ধনপ্রক্ষেপ করিতেছিলেন। এদিকে সুরত হইতে সিদ্দি মসুদ স্বীয় নৌ-বলসহ জঞ্জীরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ শাহু গুজরাথ-স্থিত সেনানী গায়কোয়াড় ও দাভাড়ের প্রতি সিদ্দি মসুদের গতি-রোধ করিবার জন্য দুই বার

সন্ধি।

আদেশপত্র লিখিলেন। কিন্তু বাজী রাওয়ের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ তাঁহারা সে আদেশ-পালনে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ফলে সিদ্দির বল অতীব বৃদ্ধি পাইল। এদিকে উত্তরভারতেও একটী রাজনীতিক সমস্যা উপস্থিত হইল। তখন বাজী রাও ও শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী ভেদনীতির সাহায্যে ইংরাজকে ও সিদ্দি সর্দ্দার আবদুল রহমানকে বশীভূত করিয়া জিঞ্জীরার সিদ্দিদিগকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন। এই সন্ধির ফলে সিদ্দিগণের ১১টী মহালের আয়ের অর্দ্ধাংশ মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন মহাত্মা শিবাজীর রাজধানী রায়গড় ও অপর চারিটী প্রসিদ্ধ দুর্গও তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। এইরূপে সিদ্দিদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাজী রাও ১৮৩৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর রাজধানী সাতারায় উপনীত হইলেন। তাঁহার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ শাহু বাজী রাওকে রায়গড় ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

মালব-অধিকার—বাদশাহী প্রদেশ আক্রমণ—মোগলদিগের পরাজয়।

গুজরাথের বিশৃঙ্খলা নিবারিত ও নিজামের সহিত সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় দক্ষিণ ভারতে সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইত্যবসরে মালবে ও মোগল সাম্রাজ্যে যে সকল রাজনীতিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাতে তৎপ্রতি বাজী রাওয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্র অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য রাজ-পুরুষেরা প্রজার উপর স্বেচ্ছামত অত্যাচার করিতেন। মোগলদিগের দুর্ব্ব্যবহারে ও জিজিয়া করের জন্য রাজপুতনার হিন্দু রাজন্যবর্গ নিতান্ত উত্ত্যক্ত হইয়া মোসলমান সাম্রাজ্যের বিলোপ-কামনা করিতেছিলেন। এই কারণে তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবর্দ্ধমান শক্তি এবং স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির রক্ষায় অনুরাগ সন্দর্শনে আশ্বস্ত হইয়া মোগলদিগের দমনে তাঁহাদের সহায়তা-গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

হিন্দুস্থানে অসন্তোষ।

মালবে অরাজকতা।

এই সময়ে মালবের রাজা গিরিধরের মৃত্যু হওয়ায় তদীয় আত্মীয় দয়া বাহাদুর সেই প্রদেশের সুভেদারী লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্রূরতায় ও অত্যাচারে মালববাসী নিতান্ত দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছিল। অতিরিক্ত কর-ভারে ও রাজস্ব-কর্ম্মচারীদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারে প্রপীড়িত হইয়া তত্রত্য কৃষককুল আর্ত্তনাদ করিতেছিল। মালবের ঠাকুরেরা (জমীদারেরা) সুভেদারের অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বহুবার দিল্লীর দরবারে প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফললাভ হয় নাই। তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া হিন্দু-জাতির আশ্রয়-স্থল বাজী রাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। এই সময়ে জয়পুরের অধিপতি মহারাজ সওয়াই জয়সিংহ মহোদয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনুরাগী ও হিন্দুদিগের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মোগল দরবারেও তাঁহার বিশেষ প্রতি-পত্তি ছিল। কিন্তু অত্যাচার-পরায়ণ মোগল সুভেদার-দিগের হস্ত হইতে দুর্ব্বল হিন্দু প্রজার রক্ষা করিতে পারেন, এরূপ সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। তথাপি হিন্দুদিগের দুর্দ্দশা-দর্শনে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। এই কারণে তিনি মালববাসীর ও রাজপুতনার সমস্ত রাজন্যবর্গের অনুরোধ-ক্রমে বাজী রাওকে উত্তর ভারতে অভিযান-পূর্ব্বক মোগল-দিগের শাসন-পাশ হইতে হিন্দুদিগের উদ্ধার সাধন করিবার

জন্য গোপনে আহ্বান করিলেন। বলা বাহুল্য, বাজী রাওয়ের পক্ষে এই নিমন্ত্রণের আবশ্যকতাই ছিল না। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও হিন্দু প্রজার বিড়ম্বনা দেখিয়া ইতঃপূর্ব্বেই উত্তর ভারতে মহারাষ্ট্র-শাসন প্রবর্ত্তিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সওয়াই জয়সিংহ-প্রমুখ রাজপুত নরপতিদিগের আহ্বানে তিনি অতীব উৎসাহ-সহকারে মালবের মোগল-শাসন উচ্ছিন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন।

মালব বিজয়।

এই সময়ে রাজধানী সাতারায় তাঁহার উপস্থিতি আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় বাজী রাও স্বীয় যশস্বী সেনানী মহ্লার রাওয়ের প্রতি মালবে অভিযানের ভার অর্পণ করিলেন। মহ্লার রাও দ্বাদশ সহস্র সেনা সহ বুহ্রানপুরে উপস্থিত হইলে ইন্দোরের জমিদার রাও নন্দলাল মণ্ডল চৌধুরী তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এদিকে দয়া বাহাদুরও এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বীয় সৈন্যদল সহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিরোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি সমস্ত প্রসিদ্ধ পথ ঘাটে মোগল সৈন্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাও নন্দলাল ও অপর ঠাকুরগণের সহায়তায় মহারাষ্ট্র-বাহিনী নানা গুপ্ত পথে মালবে প্রবেশ-লাভ করিল। তাঁহাদিগের "হর হর মহাদেব" শব্দে দয়া বাহাদুর চমকিত হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহার পাঠান সৈন্যের সহিত

মহলার রাওয়ের মারাঠা সেনার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। দয়া বাহাদুর স্বয়ং হস্তি-পৃষ্ঠে সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সৈন্য-চালনা করিতেছিলেন। এক প্রহরকাল তুমুল যুদ্ধের পর তিনি তিন সহস্রাধিক সৈন্য সহ নিহত হইলেন। বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়েরা মালব হইতে মোগল আমলদারগণের নিরাকরণ ও আপনাদিগের একাধিপত্য-স্থাপন-পূর্ব্বক সুশাসনে মালব-বাসী প্রজাপুঞ্জকে ও স্থানীয় ঠাকুরদিগকে সুখী করিলেন। এই ঘটনা ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

শাসনাধিকার-লাভ।

এইরূপে মালব প্রদেশ হস্তচ্যুত হওয়ায় দিল্লীশ্বর মহম্মদ খান বঙ্গষের প্রতি উহার উদ্ধারের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু বঙ্গষ বহু চেষ্টাতেও সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারায় মহারাজ সওয়াই জয়সিংহের প্রতি মালবে মোগল-শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভার অর্পিত হয়। বলা বাহুল্য, দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বালাজী বিশ্বনাথ যখন জয়পুরপতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, তখনই বাজী রাও ও জয় সিংহের মধ্যে বিশেষ সখ্য ঘটিয়াছিল। তদ্ভিন্ন মহাষ্ট্রীয়দিগের মালব-বিজয়-ব্যাপারের মূলেও তিনি ছিলেন। এই দুই কারণে তিনি বাদশাহকে বাজী রাওয়ের সহিত বিরোধের সংকল্প পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দান করিলেন। দুর্ব্বল বাদশাহকে অগত্যা তাহাই স্বীকার করিতে হইল। মহারাজ জয়সিংহের চেষ্টায় বাজী

রাও মৌখিকভাবে মালবের অস্থায়ী শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। জয়সিংহ নামে-মাত্র মালবের সুভেদার রহিলেন।

গুজরাথে বিপ্লব।

কিন্তু বাজী রাও মৌখিক অধিকার-লাভে সন্তুষ্ট হইবার লোক ছিলেন না। তিনি বাহুবলে যাহা লাভ করিয়াছিলেন, বাদশাহী সনন্দের বলে তাহা সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিল্লীর দরবার কিছুতেই তাঁহাকে লিখিত সনন্দ দান করিতে সম্মত হইলেন না। গুজরাথে মহারাষ্ট্রীয়েরা সরবুলন্দ খানের সহিত সন্ধি করিয়া যে চৌথ ও সরদেশমুখীর স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন, বাদশাহ তাহাও ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, সরবুলন্দ খান বাজী রাওকে ঐ স্বত্ব প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া দিল্লীর দরবার হইতে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া যোধ-পুরের রাজা অভয় সিংহকে গুজরাথের সুভেদাররূপে প্রেরণ করা হয়। অভয় সিংহ অতীব ক্রূরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতাকে হত্যা করিয়া যোধপুরের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন! তাঁহার সহিত যুদ্ধে পিলাজী গায়কোয়াড়ের পরাজয় ঘটে। অতঃপর অভয় সিংহ গুপ্ত-ঘাতকের সাহায্যে তাঁহার বধসাধন করেন! এই ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয়েরা ভীত না হইয়া বরং অধিকতর উত্তেজিত হন। তাঁহাদিগের উগ্র মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলে অভয় সিংহ ভয় পাইয়া স্বদেশে পলায়ন

করেন। গুজরাথ পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইল। কিন্তু বাজী রাও বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করিয়াও গুজরাথ ও মালবের সম্বন্ধে লিখিত সনন্দ পাইলেন না। এই সকল কারণে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন সিদ্দিদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন তাঁহার সর্দ্দার শিন্দে ও হোলকরকে দিল্লী-আগ্রা পর্য্যন্ত মোগল প্রদেশ আক্রমণ করিবার আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন দিল্লী আক্রমণের আর একটী কারণ হইয়াছিল। বাজী রাওয়ের সামরিক ব্যয় অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার অনেক ঋণ হইয়াছিল।

স্বামীজীর উপদেশ।

সৈনিকগণ সময়ে বেতন না পাওয়ায় অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল, বাজী রাও বড় বিপন্ন হইলেন। মহাত্মা রামদাস স্বামী যেমন রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ে ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর গুরু ছিলেন, সেইরূপ শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী বাজী রাওয়ের দীক্ষাগুরু ও রাজনীতিক পরামর্শদাতা ছিলেন। বাজী রাও নিতান্ত বিপন্ন হইয়া এই সময়ে তাঁহাকে পত্র লিখেন। উত্তরে স্বামীজী তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে,—"বিপদের সময় ধৈর্য্য-চ্যুত হওয়া তোমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে অনুচিত। তুমি মালব দেশ সম্পূর্ণ অধিকার-পূর্ব্বক দিল্লী আক্রমণের চেষ্টাকর। তাহা হইলেই তোমার অর্থকষ্ট-নিবারণ, ম্লেচ্ছ-দমন ও হিন্দু সাম্রাজ্যের বিস্তার—এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।" এইরূপ

উপদেশ-সম্বলিত পত্র পাঠ করিয়া বাজী রাও ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইবার সংকল্প করিলেন।

সন্ধি-কামনা।

বাজী রাওয়ের আদেশে মহারাষ্ট্রীয় সেনা মালব হইতে চাম্বেল (চর্ম্মণ্বতী) নদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। মহ্লার রাও হোলকরের অধীনতায় এক দল সৈন্য আগ্রাও অতিক্রম করিল। তাহাদিগের তাণ্ডব-দর্শনে বাদশাহ শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী খান্-দৌরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বাদশাহের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি বাজী রাওকে মালবের চৌথ ও সরদেশমুখী এবং গুজরাথের সরদেশমুখী স্বত্বের সনন্দ দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বাদশাহের অধীন তুরাণী সর্দ্দারগণের প্রতিবন্ধকতায় সে প্রস্তাব রহিত হইল। তখন খান-দৌরা বাজী রাওকে জানাইলেন যে, বাদশাহ তাঁহার সহিত সন্ধির বিনিময়ে চাম্বেল নদীর দক্ষিণাঞ্চলস্থিত মোগল শাসিত প্রদেশ হইতে বার্ষিক ১৩ লক্ষ টাকা এবং পশ্চিমে বুন্দী ও কোটা হইতে পূর্ব্বদিকে বুধাবর পর্য্যন্ত সমস্ত রাজপুত-শাসিত প্রদেশ হইতে বার্ষিক ১০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা করাদায়ের অধিকার মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দান করিতে প্রস্তুত আছেন। বাজী রাওকে শেষোক্ত অধিকার-প্রদানে তুরাণীদিগের একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তুরাণী রাজপুরুষেরা মনে করিয়াছিলেন, রাজপুতনার

করাদান উপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুতদিগের মধ্যে বিগ্রহ উপস্থিত হইবে, উভয়েই গৃহ বিবাদে জর্জ্জরিত হইবেন, এবং সেই সুযোগে মোসলমানগণ আপনাদিগের প্রণষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার-সাধনের অবকাশ পাইবেন।

পেশওয়ের প্রস্তাব।

বাজী রাও দিল্লীর দরবার-স্থিত মহারাষ্ট্র-দূতের মুখে এই সংবাদ অবগত হইলেন। মোগল দরবারের কপটতা ও গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি ঐ সকল প্রস্তাবে অসম্মতি-প্রকাশ করত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন।

১। সমস্ত মালব প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে জায়গীর-স্বরূপ প্রদত্ত হউক।

২। ঐ প্রদেশের যে সকল অংশ রোহিলাদিগের শাসনাধীন রহিয়াছে, তাঁহা অধিকার করিবার অনুমতি প্রদান করা হউক।

৩। মাণ্ডু, ধার ও রাশীন—এই তিনটি দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে দেওয়া যাউক।

৪। চামেলী (চাম্বেল) নদীর দক্ষিণস্থিত সমস্ত প্রদেশ জায়গীর-স্বরূপ এবং তথায় ফৌজদারী শাসনের অধিকার মারাঠাদিগকে দান করা হউক।

৫। বাদশাহী ধনাগার হইতে নগদ ৫০ লক্ষ টাকা

অথবা তৎপরিবর্ত্তে বঙ্গদেশের কিয়দংশ মহারাষ্ট্র-পতির হস্তে অর্পিত হউক।

৬। বারাণসী, প্রয়াগ, গয়া ও মথুরা এই চারিটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের সম্পূর্ণ শাসনাধিকার বিধর্ম্মীদিগের হস্ত হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া হিন্দু-পতি মহারাজ শাহুকে প্রদান করা হউক।

৭। দক্ষিণ ভারতের "সর-দেশপাণ্ডে" পদের স্বত্ব মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সমর্পিত হউক।

বাজী রাওয়ের এই সকল প্রার্থনার মধ্যে একটীর অধিক পূর্ণ হইল না। খান দৌরা বাজী রাওয়ের নিকট হইতে ৬ লক্ষ টাকা উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সমগ্র দক্ষিণা-পথের "সরদেশপাণ্ডে" নামক পদের স্বত্ব দান করিলেন।

সরদেশপাণ্ডে।

এই স্বত্বানুসারে বাজী রাও নিজাম শাসিত প্রদেশের সমস্ত আয়ের উপর শতকরা ৫৲ টাকা বা মোট বার্ষিক নব্বই লক্ষ টাকা আদায় করিবার অধিকার পাইলেন। নিজামের সহিত খান দৌরার মনো-মালিন্য ছিল। বলা বাহুল্য, তিনি নিজামকে অবজ্ঞাত করিবার উদ্দেশেই বাজী রাওকে এই স্বত্ব দান করিয়া-ছিলেন। নিজামের উপর প্রভুত্ব-বিস্তারের সুযোগ ত্যাগ করা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় বাজী রাও ছয় লক্ষ

টাকা দিয়া এই স্বত্ব বাদশাহের নিকট ক্রয় করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা-বোধ করিলেন না। সুতরাং বাজী রাওয়ের প্রতি নিজামের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইল।

বাদশাহ ও নিজাম।

এ দিকে বাজী রাওয়ের সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি বাহু-বলে অভীষ্ট-লাভ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া বাদশাহকেও আত্মরক্ষার উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। তিনি নিজাম-উল্-মুল্ককে বন্ধুভাবে পত্র লিখিয়া তাঁহার পূর্ব্বকৃত বিদ্রোহাপরাধ মার্জ্জনা ও তাঁহার নিকট মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভিযান-নিবারণের জন্য সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বলা বাহুল্য, তাহাতে নিজামের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া স্বীয় সৈন্যদল সহ বাদশাহের সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

প্রথম সংঘর্ষ।

এই সংবাদ অবগত হইয়া বাজী রাও সসৈন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি গুরুভার যুদ্ধোপকরণসমূহ বুন্দেলখণ্ডের রাজা জগৎ রায়ের নিকট রাখিয়া একদল ক্ষিপ্রগামী সৈন্য সহ মোগল রাজধানী আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলেন। খান্ দৌরার অধীনতায় বাদশাহী ফৌজ তাঁহার গতিরোধের জন্য আগ্রা যাত্রা করিল। অযোধ্যার সুভেদার সাদত খান

সহসা এক দল সৈন্যের সহিত আগ্রার সন্নিকটে মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহাতে কতিপয় মহারাষ্ট্রীয়-সৈন্য নিহত হওয়ায় হোলকর পশ্চাৎপদ হইয়া যমুনার অপর পারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই জয়লাভে অতীব উৎফুল্ল হইয়া সাদত খান বাদশাহকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"আমরা দুই সহস্র মহারাষ্ট্র-সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করিয়াছি। মহ্লার রাও হোলকর সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন। এক জন মারাঠা সেনানী আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাণভয়ে চাম্বেল নদী উত্তীর্ণ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। পলায়ন-কালে যমুনা পার হইতে গিয়া দুই সহস্র মারাঠা সৈন্য জলমগ্ন হইয়াছে!" বলা বাহুল্য, এই পত্রের বিবরণ সম্পূর্ণ অলীক ছিল। কিন্তু ইহাতে দিল্লীর দরবারে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। বাজী রাওয়ের দর্প চূর্ণ হইয়াছে বলিয়া দিল্লীর উমরাহেরা উৎসব করিতে লাগিলেন এবং আগ্রাস্থিত মহারাষ্ট্রীয় দূতকে অবজ্ঞাত করিয়া বিতাড়িত করিয়া দিলেন (১৭৩৪ খৃঃ)।

সন্ধির প্রস্তাব।

বাজী রাও তখন রাজপুতনায় ছিলেন। তিনি বুধাবরের রাজপুত রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার নিকট কর-গ্রহণ ও তথায় স্বীয় আধিপত্য-স্থাপন-পুরঃসর মহ্লার রাওয়ের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। এমন সময়ে

হোলকরের পরাজয়বার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি প্রত্যহ বিংশতি-ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক বিদ্যুদ্বেগে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং মহারাষ্ট্র-দূতের অবমাননার প্রতিকারস্বরূপ দিল্লী নগরীকে অগ্নি-সংযোগে ভস্মসাৎ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সংবাদে দিল্লীবাসীরা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বাজী রাও অকারণ নিষ্ঠুরতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার নিকটে বাদশাহের মর্য্যাদা-রক্ষাও নীতিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল। এই কারণে তিনি দিল্লীর লুণ্ঠন বা দাহ না করিয়া বাদশাহের নিকটে সন্ধি-প্রার্থনা-পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিলেন।

মোগল-বিজয়।

১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মে বাদশাহ মহারাষ্ট্র-দূতকে পুনর্ব্বার দিল্লীতে প্রেরণের জন্য বাজী রাওকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দিল্লীর অবস্থা সে সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে বাজী রাও মহারাষ্ট্র-তথায় প্রেরণ নিরাপদ বলিয়া মনে করিলেন না। ধ্যে সাদত খান সমর-লিপ্সু হইয়া সসৈন্যে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। বাজী রাও জানিতেন যে, বাদশাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি-প্রার্থী হইলেও তাঁহার সর্দ্দার ও উমরাহেরা সে প্রস্তাবে প্রতিকূলতা করিতেছিলেন। এই কারণে বিনা যুদ্ধে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। তিনি যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুদ্ধের

পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল না। সুতরাং বাজী রাও দিল্লীর ঈশানকোণস্থিত একটী বিশাল প্রান্তরের দিকে সরিয়া গিয়া শিবির সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সন্ধি-সূচক পত্র-প্রেরণ ও পূর্ব্ব-স্থান পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া দিল্লীর উমরাহগণ বিপরীত বুঝিলেন। তাঁহারা বাজী রাওকে ভীত মনে করিয়া সহসা অষ্ট সহস্র সৈন্যসহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল এবং তাহাতে ৬ শত মোগল-সেনা নিহত হইল! তদ্ভিন্ন মোগল-পক্ষীয় একজন সর্দ্দার আহত ও একজন সেনানী নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে মোগলদিগের একটী হস্তী ও দুই সহস্র অশ্ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়। অতি অল্প-সংখ্য মারাঠা সৈন্য এই সংঘর্ষে বিনষ্ট হইয়াছিল।

সন্ধি।

এই যুদ্ধে জয়লাভের পর বাজী রাও সসৈন্যে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে না করিতে মীর কমর উদ্দীন খান নামক এক জন মোগল সর্দ্দার একদল সৈন্যসহ সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছিলেন। সুতরাং স্বল্প ক্ষণ যুদ্ধের পর নিশার সমাগম হওয়ায় উভয় পক্ষই অস্ত্র-সংবরণ করিলেন। বাজী রাও রাত্রিমধ্যে কমর উদ্দীনকে বেষ্টন-পূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিবিরের সন্নিকটে একটী ১৬ ক্রোশ ব্যাপী ঝিল থাকায়

তাঁহার সে সুবিধা ঘটিল না। ইতোমধ্যে খান দৌরা ও সাদত খান মীর কমর উদ্দীনের সহায়তার জন্য আগমন করিলেন। কাজেই বাজী রাওকে তথা হইতে স্বীয় শিবির অধিকতর নিরাপদ স্থানে অপসারিত করিতে হইল। কিন্তু এই সমবেত মোগল সর্দ্দারেরা আর বাজী রাওয়ের সহিত সংঘর্ষ বৃদ্ধি করা সঙ্গত মনে করিলেন না। প্রথম যুদ্ধেই বাজীরাও ও তাঁহার মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের বিক্রম দেখিয়া দিল্লীর উমরাহগণের চৈতন্যোদয় হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারা বিরোধে নিবৃত্ত হইয়া বাদশাহের পক্ষ হইতে বাজী রাওয়ের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। সেই অবকাশে বাজী রাও গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদীতে (দোয়াবে) স্বীয় অধিকার স্থাপন করিবার চেষ্টায় ছিলেন। এমন সময়ে সহসা মহারাজ শাহু তাঁহাকে কোঙ্কণস্থিত ফিরীঙ্গীদিগের দমনের জন্য আহ্বান করিলেন। কাজেই বাজী রাওকে (১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে) বাদশাহের সহিত সন্ধি করিয়া যথাসম্ভব সত্বর সাতারায় প্রতিগমন করিতে হইল। এই সন্ধির ফলে বাজী রাও বাদশাহের নিকট হইতে মহারাজ শাহুর জন্য মালব প্রদেশের একচ্ছত্র অধিকার ও যুদ্ধের ব্যয়-স্বরূপ ত্রয়োদশ লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়।

ভূপালের যুদ্ধে নিজামের দর্পনাশ—নাদির শাহের অভিযান।

নিজামের রণযাত্রা।

ইতঃপূর্ব্বে মারাঠাগণের বিরুদ্ধে বাদসাহকে সাহায্য করিবার জন্য নিজাম-উল্‌-মুল্ক্‌ সসৈন্যে দিল্লীতে আহূত হইয়াছিলেন। নিজামকে এই কার্য্যে তৎপর করিবার জন্য বাদশাহ তাঁহার পুত্রকে মালব ও গুজরাথ প্রদেশের সুভেদারীর সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। দিল্লীতে বাজী রাওয়ের হস্তে বাদশাহী সৈন্যের পরাজয় ঘটিবার পর নিজাম-উল্‌-মুল্ক্‌ সসৈন্যে উত্তর-ভারতে উপস্থিত হন। তিনি যাহাতে নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতে, বাজী রাও স্বীয় ভ্রাতা চিমণাজীকে দিল্লী হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু পোর্ত্তুগীজদিগের উপদ্রবের জন্য চিমণাজী সে বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন নাই। কাজেই নিজাম নির্ব্বিঘ্নে নর্ম্মদা পার হইলেন, এবং দিল্লীতে গিয়া বাদসাহের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তখন বাদশাহ বাজী রাওয়ের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা

ভুলিয়া গিয়া নিজামকে মারাঠাগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি সামন্ত রাজপুত নরপতিদিগকেও নিজামের সহায়তা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। বুন্দীর রাজা ভিন্ন আর সকলেই এ সময়ে নিজামের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। মহারাজ সওয়াই জয়সিংহও এই অভিযানে স্বীয় পুত্রকে সসৈন্যে নিজামের সহকারিতার জন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। রোহিলারাও এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। এইরূপে দিল্লীশ্বরের সমস্ত সামন্ত নরপতিকে সঙ্গে লইয়া যখন নিজাম গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদী হইতে মালবের অন্তর্গত সিরোঞ্জে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার নিকট ৫০ সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন কোটার রাজা দুর্জ্জন সাল ও অযোধ্যার নবাব সাদত খানের ভ্রাতুষ্পুত্র বিংশতি সহস্র সৈন্যসহ নিজামের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। অওরঙ্গাবাদেও দশ বার হাজার মোগল সৈন্য বাজী রাওকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। অধিকন্তু নিজামের তোপখানাও অতি উৎকৃষ্ট ছিল। দিল্লী ত্যাগকালে নিজাম-উল্‌-মুল্ক বাদশাহের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি অতঃপর মারাঠাদিগকে মালবে পদার্পণ করিতে দিবেন না। (১)

---

(১) নিজামের এই সৈন্য-সংখ্যার বিবরণ চিমণাজী আপ্পা কর্তৃক ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ২২এ ডিসেম্বর (পৌষ শুক্লা প্রতিপৎ) তারিখে শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে লিখিত পত্র হইতে গৃহীত হইল।

এদিকে বাজী রাও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত প্রায় ৮০ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইলেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভূপাল (ভোপাল) নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাজী রাও নিজামকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল সত্বর গতিতে মালবে উপস্থিত হইতে বাধ্য হওয়ায় নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। এই কারণে তিনি একেবারে নিজামকে আক্রমণ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে নিজাম যদি বাজী রাওকে আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে সে যুদ্ধে জয় লাভ করা বাজী রাওয়ের পক্ষে অতীব কষ্টসাধ্য হইত। কিন্তু তিনি তাহা করিতে সাহসী না হইয়া ভূপাল নামক দুর্গের নিকট শিবির-সংস্থাপন-পূর্ব্বক বাজী রাওয়ের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানের একদিকে একটী নদী ও অপর দিকে একটী বিস্তীর্ণ জলাশয় ছিল। নিজামের বিবেচনা মতে তিনি অতি সুদৃঢ় স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পেশওয়ের রণসজ্জা।

কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিদোষে উহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। প্রথম দিনের যুদ্ধেই নিজামের পক্ষীয় পঞ্চ শত রাজপুত নিহত এবং সপ্ত শত অশ্ব মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তগত হয়। মহারাষ্ট্র-পক্ষে এক শত সৈনিক নিহত ও তিন শত জন আহত হইয়াছিল।

সংঘর্ষ।

আর একদিনের যুদ্ধে মোসলমানগণের পনর শত সৈনিক গতাসু হয়। নিজাম দুর্গের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হইলে, সহজেই তাঁহার পরাজয়-সাধন করিতে পারা যাইবে, ভাবিয়া বাজী রাও প্রথমে একটু দূরে সরিয়া গেলেন। কিন্তু নিজাম দুর্গের আশ্রয় ত্যাগ করিলেন না। তখন বাজী রাও নিজামকে চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া অবরুদ্ধ করিলেন। নিজাম পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া বাদশাহের নিকট সহায়তা চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রধান মন্ত্রী খান দৌরার ও বাদশাহের আন্তরিক বিরাগ থাকায় দিল্লী হইতে সাহায্য আসিল না। কাজেই নিজামের সহকারী রাজপুতেরা বাজী রাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু নিজামকে শিক্ষা দিবার জন্য বাজী রাও প্রথমে সে দিকে কর্ণপাত করিলেন না।

নিজামের পরাভব।

এদিকে খাদ্যসামগ্রীর অভাবে নিজাম বিশেষ ক্লিশ হইতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র নাসির জঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া পিতার সহায়তার জন্য সৈন্য সহ ভূপাল অভিমুখে আসিতেছিলেন। কিন্তু বাজী রাওয়ের নির্দেশ-ক্রমে তাঁহার ভ্রাতা চিমণাজী আপ্পা স্বীয় সৈন্যবল সহ নাসিরের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। পুত্রের বিলম্ব দেখিয়া নিজাম একবার সাহস-পূর্ব্বক বাজী রাওয়ের ব্যূহ-ভেদ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু

তাঁহার সঙ্গে গুরুভার যুদ্ধোপকরণাদি থাকায় সে চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হইল না। পরন্তু বাজী রাও সসৈন্যে তাঁহার উপর আপতিত হওয়ায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভূপাল দুর্গে প্রবেশ করিলেন। বাজী রাওয়ের নিকট দুর্গ প্রাচীর-ভেদকরণোপ-যোগী আগ্নেয় অস্ত্রাদি না থাকিলেও তাঁহার সৈনিকগণের বাণ ও গুলির বর্ষণে জর্জ্জরিত হইয়া নিজামকে দুর্গের আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইল। সেই সময়ে বাজী রাও তাঁহার তোপখানা অধিকার করিবার চেষ্টা করায় বহু সংখ্যক মহারাষ্ট্রীয় নিজামের তোপের মুখে উড়িয়া গেল! তথাপি বাজী রাওয়ের অদম্য সেনাদল তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত হইল না। নিজাম কিছুতেই মারাঠা সৈন্যের অবরোধ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। চতুর্ব্বিংশতি দিবস এইরূপ কষ্টে যাপন করিয়া নিরুপায় নিজাম বাজী রাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন।

নিজামের দুর্দ্দশা।

নাসির জঙ্গের গতিরোধ করিবার জন্য বাজী রাও চিমণাজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন,—"নবাব (নিজাম-উল্-মুল্ক) বয়োজ্যেষ্ঠ, যুদ্ধ-ব্যাপারে বহুদর্শী ও বিচক্ষণ হইয়াও কিরূপে এত সহজে জালবদ্ধ হইলেন, তাহা ভাবিয়াই আমার পুনঃ পুনঃ বিস্ময়ের উদ্রেক হইতেছে। দিল্লী অঞ্চলে গুজব উঠিয়াছে, এইবার নিজাম-উল্-মুল্কের

সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটিবে। এখন বঙ্গষের ন্যায় নবাবের দুর্গতি ঘটিতেছে। চারি দিনের অবরোধেই তাঁহার শিবিরে আটার দর টাকায় চারি সের হইয়াছিল। হস্ত্যশ্বাদি অনাহারে বিষম কষ্ট পাইতেছিল। গত পরশ্ব ২৫শে রমজান (৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৩৮ খৃঃ) মোগল পাঠানেরা ভাড়ার গাড়ীর গরু খাইয়াছে। রাজপুতেরা উপবাস করিতেছে! আয়ামল্ল প্রভৃতি জাঠ সর্দ্দারেরা নবাবের সহিত সন্ধি করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন।" এই পত্রের অপর স্থানে লিখিত আছে, "এ সময়ে তুমি যত পার, সৈন্যসংগ্রহ-পূর্ব্বক দাভাড়ে, ভোঁস্‌লে, যাদব, গায়কোয়াড় ও সরলস্কর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য সর্দ্দারগণকে সঙ্গে লইয়া আইস। যদি এই সময়ে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার একমত ও সমবেত হইয়া অধ্যবসায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সমগ্র দক্ষিণ ভারত মোসলমানের শাসনপাশ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইবে।" কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মহারাজ শাহুর আদেশ-সত্ত্বেও বাজী রাওয়ের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ অনেক সর্দ্দারই এই সময়ে তাঁহার সহায়তায় ক্ষিপ্রতা-প্রকাশ করিলেন না।

সন্ধির সর্ত্ত।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া নিজাম বাজী রাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন; সন্ধির কথাবার্ত্তা স্থির হইল। সমস্ত মালবদেশ এবং নর্ম্মদা ও চাম্বেলের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে মহারাষ্ট্রীয়গণের

হস্তগত হয়, তিনি বাদশাহকে বলিয়া তাহাই করিয়া দিবেন এবং যুদ্ধব্যয়স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড প্রদান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া নিজাম বাজী রাওয়ের কবল হইতে সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন (১৭৩৮ খৃঃ ৭ই জানুয়ারি)। এই সময় হইতে মালবে মহারাষ্ট্রীয় অধিকার নিষ্কণ্টক হইল। এই যুদ্ধজয়ের সংবাদ স্বীয় কনিষ্ঠকে জ্ঞাপন করিবার সময় বাজী রাও (১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ ৮ই জানুয়ারি) লিখিয়াছিলেন, "যে নবাব চৌথ ও সরদেশমুখী স্বত্বের নাম মুখে আনিতেন না, তিনি এখন সমগ্র মালব পরিত্যাগের সনন্দ স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন! সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর-কালে তাঁহার মুখ হইতে পশ্চাল্লিখিত কথাগুলি বাহির হইল;—"আজ পর্য্যন্ত যাহা কখনও হয় নাই, এ সময়ে আমাকে তাহাই করিতে হইল!" এইরূপে যে মালবের সুভেদারী পদে তাঁহার পুত্র অল্প দিনমাত্র পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই মালবের সমস্ত অধিকার এক্ষণে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল, ইহা সামান্য ঘটনা নহে। মহারাজের তপোবলে ও পিতৃ-পুণ্য-ফলে এই দুষ্কর কার্য্য সাধিত হইয়াছে। নতুবা নবাবের ন্যায় অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পরাভব-সাধন কত দূর সম্ভবপর ছিল, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ।" বীরজনোচিত শৌর্য্যসাহসের সহিত এইরূপ দর্পহীনতা বাজী রাওয়ের চরিত্রে বহুস্থলে দৃষ্ট হয়। সে যাহা

সৌজন্য।

হউক, কোটার রাজা দুর্জ্জনসাল এই যুদ্ধকালে নিজামের পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক বাজী রাওয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাজী রাও যুদ্ধে জয়ী হইলে তিনি আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও সখ্যস্থাপন করেন। দুর্জ্জনসালের শাসনাধীন "নহরগড়" দুর্গ মোসলমানেরা অধিকার করিয়া তথায় আপনাদিগের শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। বাজী রাও তাহার উদ্ধার-সাধন করিয়া উহা কোটাপতির হস্তে সমর্পণ করেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে এই ঘটনা ঘটে।

দিল্লীর বিপ্লব।

পরবর্ত্তী অব্দের প্রারম্ভে দিল্লী অঞ্চলে যে রাজনীতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল, সে জন্য বাজী রাওকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। কোঙ্কণ প্রদেশ হইতে দুর্ব্বৃত্ত পোর্ত্তুগীজদিগের আংশিক দমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হইতে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, ইরাণের অধিপতি নাদিরশাহ দিল্লী আক্রমণ-পূর্ব্বক মোগলদিগের পরাভব ও ময়ূর-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিজাম পরাজিত, সাদত খান বন্দীভূত ও খান দৌরা নিহত হইয়াছেন! কেবল তাহাই নহে, তিনি একলক্ষ সৈন্যসহ দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করিবারও উদ্যোগ করিতেছেন। এই সংবাদে বাঁজী রাও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত নাদিরশাহের গতিরোধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নাসিরজঙ্গকে

পত্র লিখিলেন যে, "নাদিরশাহ হিন্দু ও মোসলমান উভয়েরই শত্রু; অতএব এ সময়ে আমাদিগের গৃহ-বিবাদ ভুলিয়া তাঁহার গতিরোধ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।" তিনি চিমণাজী আপ্পাকেও কোঙ্কণে পর্ত্তুগীজদিগের দমন-কার্য্য স্থগিত রাখিয়া সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ-পূর্ব্বক ২৩শে মার্চ্চ (১৭৩৯ খৃঃ) শুক্রবার এক পত্র লিখিলেন। সেই পত্রের কিয়দংশ এস্থলে অনুদিত হইল। বাজী রাও লিখিতেছেন,—

বাজী রাওয়ের পত্র।

"শ্রীয়া সহ চিরঞ্জীব রাজশ্রী আপ্পা সমীপেষু, বাদশাহ ও তাঁহার আমীরেরা কাপুরুষতার জন্য ক্ষণে ক্ষণে অপদস্থ হইতেছেন। নবাব নিজাম-উল্-মুল্কের অবস্থাও অতীব হীন হইয়াছে। অতঃপর দক্ষিণ-ভারতে "ম্লেচ্ছ"-শক্তির নাম-গন্ধও রাখিব না। সমস্ত গড় কোট কেল্লা হস্তগত করিতে হইবে। তুমি বসইর (Bassein) যুদ্ধ-ব্যাপার শেষ করিয়া সসৈন্য অওরঙ্গাবাদে উপস্থিত হইলে সমস্ত মোগল-প্রদেশ শাসন করিবার ব্যবস্থা করা যাইবে। আমি খানদেশের বন্দোবস্ত করিতেছি। সংপ্রতি তোহমস্ত কুলি (নাদির শাহ) বাজী জিতিয়াছে। কিন্তু সমগ্র হিন্দু জাতি সমবেত হইয়া এ সময়ে সাহস প্রকাশ করিলে এবং আমরা সমস্ত দাক্ষিণাত্য সৈন্যসহ অভিযান করিতে পারিলে, সর্ব্বত্র হিন্দুদিগেরই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, এরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।"

স্বামীজীকে লিখিত পত্র

ইহার দুই দিন পূর্ব্বে তিনি স্বীয় দীক্ষা-গুরু পরমহংস শ্রীমদ্ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একাংশ এইরূপ—

"তোহমস্ত কুলি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। চাকতাই-দিগের (মোগলদিগের) সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইল, সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুদিগের পক্ষেও ঘোর বিপৎকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। আমার বিপত্তির সীমা নাই। আমি সৈন্য-পোষণের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতে করিতে ঋণসাগরে মগ্ন হইয়াছি। তবে স্বামীজীর আশীর্ব্বাদ যতক্ষণ আমার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে, ততক্ষণ আমি কোনও বিষয়ে চিন্তা করি না। কেবল আপনার অবগতির জন্য প্রকৃত অবস্থা বিবৃত করিলাম। ভবিষ্য-কর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনীয়।"

পরে ২৪শে মার্চ্চের পত্রে তিনি লিখিতেছেন,—

"স্বামীজীর আশীর্ব্বাদ-পত্র পাইয়া পরম আনন্দ-লাভ করিলাম। তোহমস্ত কুলি খান দিল্লী অধিকার করিয়াছেন। (আমরা ভিন্ন) আর কেহ তাঁহার শত্রু নাই। এখন তিনি আমাদিগের ও আমরা তাঁহার শত্রু। অতএব দিল্লী হইতে তাঁহার দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যাহাতে সমস্ত মারাঠা সৈন্য চামেলী (চাম্বেল) নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে, এবং যাহাতে তিনি এদিকে অগ্রসর হইতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। এসময়ে বড় গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি অবশ্যই এবিষয়ে নিশ্চিন্ত নহেন। আপনার আশী-র্ব্বাদে আমাদিগের মঙ্গলই ঘটিবে।"

এই রূপে বাজী রাও মহারাষ্ট্র সেনা একত্র করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি নাসিরজঙ্গের ন্যায় সমস্ত রাজপুত রাজাদিগকেও গোপনে পত্র লিখিয়া নাদিরের গতিরোধে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ নাদির শাহ যাহাতে চাম্বেল নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, বাজী

রাও তাহার জন্য আবশ্যক উপায় অবলম্বনে কোনও প্রকার ত্রুটী-প্রকাশ করেন নাই।

নাদির শাহ।

নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণের কারণাবলী ও তৎকৃত অত্যাচার ও উৎপীড়নের আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তথাপি এ সম্বন্ধে একটী কথা বলা আবশ্যক। নাদির শাহ ভারত-আক্রমণের যে সকল আয়োজন করিতেছিলেন, তাহা দিল্লীর দরবার বহুদিন জানিতে পারেন নাই। এমন কি, তিনি সিন্ধুনদের উপর সেতু নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক পঞ্জাবে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনও সংবাদ রাখিবার অবসর পান নাই। বলা বাহুল্য, বাজী রাওয়ের ভীতিই ইহার একমাত্র কারণ। বাজী রাওয়ের দমনের আবশ্যকতা দিল্লীর দরবারে বিশেষরূপে অনুভূত হওয়ায় সকলের দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই সুযোগে নাদির শাহ বিনা বাধায় দিল্লীর সমীপবর্ত্তী হইতে পারিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন-পূর্ব্বক প্রায় ৩৭ কোটী টাকার ধন-রত্নাদি সংগ্রহ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। সুতরাং বাজী রাওয়ের আর যুদ্ধাভিযানের প্রয়োজন হইল না।

দশম অধ্যায়।

পোর্ত্তুগীজদিগের দমন—ইংরাজের সহিত সন্ধি—প্রতিষ্ঠানের সন্ধি—বাজী রাওয়ের দেহ-ত্যাগ—চরিত্র-সমালোচন।

বাজী রাওয়ের পেশওয়ে পদ-লাভ-কালে এদেশে পোর্ত্তুগীজেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের বলিষ্ঠ শত্রুর শ্রেণীতে পরিগণিত হইবার যোগ্যতালাভ করিয়াছিলেন, একথা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ফিরিঙ্গীর অত্যাচার।

পোর্ত্তুগীজদিগকে মহারাষ্ট্রীয়গণ ফিরিঙ্গী বলিতেন। গোয়া, দাভোল, দমণ, দীও, সাষ্টী, বসই প্রভৃতি স্থানে ফিরিঙ্গীদিগের অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারা এই সকল প্রদেশে যে কেবল দুর্গাদি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক আপনাদিগের অধিকার দৃঢ় করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। এদেশবাসীর প্রতি ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহারা যৎপরোনাস্তি অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেন। তাঁহারা রোমান ক্যাথলিক পন্থাবলম্বী

ছিলেন বলিয়া বলপূর্ব্বক অপরকে খৃষ্টান করা তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বিধর্ম্মীদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য, তাঁহারা স্বদেশে একটী সভা-স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতেও তাহার শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। বিধর্ম্মীকে খৃষ্ট-ধর্ম্মে বিশ্বাস করাইবার জন্য এই সভার সদস্যেরা যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেন, তন্মধ্যে কারাগারে নিক্ষেপ, উপ-বাসাদির ক্লেশদান, বেত্রাঘাত, উত্তপ্ত ভাণ্ডোপরি স্থাপন, অঙ্গে জলন্ত-বর্ত্তিকা বন্ধন ও প্রাণ-নাশ প্রভৃতিই প্রধান ছিল! ফলতঃ খৃষ্টানেরা এই সময়ে এদেশে আসিয়া যেরূপ পশু-বৎ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, জগতে বোধ হয় আর কোনও ধর্ম্মাবলম্বীরা সেরূপ করেন নাই। তাঁহারা মোসলমানদিগেরও প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিতেন।

পোর্ত্তুগীজ-শাসিত প্রদেশের সমস্ত হিন্দু অধিবাসী নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মাব-লম্বনে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফিরিঙ্গিদিগের হস্তে ঐ অঞ্চলের যাবতীয় দেব মন্দিরাদি বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কোন স্থানে হিন্দুদিগকে ব্রত-নিয়ম বা যাগ-যজ্ঞাদি করিতে দেখিলে তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রতাচারী ও যজ্ঞকারী-দিগকে বন্দী-পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-ত্যাগে বাধ্য করিতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা গ্রামের প্রাচীন জমীদারদিগের স্বত্ব-হরণ করিয়া

হিন্দুর কষ্ট।

তাঁহাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছিলেন। দরিদ্র শ্রমজীবী-দিগকে তাঁহারা বিনা বেতনে বেগার খাটাইয়া লইতেন। কেবল তাহাই নহে, যাহারা বিনা পারিশ্রমিক-লাভে সমস্ত দিন তাঁহাদিগের কার্য্য করিত, তাঁহারা তাহাদিগকে একমুষ্টি অন্ন পর্য্যন্ত দান করিতেন না। ফিরিঙ্গীদিগের এইরূপ বিবিধ দুর্ব্ব্যবহারে দেশ মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল।

আশ্রয় প্রার্থনা।

পোর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া অনেক হিন্দু স্ব স্ব জন্মভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহারাষ্ট্র-শাসিত দেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। অনেকে সমুদ্রের জলে ঝম্প দিয়া প্রাণ-ত্যাগ-পুরঃসর দুঃসহ অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বিদ্রোহী হইয়া ফিরিঙ্গীদিগের কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করায় সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। পরিশেষে হিন্দুগণ নিতান্ত উত্ত্যক্ত হইয়া মহারাষ্ট্রপতি শাহু ও পেশ-ওয়ে বাজী রাওয়ের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকট এই বলিয়া এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন যে, মহারাষ্ট্রপতি যখন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক, তখন বিধর্ম্মী পোর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচার হইতে হিন্দুদিগকে রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। এই আবেদনপত্র পাইয়া মহারাজ শাহু ফিরিঙ্গীদিগের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম্মীদিগের রক্ষার জন্য বাজী রাও ও চিমণাজী আপ্পাকে কোঙ্কণে প্রেরণ করিলেন। ফিরিঙ্গীদিগের

দমনের জন্য শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীও তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কুলাবা-বিজয়।

মহারাজ শাহুর পূর্ব্বেই এই অত্যাচার-কাহিনী বাজী রাওয়ের কর্ণগোচর হইয়াছিল এবং তিনি কোঙ্কণের অধিবাসীদিগকে অভয়-দান করিয়া পত্রও লিখিয়াছিলেন। এক্ষণে মহারাজ শাহুর অনুমতি পাইবা মাত্র তিনি স্বকীয় বিজয়ী সৈন্য-দল-সহ কোঙ্কণে উপস্থিত হইলেন। মহারাষ্ট্র নৌ-সেনানী আংগ্রে পোর্ত্তুগীজগণের দমনে অসমর্থ হইয়া মহারাজ শাহুর সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাজী রাও তাঁহার সাহায্যের জন্য গমন করিলে কুলাবার নিকট শত্রু পক্ষের সহিত যুদ্ধ ঘটে। বাজী রাওয়ের সমর-কৌশলে ফিরিঙ্গীদিগের সহিত যুদ্ধে মারাঠা সৈন্য বিজয়-লাভ করে (১৭৩৫)।

ঠানা অধিকার।

কুলাবায় পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া বাজী রাও (Salsette) ও বসই (Bassein) আক্রমণ করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রথমে বসইর নিকটবর্ত্তী ঘোড় বন্দর দুর্গ অধিকৃত হয়। তাহার পর ঠাণা (Tanna) নগর আক্রান্ত হইল। ঐ স্থানও বাজী রাও পোর্ত্তুগীজদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। ইহার পর তাঁহাদিগের 'বান্দরা' নামক সেনা-নিবাসের প্রতি বাজী রাওয়ের দৃষ্টি নিপতিত হয়। বাজী রাও বান্দরা আক্রমণ

করিলে ইংরাজেরা বোম্বাই আক্রান্ত হইবার ভয়ে গোপনে পোর্ত্তুগীজদিগকে যুদ্ধ-সামগ্রী-দানে সাহায্য করিতেছিলেন। পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের জন্য বাজী রাও সমর-দক্ষ আরবী, মাওলী ও হেটকরীদিগকে (১) স্বীয় সৈন্য-দলভুক্ত করেন। কিন্তু বান্দরা আক্রমণের পূর্ব্বেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিনাশের জন্য দিল্লীতে আবার নানা প্রকার চেষ্টা ও ষড়্যন্ত্র হইতেছে। কাজেই তাঁহাকে পোর্ত্তুগীজ-দমনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতভাবে উত্তর ভারতে গমন ও ভূপাল নামক স্থানে নিজামের পরাজয় সাধন করিতে হইল।

চিমণাজীর জয়লাভ।

বাজী রাও উত্তর ভারতে প্রস্থিত হইলে চিমণাজী আপ্পা পোর্ত্তুগীজদিগের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধনের জন্য পূর্ণ দুই বৎসরকাল যুদ্ধ করিয়া সাষ্টী, তারাপুর, মাহিম প্রভৃতি বহু প্রদেশ অধিকার করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যে প্রয়োজন হইলে সম্মুখ সমরে পশ্চাৎপদ হইতেন না, পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ইংরাজ ও হাব্সীগণ এই সকল যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিপক্ষে সহায়তা করিয়াও ফললাভ করিতে পারেন নাই।

---

(১) রত্নাগিরি অঞ্চলের বরকন্দাজদিগকে হেটকরী বলে। ইহারা লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। মাওলী সৈন্য মহাত্মা শিবাজীর সময় হইতে অসিযুদ্ধে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

মারাঠাগণের সহিত যুদ্ধে তাঁহাদিগের শতাধিক পোত-পূর্ণ যুদ্ধসামগ্রী নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল এবং কয়েকজন প্রসিদ্ধ সেনাপতিও নিহত হইয়াছিলেন। চিমণাজী আপ্পারও বহু সহস্র লোক স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির রক্ষার জন্য এই সকল যুদ্ধে অলৌকিক শৌর্য্য-প্রকাশ-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে।

বসইয় যুদ্ধ।

দুই বৎসর কাল নানা স্থানে খণ্ড-যুদ্ধের পর ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা বসই আক্রমণ করেন। কোঙ্কণের মধ্যে বসই দুর্গ পোর্ত্তুগীজদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান ছিল। ঐ স্থান অধিকার করিতে পারিলেই তাঁহাদিগের মূলোচ্ছেদ এবং হিন্দুদিগের প্রতি সকল অত্যাচারের অবসান হইবে, ইহা ভাবিয়া চিমণাজী ঐ স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিন মাস অবরোধের পরও ঐ দুর্গ তাঁহাদিগের হস্তগত হইল না। পোর্ত্তুগীজেরা ইউরোপ হইতে শিক্ষিত সৈন্য আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের তোপের সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা পুনঃ পুনঃ ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল। মারাঠারা সুড়ঙ্গ করিয়া বারুদের সাহায্যে দুর্গ-প্রাচীর উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গপ্রাচীরে একটা ছিদ্রও করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। তখন চিমণাজী আপ্পা দুর্গ অধিকারের প্রতিজ্ঞা করিয়া একদিন স্বীয় সর্দ্দারগণকে বলিলেন যে,—"তোমরা যদি দুর্গে প্রবেশ

করিতে না পার, তাহা হইলে আমাকে তোপের মুখে বাঁধিয়া গোলার সহিত দুর্গ-মধ্যে নিক্ষেপ কর!" তাঁহার এই কথায় উত্তেজিত হইয়া 'হর হর মহাদেব' শব্দে সকলে পুনর্ব্বার দুর্গ আক্রমণ করিলেন। তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিজয় হইল। মারাঠারা বসইর দুর্গস্থিত ক্রুশ-চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া তথায় আপনাদিগের জাতীয় গৈরিক পতাকা উড্ডীন করিলেন (১৫ই মে)। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা অসীম শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন (১)। শেষদিনের যুদ্ধে পোর্ত্তুগীজদিগের সাত শত সৈনিকের প্রাণাত্যয় ঘটে। সর্ব্বশুদ্ধ দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাদিগের সহিত সমরে চতুর্দ্দশ সহস্র মহারাষ্ট্র-সেনা হতাহত হইয়াছিল। কিন্তু এই আত্মত্যাগের ফলে গোয়া প্রদেশ ভিন্ন ফিরিঙ্গীদিগের অধিকৃত অধিকাংশ স্থান মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হওয়ায় হিন্দুগণের নির্য্যাতন-ভোগের অবসান হয়। বসই দুর্গ অধিকার-কালে দুর্গাধিপতির পরিবারস্থিতা একটী মহিলা মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকবৃন্দের হস্তগত হইয়াছিলেন। কিন্তু চিমণাজী আপ্পা তাঁহাকে সসম্মানে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট প্রেরণ

---

(১) এই যুদ্ধসম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব লিখিয়াছেন,—This remarkable siege, the most vigorous ever prosecuted by the Marathas. এণ্ডায়সন সাহেবের মতে The siege was carried on with such extraordinary vigour, skill and perseverance, as perhaps Marathas have in no other instance displayed.

করেন। বসইর খৃষ্টানদিগের মুখে এখনও এ সম্বন্ধে চিমণাজী আপ্পার প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। অবরুদ্ধ অন্যান্য ব্যক্তিদিগেরও প্রতি বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়েরা সদ্ব্যবহার করিতে বিরত হন নাই। পোর্ত্তুগীজদিগের পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক যে সকল বীর পুরুষ ও সৈনিক যুদ্ধ করিতেছিলেন, মারাঠারা তাঁহাদিগের প্রতি সামরিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে দুর্গ-ত্যাগ পুরঃসর অভীষ্ট দেশে গমন করিতে দিয়াছিলেন। সাধারণ নাগরিকদিগের মধ্যে যাহারা বসই ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, চিমণাজী তাহাদিগকে আট দিবসের মধ্যে স্ব স্ব ধন সম্পত্তি লইয়া নির্ব্বিঘ্নে নগর পরিত্যাগ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা স্থানত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে আপন আপন বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান-পূর্ব্বক সুখে কালযাপন করিবার সুবিধা দিয়াছিলেন।

বসই অধিকার-কালে মহারাষ্ট্রীয়েরা যেরূপ অসাধারণ শৌর্য্য ও সমর-কৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া ইংরাজদিগের হৃদয়ে বিষম ভীতির সঞ্চার হইল। তাঁহারা বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিলেন যে, তাঁহাদিগের নৌ-বল মহারাষ্ট্র-শক্তির আক্রমণ নিবারণের যোগ্য নহে। নগরের চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী প্রাচীরও যথোচিত দৃঢ় ও উচ্চ নহে। সুতরাং বোম্বাই রক্ষার জন্য আর কালবিলম্ব করা অনুচিত।

বিলাতে এই কথা জানাইয়াই বোম্বাইবাসী ইংরাজেরা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা নাগরিকদিগের নিকট হইতে প্রায় ত্রিশ সহস্র মুদ্রা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বোম্বাই সহরের পূর্ব্বাংশে একটি পরিখা খনন করাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং মহারাজ শাহুর সহিত সখ্য-স্থাপনে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা মহারাষ্ট্র-শক্তির অনুগ্রহ কামনা করিয়া বিবিধ উপঢৌকন সহ এক জন দূতকে মহারাজ শাহুর দরবারে প্রেরণ করিলেন। বিজয়ী চিমণাজী আপ্পার পরিতুষ্টির জন্যও উপঢৌকনাদি প্রেরিত হইল। কাপ্তেন গর্ডন দূতরূপে শাহুর দরবারে উপস্থিত হইলেন। কাপ্তেন ইঞ্চবার্ড চিমণাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ-প্রার্থী হইলেন। গর্ডন সাহেবের প্রতি বোম্বায়ের অধ্যক্ষ যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এই,—

"মহারাজ শাহুর সভায় বাজী রাওয়ের কোনও শত্রু আছে কি না, তাহার সন্ধান লইবে। কারণ পোর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত প্রদেশ জয় করিয়া তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে তাঁহার শক্তি খর্ব্ব করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে রাজসভার সদস্যদিগের মধ্যে কাহারও হৃদয়ে ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত করিবার সুযোগ পাইলে তাহা কখনও পরিত্যাগ করিবে না। কিন্তু এই কার্য্য বিশেষ সতর্কতার সহিত করিবে। কারণ, যদি এই

ব্যাপার উপলক্ষে বাজী রাও আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি ঘটিবে।"(১)

এই সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়া ১৭৩৯ সালের ১২ই মে কাপ্তেন গর্ডন বোম্বাই হইতে সাতারা অভিমুখে গমন করিলেন। ৩রা জুন তারিখে মহারাজ শাহুর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। নানা কথার পর মহারাজ ইংরাজ-দূতকে স্পষ্টাক্ষরেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাষ্ট্র শক্তির প্রবলতা দর্শনে ভীত হইয়াই কি ইংরাজেরা সন্ধি-কামনা করিতেছেন?" উত্তরে কাপ্তেন গর্ডন বলিলেন, "না, আমরা ভীত হই নাই; বিশুদ্ধ বন্ধুত্বের প্রয়াসী হইয়াই মহারাজের নিকট আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া মহারাজ মনে মনে হাস্য করিলেন। অতঃপর তিনি ইংরাজদিগকে অভয়দান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপঢৌকনাদির জন্য বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইংরাজ-দূতের ধারণা হইল যে, বাজী রাওকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের প্রকৃত ভয় দূর হইবে না। ইংরাজদিগের সৌভাগ্য-ক্রমে কাপ্তেন ইঞ্চবার্ডের বিশেষ চেষ্টা ও কৌশলে বাজী রাওয়ের সহিত ১৭৩৯ সালের ১২ই জুলাই তারিখে ইংরাজদিগের সন্ধি হইল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ইহাই ইংরাজের প্রথম সন্ধি। মহারাজ

(1) Vide Selections from the State Papers of Bombay Secretariat. By G. W. Forrest.

শাহুর আদেশে এই সন্ধি-সূত্রে ইংরাজেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিপৎকালে যুদ্ধোপকরণাদি-দানে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত ও মহারাষ্ট্র রাজ্যে স্বাধীন ব্যবসায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

বাদশাহের সম্মান।

এদিকে নাদির শাহের প্রস্থানের পর দিল্লীর অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইল যে, বাজী রাও চেষ্টা করিলে, অনায়াসে মোগলদিগের রাজধানীতে মহারাষ্ট্র-বিজয়-পতাকা রোপণ করিয়া মোগল-বাদশাহীর সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। দিল্লীশ্বরের প্রতি মহারাজ শাহুর শ্রদ্ধাই ইহার প্রধান কারণ। তদ্ভিন্ন অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে সাক্ষিগোপাল-স্বরূপ একজন বাদ-শাহকে প্রতিষ্ঠিত রাখাও তাঁহার নিকট রাজনীতিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই কারণে তিনি দিল্লীশ্বরের এই বিপন্ন দশাতেও এক শত একটী স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকনসহ তাঁহার নিকট এক বশ্যতা-স্বীকার-পত্র প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ ইতঃপূর্ব্বে নাদির শাহের হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য বাজী রাওয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাজী রাও সমরায়োজন-পূর্ব্বক অভিযান করিবার পূর্ব্বেই নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন-পুরঃসর প্রস্থান করেন। সেজন্যও বাজী রাওকে বাদশাহের এই বিপত্তিতে আন্তরিক সহানুভূতি-প্রকাশ ও স্বীয় বশ্যতা-জ্ঞাপন করিয়া পত্র প্রেরণ করিতে হয়। দিল্লীশ্বর

সেই পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার-পূর্ব্বক বাজী রাওকে গজ-বাজিসহ রত্নময় ভূষণ-পরিচ্ছদাদি-দানে প্রতিসম্মানিত করিলেন (১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে)। কিন্তু নিজাম-উল্-মুল্কের সহিত ভূপালে যে সন্ধি হয়, তাহার সর্ত্ত অনুসারে বাজী রাওকে মালব-প্রদেশের সুভেদারীর নূতন সনন্দ দিবার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা রক্ষিত হইল না। বাজী রাও-ও সেজন্য আর পীড়াপীড়ি করা আবশ্যক মনে করিলেন না। কারণ, বাদশাহ অতঃপর মালবে নূতন সুভেদার প্রেরণ করেন নাই।

নিজাম-রাজ্যআক্রমণ।

এই সময়েও শিন্দে-হোলকর প্রভৃতি বাজী রাওয়ের সর্দ্দারেরা কোঙ্কণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই। ইত্যবসরে বাজী রাও রাজপুত ও বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া নিজামের বিরুদ্ধে অভিনব অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভূপালের যুদ্ধের পর যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার সমস্ত সর্ত্ত যথারীতি পালনে নিজামের অমনোযোগিতা দেখিয়া বাজী রাও দক্ষিণাপথ হইতে তাঁহার অস্তিত্ব-বিলোপ করিতে দৃঢ়-সংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু রঘুজী ভোঁস্‌লে ও দামাজী গায়কোয়াড়ের সহিত সদ্ভাব না থাকায় বাজী রাওকে এই সময়ে একটু ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এই কারণে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই রঘুজীর সহিত সাক্ষাৎকার-পূর্ব্বক তাঁহাকে

নিজামের সম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায়-জ্ঞাপন ও তাঁহার সহিত মিত্রতাস্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহাকে দক্ষিণ দিক্ হইতে কর্ণাটকস্থিত মোগল প্রদেশ আক্রমণ করিতে উপদেশ দিয়া স্বয়ং উত্তর দিক্ হইতে নিজাম-উল্-মুল্কের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন।

প্রতিষ্ঠানের সন্ধি।

নিজাম-উল্-মুল্ক তখনও উত্তর ভারতে ছিলেন। দক্ষিণাপথে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে ভ্রাতৃ-বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল। নিজাম রাজ্যে অভিযান করিবার ইহাই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া বাজী রাও প্রথমে নাসির জঙ্গকে আক্রমণ-পূর্ব্বক দশসহস্র সৈন্য সহ তাঁহাকে অওরঙ্গাবাদে অবরুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই 'বেদর' হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য নাসিরের সহায়তার জন্য আগমন করিল। এই উভয় সৈন্যদল মিলিত হওয়ায় শত্রুপক্ষের সংখ্যা বিয়াল্লিশ হাজার হইল। তন্মধ্যে উনিশ হাজার অশ্বসাদী ও তেইশ হাজার বরকন্দাজ ছিল। তদ্ভিন্ন দেড়শত কামান ও তিন শত ধনুর্ব্বাণ-বাহক উষ্ট্রও তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। বাজী রাওয়ের সৈন্য-সংখ্যার অল্পতা-বশতঃ এই প্রচণ্ড সেনাদলের সহিত যুদ্ধে প্রথমে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু ইত্যবসরে চিমণাজী আপ্পা ও শিন্দে হোলকর আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করায় তিনি মোগলদিগের ছত্রভঙ্গ করিতে সমর্থ হন। এই যুদ্ধকালে

প্রায় দুই তিন মাস পর্য্যন্ত অন্ন-জলের কষ্ট সহ্য করিয়া মহারাষ্ট্র-সেনাকে বনে বনে মোগলদিগকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এই সমর-ব্যাপারের জন্য প্রজাকুলেরও বিশেষ কষ্ট হইতেছিল। এই কারণে, নাসির জঙ্গ যখন পরাস্ত হইয়া তাঁহার নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, তখন বাজী রাওকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিতে হইল। তদনুসারে প্রতিষ্ঠান নগরে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ্চ উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। এই সন্ধির বিনিময়ে খানদেশের অন্তর্গত খরগোণ ও হিণ্ডিয়া নামক দুইটি প্রদেশ মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দান করেন।

এই সন্ধি স্থাপিত হইবার পর মহারাজ শাহুর আদেশক্রমে চিমণাজী আপ্পা কোঙ্কণ ও বাজী রাও শিন্দে হোলকরের সহিত উত্তর ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে, দিল্লী অতিক্রম করিয়া আটক পর্য্যন্ত গমন করাই বাজী রাওয়ের এবারকার অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা সুসিদ্ধ হইল না। তিনি নর্ম্মদা তীরে উপস্থিত হইলে সহসা তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি নব জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। এই জ্বরের আক্রমণ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল (বৈশাখ শুক্লা ত্রয়োদশী) ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নর্ম্মদা তীরে তাঁহার জীবন-প্রদীপ

পরলোক-প্রাপ্তি।

নির্ব্বাপিত হইল (১)। মৃত্যু-কালে তিনি তাঁহার প্রিয় সর্দ্দার শিন্দে ও হোলকরকে মোসলমানদিগের শাসনপাশ হইতে ভারতবর্ষের উদ্ধার-সাধন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে সমগ্র মহারাষ্ট্রে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। মহারাজ শাহু শোকে অধীর হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণের শোকের বর্ণনাই বাহুল্য।

তাঁহার চরিত্র।

বাজী রাও বিংশতি বৎসর-কাল পেশওয়ে পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য-কালের অধিকাংশই যুদ্ধাভিযানে অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত

(১) নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী নেমাড় জিলার অন্তর্গত "রাওয়ের" নামক গ্রামে বাজী রাও দেহত্যাগ করেন। যে স্থানে এই মহাবীরের প্রাণোৎক্রমণ হয়, সেই স্থানে একটি বেদিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। বেদীর চতুষ্পার্শ্বে শ্রান্ত পথিক ও নর্ম্মদাপ্রদক্ষিণকারী সাধু সন্ন্যাসীদিগের আশ্রয়ের জন্য কতিপয় প্রকোষ্ঠ ও তোরণযুক্ত (খিলানওয়ালা) অলিন্দ আছে। নর্ম্মদা-গর্ভে যে স্থলে বাজী রাওয়ের দেহ ভস্মাবশেষ হইয়াছিল, সে স্থলে একটি প্রায় শতবর্গ ফুট পরিমিত চবুতরা বা সমচতুষ্কোণ বেদী রচিত হইয়াছে। বেদীর উপর একটি তুলসী মঞ্চ আছে। গ্রামবাসীর মুখে এই রূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাজী রাওকে গতাসু দেখিয়া তাঁহার একটি প্রিয় অশ্ব ও হস্তী তৎক্ষণাৎ শোকে প্রাণত্যাগ করে! বাজী রাওয়ের সমাধি বেদিকার অদূরে নর্ম্মদা পুলিনে যে দুইটি বেদী পরিদৃষ্ট হয়, গ্রামবাসীরা সেইগুলিকে পূর্ব্বোক্ত অশ্ব ও হস্তীর সমাধি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বাজী রাওয়ের প্রিয়সর্দ্দার হোলকরের প্রতিষ্ঠিত রাজ সরকারের ব্যয়ে এই গ্রামের এক জন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ এই মহাবীরের সমাধিবেদীর পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন।

বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বীরত্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিরূপ অসাধারণ ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বহুস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রে কোনও প্রকার নীচতা ছিল না। বরং অনেকস্থলে তিনি যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি দূরদর্শী, সরল ও দয়ালু ছিলেন। তদানীন্তন মহারাষ্ট্র-রাজপুরুষদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত ও সদ্বক্তা আর কেহই ছিলেন না। তাঁহার দয়ালুতা-গুণে নিজাম-উল্-মুল্ক্ কয়েকবার রক্ষা পাইয়াছিলেন। অনেকের বিবেচনায় এই দয়ালুতার জন্যই তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ বিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি রাজনীতিক কঠোরতার সহিত শরণাপন্ন নিজামের বিনাশ-সাধন করিতে পারিলে মহারাষ্ট্রীয়গণের একটী প্রধান কণ্টক দূরীভূত হইত।

তাঁহার শত্রু।

স্বরাজ্যে বাজী রাওয়ের অনেক শত্রু ছিল। প্রতিনিধি, রঘুজী ভোঁস্‌লে, সেনাপতি দাভাড়ে ও গায়কোয়াড় প্রভৃতি সর্ব্বদা তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি একদা শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে লিখিয়াছিলেন,—

"দাভাড়ে, গায়কোওয়াড় ও বাণ্ডে প্রভৃতি যে সকল সর্দ্দার স্বার্থবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নানা দেশ লুণ্ঠন ও অসংখ্য প্রজার শান্তিনাশ করিয়াছেন, তাঁহারা আজ কোটী কোটী মুদ্রার অধিকারী হইয়াছেন, আর আমি

অভাগা আজীবন তোমার ও মহারাজ শাহুর চরণে কায়মনঃ-সমর্পণ-পূর্ব্বক অকপটভাবে কার্য্য করিয়া আজ অন্নের কাঙ্গাল হইয়াছি!"

ফলতঃ বাজী রাও চিরজীবন নিঃস্বার্থভাবে দেশের কার্য্য করিয়া সাধারণের যে ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই চক্ষুঃশূল হইয়াছিল। নচেৎ তিনি কখনও কাহারও অনিষ্ট সাধন করেন নাই; বরং যে সকল সর্দ্দার সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ-প্রকাশ করিতেন, তিনি দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদিগের সহিত মৈত্রী-স্থাপন করিতেও বিরত হন নাই।

তাঁহার ঋণ।

দেশ হইতে মোসলমান শাসনের উচ্ছেদ করিবার জন্য বাজী রাওকে অতিরিক্ত সৈন্য-পোষণ করিয়া বিষম ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল। দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈনিকদিগকে সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি প্রায়ই অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতেন। সময়ে সময়ে ঋণের জন্য তাঁহাকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হইত, তাহা নিম্নে অনূদিত পত্র হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন,—

শ্রীমৎ পরমহংস পরশুরাম বাবা স্বামীজীর শ্রীচরণেষু।

আজ্ঞাকারী সেবক বাজী রাওয়ের বিনীত নিবেদন—মহারাজ, খণ্ডুজীর হস্তে যে আশীর্ব্বাদপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাইয়াছি। বাবা! তুমি নিজে সন্ন্যাসী হইয়াছ, আর আমাদিগকে সংসার প্রপঞ্চে ফেলিয়া রাখিয়াছ। সেই প্রপঞ্চে পড়িয়া লাভের মধ্যে আমার ২০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ হইয়াছে; ঋণদাতাদিগের নরককুণ্ডে পড়িয়া আমি পচিতেছি।

এই জ্বালা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া গত বৎসর যখন "পিম্পী" তে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি, তখন সমস্ত কার্য্যের ভার তোমার হস্তে অর্পণ-পূর্ব্বক নিঃসঙ্গভাবে দেবার্চ্চনায় মনোনিবেশ করিবার সংকল্প আপনাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। তখন আপনি কৃপা-পূর্ব্বক এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, "ভার্গবের চরণে যখন তোমার ভক্তি আছে, তখন নিশ্চয়ই তুমি সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া বহু অর্থলাভ করিবে, তোমার ঋণ শোধিত হইবে। ভার্গব তোমার সাহায্যকারী হইয়াছেন।" সেই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এতদিন ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু ফলে কিছুই হইল না, যশোলাভ ভিন্ন এক কপর্দ্দকও ধনলাভ হইল না। এখন প্রত্যহ আমাকে ঋণ-দাতাদিগের পায়ে ধরিতে হয়। শিলেদারদিগের পায়ে পড়িতে পড়িতে আমার কপালের চামড়া ক্ষয় হইয়া গেল। আর এরূপ সুখে আমার কাজ নাই। তুমি আইস ও নিজের কার্য্যভার নিজে গ্রহণ কর! অথবা সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট গমন করিতেছি। তোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে যদি এই বৎসরের মধ্যে আমাকে রাজার ও মহাজনের ঋণ হইতে মুক্ত করিস, ত ভাল; নচেৎ তোর দেবতার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব! তোর সন্তানকে ঋণ মুক্ত করিবি, এরূপ আশ্বাস যদি পাই, তবে আরও ৮।১০ মাস জীবন ধারণ করিব। এই কথার মধ্যে যদি কোনও কপটতা থাকে, তবে তোরই নামে শপথ করিতেছি। অথবা তুই কেমন দেবতা যে, আমার মনের কপটতা বা নির্ম্মলতা বুঝিতে পারিতেছিস না! তুই যখন আমার বেদনা বুঝিলি না, তখন আমিই বড় ভাগ্যবান্! আমাদের লজ্জা রক্ষা করা তোরই কর্ত্তব্য। যদি লজ্জা থাকে, তবে আমার উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণের অবশিষ্ট কার্য্য (অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ্য-প্রসার দ্বারা স্বধর্ম্ম-রক্ষা) আমার দ্বারা করাইয়া লও। আর যদি তাহা না করিস, তবে আমার গরিবের উপর

রাগ করিতেছিস্ কেন? তোর কার্য্য-ভার তুই ফিরাইয়া নে, এবং আমাকে এ প্রপঞ্চ হইতে মুক্তি দান কর্। আমি অন্য কোনও দেবতার সেবা করিবার চেষ্টা দেখি গে!"

পারিবারিক সুখ।

বাজী রাও দেশের কার্য্য করিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, দেশের কার্য্য করিতেই তাঁহার জীবনপাত হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্য-কলাপে সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশ গৌরবান্বিত হইয়াছিল। ভগবানের অনুগ্রহে তিনি স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ ভ্রাতা পাইয়াছিলেন। চিমণাজী আপ্পার ন্যায় শৌর্য্যশালী অনুগত ভ্রাতা অতি অল্পলোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। তাঁহাদিগের সৌভ্রাত্র সকলেরই অনুকরণীয় ছিল বলিয়া শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী তাঁহাদিগকে রাম লক্ষ্মণের সহিত তুলিত করিতেন। বাজী রাও গণপতির উপাসক ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রে কয়েকটি আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। তাঁহার ভাগ্যে গুণবান্ ভ্রাতার ন্যায় গুণবতী ভার্য্যারও সমাবেশ হইয়াছিল। তদীয় সহধর্ম্মিণী কাশী বাঈ অতীব ধীর ও গম্ভীর-প্রকৃতি রমণী ছিলেন।

ঐতিহাসিক সিড্‌নী ওয়েন সাহেব তদীয় India on the Eve of British Conquest নামক গ্রন্থে বাজী রাও সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, উপসংহারে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

Baji Rao though a skilful politician and a profound statesman, was at the same time a comparatively straight-

forward, plain spoken soldier, prompt to act—a man for word and blow. Nizam-ul-Mulk, though especially in early life bold as a lion when his passions were aroused, and terrible as fate when he deemed the time for action come, was habitually cautious, calculating, given to a variety of expedients, fond of entangling his adversaries in a network of diplomacy and of reducing their strength by cunningly fomenting dissensions among their followers. *pp.* 185.

Baji Rao's attitude was simple, loyal and at the same time popular : in extending his own conquests he deffer-red habitually to the Rajas authority, and, through his father's wise arrangements, promoted the interests of the whole community. That, in doing so, he should gradually supplant his master in effective influences and establish, on behalf of his own family, what amounted to a federal hegemony, if not a sovereignty, was natural, but did not involve a daily practice of crafty device, or the studious manysidedness inevitable from Nizam-ul-Mulk's ambigu-ous position. *pp.* 186-7.

পরিশিষ্ট।

শ্রীমদ্‌ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর পরিচয়।

বেরার অঞ্চলে দুধেবাড়ী নামক গ্রামে সম্ভবতঃ ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। ইঁহার পিতৃমাতৃ-দত্ত নাম "বিষ্ণু পন্ত" ছিল। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ায় নানারূপে বিপন্ন হইয়া তিনি সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হন। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তিনি বারাণসীতে গমন-পূর্ব্বক বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও তত্রত্য জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী নামক কোনও প্রখ্যাত পরমহংসের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি বিষ্ণু পন্ত 'শ্রীমদ্‌ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী' নামে পরিচিত হইলেন। এই সময়ে ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী মহারাষ্ট্র দেশকে মোসলমানদিগের শাসনপাশ হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন ভাবে শাসনদণ্ড পারিচালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

দীক্ষা-গ্রহণের পর তিনি উত্তরে বদরী নারায়ণ হইতে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থ-ক্ষেত্রাদির দর্শন করিয়া ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কোঙ্কণে উপস্থিত হইলেন। তথায় চিপ্‌লুণের নিকটবর্ত্তী পরশুরাম ক্ষেত্রে দ্বাদশবর্ষ অজ্ঞাতবাস-পূর্ব্বক কঠোর তপস্যার পর তিনি একটি মঠ স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শিবাজীর কনিষ্ঠপুত্র মহারাজ রাজারাম যখন জিঞ্জিদুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন, সেই সময়ে মহারাষ্ট্রে যে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর সাহায্যে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। ফলে মহারাজ রাজারাম স্বামীজিকে "ধামণ" নামক একটি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর-স্বরূপ

দান করেন। অতঃপর মহারাষ্ট্র দেশের অধিকাংশ মান্য গণ্য ব্যক্তিই তাঁহার নিকট জ্ঞান ও ভক্তি-বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ ও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। জঞ্জীরার সিদ্দিদিগের অনেকে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। উন্দেরী দুর্গের অধ্যক্ষ সিদ্দি সুরুর এই হিন্দু ফকিরের সেবা করিয়া জঞ্জীরার সিংহাসনে উপবেশন করিবার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, স্বামীর আশীর্ব্বাদেই ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জঞ্জীরার আধিপত্য প্রাপ্ত হন। বালাজী বিশ্বনাথ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সিদ্দি কাসিমের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তিনি স্বামীজীর উপদেশ-প্রার্থী হইলে তিনি তাঁহাকে মহারাষ্ট্র রাজধানী সাতারায় গমন করিতে উপদেশ দিয়া বলেন, "সাতারায় গমন করিলে তোমার ভাগ্যোদয় হইবে।" গুরুদেবের আশীর্ব্বাদের যাথার্থ্য দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি বালাজীর শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল। বালাজী ও তাঁহার সন্ততিগণের প্রতি স্বামীজীর বিশেষ স্নেহ ছিল। মহারাজ শাহু মোগলদিগের নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মহারাষ্ট্র দেশে আগমন করিলে ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী তাঁহার নিকট স্বীয় কৌপীন ও কটিসূত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, "তুমি অনায়াসে সিংহাসন লাভ করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাপালন করিবে।" শাহুর প্রতি স্বামীজীর এইরূপ অনুগ্রহ-দর্শনে বালাজী বিশ্বনাথ সেনাপতি ধনাজী যাদবকে তারাবাঈর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া শাহুর পক্ষ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দান করেন। বালাজীর পরামর্শক্রমেই ধনাজী যাদব তারাবাঈকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ফলে স্বামীর প্রতি শাহুর শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়।

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী ভিক্ষার দ্বারা বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন মহারাজ শাহু ও মহারাষ্ট্র সর্দ্দারেরা তাঁহাকে দেবসেবার উদ্দেশ্যে যে সকল ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহারও বার্ষিক আয় প্রায় ষোড়শ সহস্র

মুদ্রা ছিল। তাঁহার হস্ত্যশ্বপদাতিকাদির সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। তিনি মৃত্যুকালে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৬৩৭৫/৫ রাখিয়া গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কারাদিও তাঁহার ধনাগারে ভূরিপরিমাণে সঞ্চিত ছিল। কিন্তু এইরূপ অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও স্বামীজী স্বয়ং কখনও গোমূত্র ও তক্র ভিন্ন অন্য দ্রব্য উদরস্থ করিতেন না! তাঁহার সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই তিনি সার্ব্বজনিক হিতার্থে ব্যয় করিতেন। অবশিষ্টাংশ দেবসেবায় ব্যয়িত হইত। তিনি দেশের নানাস্থানে দেবালয় ও ধর্ম্মশালাদির প্রতিষ্ঠা এবং কূপতড়াগাদির খননে প্রায় ৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৫ শতাধিক মুদ্রা ব্যয়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য বাজী রাও ও অন্যান্য মারাঠা সর্দ্দারগণ তাঁহার নিকট লক্ষাধিক মুদ্রা ঋণ-সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেশের পথ ঘাটের সংস্কারের জন্য তিনি প্রায়ই জমীদার ও সর্দ্দারদিগকে আদেশ করিতেন। তাঁহার আদেশ সহসা কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিত না। তিনি ভিক্ষা-সংগ্রহের জন্য দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ-পূর্ব্বক লোকের অভাব অভিযোগাদির বিষয় রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর করিয়া যথাসম্ভব তৎপ্রতীকারের ব্যবস্থাও করাইতেন।

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর দেশ-হিতৈষণা অতি উচ্চ অঙ্গের ছিল। যাহাতে মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম ও মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের উন্নতি হয়, সে বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা যত্ন করিতেন। কোঙ্কণ হইতে সিদ্দি ও ফিরিঙ্গীদিগের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধনের জন্য তিনি বহুবার মহারাজ শাহু, বাজী রাও, চিমণাজী আপ্পা, ও আংগ্রে প্রভৃতিকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা যাহাতে সিদ্দি ও ফিরিঙ্গীদিগকে সহায়তা না করেন, সে জন্য তিনি বোম্বাইয়ে গিয়া তাঁহাদিগের সহিত সখ্য-সংস্থাপনের চেষ্টাতেও বিরত হন নাই। বিধর্ম্মীর সহিত যুদ্ধে প্রণোদিত করিবার সময় তিনি মহারাষ্ট্রীয় সেনানীগণকে রামায়ণ মহাভারতোক্ত বীরবৃন্দের সহিত তুলিত করিয়া উদ্দীপনাপূর্ণ পত্র

লিখিতেন। কেবল তাহাই নহে, বন্দুক, কামান ও অসি ভল্লাদি অস্ত্র-দানেও তিনি তাঁহাদিগের সহায়তা করিতেন। সমর-বিজয়ী সেনানীদিগকে তিনি দৈবানুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি দিয়া পুরস্কৃত ও পরিতুষ্ট করিতেও বিলম্ব করিতেন না। তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তিতে সাধারণের বিশ্বাস থাকায় তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অনেক সময়েই দেশের রাজপুরুষদিগের দ্বারা দৈব আদেশ-রূপে পরিপালিত হইত এবং উহা তাঁহাদিগের অধিকাংশ কার্য্যকে ধর্ম্মভাবে সমুজ্জল করিয়া তুলিত। অধিকাংশ মহারাষ্ট্র সর্দ্দারের জননী ও গৃহিণীগণ তাঁহাদিগের পুত্র ও স্বামী প্রভৃতির মঙ্গলের জন্য তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ ও প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে পত্র লিখিতেন। পরমহংস ব্রহ্মেন্দ্রও তাঁহাদিগকে মন্ত্রপূত কবচাদি প্রেরণ-পূর্ব্বক সেতুনির্ম্মাণ ও কূপ-খননাদি কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেন। লোকে তাঁহাকে ভার্গবের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত।

স্বামীজী স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইলেও দেশ-হিতসাধনের জন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিষম কোপ প্রকাশ করিতে হইত। কেহ তাঁহার আদেশ পালন না করিলে তিনি তক্র ও গোমুত্র-প্রাশন এবং ক্ষৌরকার্য্য পরিত্যাগ করিতেন। এজন্য কখনও কখনও তাঁহার দীর্ঘকাল অনশনে কাটিয়া যাইত। এ সংবাদ মহারাজ শাহুর কর্ণগোচর হইলে তিনি পাত্রমিত্রগণ সহ তাঁহার নিকট গিয়া তদীয় ক্রোধোপশমের চেষ্টা করিতেন।

বাজীরাও ও চিমণাজী আপ্পার প্রতি ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর বিশেষ স্নেহ ছিল। স্বরাজ্যের হিত-সাধনে ও হিন্দু-ধর্ম্ম-রক্ষায় তাঁহাদিগের আগ্রহ দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তিনি বাজী রাওকে প্রভূত অর্থ ঋণস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথও তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য লাভ করিতেন। বাজী রাও যে সকল সমরাভিযান

করিয়া স্বরাজ্য-বৃদ্ধি ও মোসলমান-শক্তি খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা, স্বামীজীর নিকট যথাসময়ে অর্থ সাহায্য না পাইলে, তাঁহার পক্ষে কতদূর সম্ভবপর হইত, বলা যায় না।

স্বামীব্রহ্মেন্দ্র প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে সমাধিস্থ হইতেন এবং পূর্ণ এক মাসকাল যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক ভাদ্র শুক্লা চতুর্থীর দিনে গুহা-ত্যাগ করিতেন। তাঁহার সমাধিবিসর্জ্জন-কালে মহারাজ শাহু স্বীয় সদস্যবর্গসহ তথায় উপস্থিত হইতেন। বাজী রাও ও চিমণাজী আপ্পার মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। বাজী রাওয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তিনি কয়েক দিন গোমূত্র ও তক্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে চিমণাজী ইহলোক-ত্যাগ করিলে স্বামীজী রাজনীতিক ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার অল্প দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পেশওয়েদিগের কুল-গুরু।

নিম্নে যে মূল পত্রের অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে, তাহা বাজী রাওয়ের কনিষ্ঠপুত্র রঘুনাথ-বাজীরাও কর্ত্তৃক ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ তারিখে বারাণসী-স্থিত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত নারায়ণ ভট্ট দীক্ষিত মহোদয়ের পুত্র বাসুদেব ভট্ট দীক্ষিতকে লিখিত। নারায়ণ ভট্ট, পেশওয়ে বংশের কুল-গুরু ছিলেন। প্রথম পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষিত মহোদয় অসাধারণ বিদ্বান্ ও তপোনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া সে কালের অধিকাংশ রাজপুরুষই তাঁহাকে ব্রহ্মোত্তর-স্বরূপ বহু সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। রাজনীতিক ব্যাপারেও তিনি অনেক রাজপুরুষকে উপদেশ দিতেন। উত্তর ভারতের অনেক রাজনীতিক গুপ্ত সংবাদ তিনি পেশওয়েদিগকে প্রদান করিতেন। রাজপুরুষদিগকে ধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্ত করা তাঁহার একটী প্রধান কার্য্য ছিল।

"শ্রী

বেদ-শাস্ত্র-সম্পন্ন রাজশ্রী বাসুদেব দীক্ষিত স্বামী মহোদয়েষু—বিদ্যার্থী রঘুনাথ বাজীরাও নমস্কার, নিবেদন এখানকার কুশল জানিয়া স্বীয় কুশলাদি লিখিবেন। আপনার পত্রের উত্তর যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে।

১। কৈলাসবাসী রাও মহোদয় কৈলাসবাসী তীর্থস্বরূপ নানা দীক্ষিত মহোদয়কে (১) মথুরা প্রদেশের উদ্ধার হইলে (২) যে দশটি গ্রাম দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা আপনি এই ক্ষণে চাহিতেছেন। বলা বাহুল্য, মথুরা প্রদেশ হস্তগত হইলেই পিতৃদেবের প্রতিশ্রুতি অনুসারে দশটি গ্রাম আপনাকে দেওয়া যাইবে।

২। অধুনা গুজরাথ প্রদেশ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, পূজনীয় দীক্ষিত মহোদয়ের উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা ক্ষেত্রও আমাদিগের (শাসনাধীন) হইয়াছে।

সেখানে প্রত্যহ এক শত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সেই ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আপনি গ্রামদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে, আমি পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে পাচ হাজার টাকা আয়ের গ্রাম সরকার হইতে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াইব।

যে দুইটি বিষয়ে এই পত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলাম, তাহা যথোক্তরূপে প্রতিপালিত হইবে। রওনা—চান্দ্র ২৫ জমাদিলাওয়ল সুরুসন আর্ব্বা খমসেন ময়া ব অল্লফ (১১৫৪) অধিক লেখা বাহুল্য, এই নিবেদন।"

এই পত্র খানি উত্তর ভারতের কোনও স্থান হইতে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের মতে

---

(১) কৈলাসবাসী রাও—স্বর্গীয় প্রথম বাজীরাও। নানা দীক্ষিত—নারায়ণ ভট দীক্ষিত। মহারাষ্ট্র জাতি শিবোপাসক বলিয়া "স্বর্গীয়" স্থলে "কৈলাসবাসী" লিখিত হইয়াছে। তীর্থ-স্বরূপ অর্থে পূজনীয়।

(২) অধিকার শব্দের পরিবর্ত্তে রঘুনাথ রাও এ স্থলে "উদ্ধার" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা প্রণিধান-যোগ্য। "অধিকার" বলিলে নবরাজ্য লাভ বুঝাইত, কিন্তু এই লেখক মথুরা অধিকারকে রাষ্ট্রবর্দ্ধিনী নীতির অন্তর্ভুক্ত না করিয়া, মোসলমানদিগের হস্ত হইতে উক্ত তীর্থক্ষেত্রের উদ্ধার সাধন আপনার পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মারাঠারা গুজরাথে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। এই পত্র পাঠে নিঃসন্দেহ প্রতীয়মান হইবে যে, ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের ২০ শে মার্চ্চের পূর্ব্বে সমগ্র গুজরাথ, এমন কি, উহার শেষ সীমান্তবর্ত্তী দ্বারকাক্ষেত্র পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তগত হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমর-নীতি।

সমর-যজ্ঞ—ব্যবস্থিত ও অব্যবস্থিত।

যুদ্ধবিদ্যা একটী অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা। জাগতিক নিয়মানুসারে ইষ্টলাভ করিবার জন্য পৃথিবীর সকল জাতিকেই কখনও না কখনও এই বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমাদিগের শাস্ত্রকারদিগের মতে "ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর যজ্ঞ আর নাই।" পাশ্চাত্য দেশসমূহে সংগ্রাম-যজ্ঞের যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান মানব-সমাজের পক্ষে সর্ব্বকাম-প্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অবস্থাভেদে সংগ্রাম-যজ্ঞে প্রকার-ভেদ সংঘটিত হইয়া থাকে। অনুষ্ঠান-প্রণালীর পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শ্রেণী-বিভাগ করিতে গেলে সমর-সত্রকে প্রধানতঃ ব্যবস্থিত ও অব্যবস্থিত এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। ব্যবস্থিত সমর-যজ্ঞ লোক-সমাজে সাধারণতঃ সম্মুখ-যুদ্ধ নামে পরিচিত। অব্যবস্থিত সমর-প্রণালীকে ইংরাজি ভাষায় "গরিলা ওয়ার-ফেয়ার" বলে। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে কূট-যুদ্ধ নামে অভিহিত করিয়া ইহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই অব্যবস্থিত রণ-পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী এদেশে মোগল-শাহী, আদিলশাহী ও কুতবশাহীর বক্ষের উপর প্রচণ্ড মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, শিবাজীর বংশধরেরা অওরঙ্গজেবের পরিচালিত দ্বাদশ লক্ষ সেনার সহিত প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর যুদ্ধ করিয়া আপনাদের স্বাধীনতা-সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপরে মহারাজ শাহুর শাসনকালে মহাবীর বাজী রাও অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াই দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা হইতে উত্তরে যমুনা নদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের বিস্তার-সাধন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ

শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত এই সমর-নীতির বলেই ভারতের অধিকাংশ স্থলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। পাণিপথের সমর ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয়েরা অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াই ঘোর বিপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকের ধারণা। পক্ষান্তরে রাজপুতেরা শৌর্য্যে বীর্য্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন না হইলেও আলোচ্য সমর-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে না পারায় পঞ্চ শত বৎসরের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা-সত্ত্বেও রাজপুতনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তথাপি অনভিজ্ঞ জনগণের নিকট, অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতির অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রেয়োলাভকারী মহারাষ্ট্রীয়েরা বীরগৌরবের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হন নাই। কারণ, তাহাদিগের বিশ্বাস যে, সম্মুখ সমরে প্রাণ-ত্যাগের অপেক্ষা বীরত্ব আর নাই। সে কালের মোসলমান ইতিহাস-লেখকেরা বিদ্বেষবশে এবং এ কালের সমরতত্ত্ব-বিশারদ ইংরাজ ইতিহাস-রচয়িতারা প্রকৃত তত্ত্বগোপনের উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবলম্বিত সমর-প্রণালীর নিন্দা করিয়াছেন, এবং যে সমর-প্রণালীর অবলম্বনে রাজপুত-দিগের পঞ্চশত বৎসরের চেষ্টা বিফল হইয়াছিল, তাহারই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদিগের মতে উভয়বিধ সংগ্রাম-যজ্ঞেরই মূল উপকরণাদি এক বা বহু পরিমাণে অভিন্ন। এই উভয় যজ্ঞে সংগ্রাম-দেবতার দৃশ্যমান মূর্ত্তি আপাততঃ কিয়ৎ পরিমাণে বিসদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহাতে প্রকৃতিগত বৈষম্যের লেশমাত্র থাকে না। শৌর্য্য ও সাহস, ক্ষিপ্রতা ও সহিষ্ণুতা, স্বদেশ-প্রীতি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী উভয় যজ্ঞেরই প্রধান উপকরণ; বরং অব্যবস্থিত সমরে এই সকল উপকরণের আবশ্যকতা অপেক্ষাকৃত অধিক, এবং সংগ্রাম-দেবতাও এই সকল উপচারেই সমধিক প্রীত হইয়া যজমানকে অভীষ্ট-বর প্রদান করিয়া থাকেন।

ব্যবস্থিত সমর-যজ্ঞ প্রভূত ব্যয়-সাধ্য ও আড়ম্বর-মূলক। অব্যবস্থিত সংগ্রামযাগ নিরাড়ম্বর হইলেও অতুল শৌর্য্য-সাপেক্ষ। সুসজ্জিত তুরগ-পদাতি-সঙ্কুল বিচিত্র-যন্ত্রাস্ত্র-শস্ত্রবহুল সেনা-সাগর অপেক্ষাও প্রকৃত যোদ্ধৃ-জনোচিত গুণগ্রামে যে সর্ব্বকালেই রণচণ্ডীর প্রকৃতিগত প্রীতি অধিকতর, তাহা বিগত ইংরাজ-বুয়র যুদ্ধে, মার্কিনদিগের সহিত ফিলিপাইনবাসীর সমরে ও রুশ-চীন সংঘর্ষে বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ

শতাব্দীর শেষভাগে সাম্রাজ্য-মদোদ্ধত দ্বাদশ লক্ষ (কাফি খানের মতে বিংশতি লক্ষ) মোগল সেনার সহিত লক্ষৈক মাত্র মহারাষ্ট্র বীরের ত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী সংগ্রামও ইহার অন্যতম নিদর্শন। সেকালের পক্ষপাত-কলুষিত-চিত্ত মোসলমান ও একালের রাজনীতিক উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী ভারতীয় ইংরাজ লেখকেরা এবিষয়ে যাহাই বলুন না কেন, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে, সমর যজ্ঞ ব্যবস্থিত হউক, আর অব্যবস্থিত হউক, বীরত্বই এই যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতার তৃপ্তিকর পূর্ণাহুতি। এই কারণে সংগ্রাম-যজ্ঞে প্রকার-ভেদ বা অনুষ্ঠান-প্রণালীর বিভেদ ঘটিলেও উহার মূল প্রকৃতির কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না।

জগতে সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশে যে সকল সর্ব্ব-লোক-ক্ষয়কর অদ্ভুত আগ্নেয়াস্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে, তাহার সাংঘাতিক শক্তি-দর্শনে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া এতদিন অনেকে মনে করিতেছিলেন, অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতি অসভ্য যুগেরই উপযোগী, অর্দ্ধসভ্য সমাজে অবস্থা-বিশেষে উহা আংশিক ফলোপধায়িনী হইয়াছিল, কিন্তু এই বিজ্ঞান-সমুজ্জ্বল যুগে উহার কার্য্যকারিতা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের ভ্রান্তি বিগত বুয়র যুদ্ধে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে ইউরোপের সমর-নীতি-বিশারদ সেনানীগণও তাঁহাদিগের এই দীর্ঘকালের অবজ্ঞাত সমর-পদ্ধতির আশ্চর্য্য শক্তি-দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া ইহার তত্ত্বালোচনায় মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইতেছেন।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন অসীম শক্তিশালী ইংরাজ সার্দ্ধ দ্বিলক্ষ সেনার দ্বারা দক্ষিণ আফরিকার "পথঘাট মাঠ" ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন, ট্রান্সভাল ও ফ্রীষ্টেটের গ্রাম নগর, কানন-প্রান্তর, অধিত্যকা উপত্যকা, এমন কি, গিরি-সঙ্কটসমূহ পর্য্যন্ত আপনাদিগের সেনা-তরঙ্গে পরিপ্লাবিত করিয়া অর্দ্ধশিক্ষিত বুয়র কৃষকদিগকে পদ-দলিত করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে, অব্যবস্থিত সমর-প্রণালীর ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ইংরাজ-সেনার দর্প চূর্ণ হইবে, যে সকল কামানের অগ্ন্যুদ্গারে বড় বড় নগর মুহূর্ত্ত-কাল-মধ্যে জন-শূন্য হইয়া যায়, তাহাদিগের শক্তি মন্ত্রমুগ্ধ বিষধরের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যাইবে, যে যন্ত্র-পরিচালিত আগ্নেয়াস্ত্রের প্রত্যেক ফুৎকারে মিসরের সহস্র সহস্র শৌর্য্যশালী দরবেশী মুহূর্ত্ত-মধ্যে বায়ু-তাড়িত ভস্মরাশির

ন্যায় উড়িয়া গিয়াছিল, এক্ষেত্রে সে সকলের অমোঘ শক্তিও সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না; অধিক কি, যে সকল দিগ্বিজয়ী ইংরাজ-সেনানী আফগানিস্থান, ব্রহ্মদেশ, মিশর, সুদান প্রভৃতি সমরক্ষেত্রে বিজয়-লক্ষ্মীর বরণীয় হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও বুয়র-ভূমিতে অপমান-লাঞ্ছিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে এবং পরিশেষে বাহুবলদৃপ্ত বৃটিশ-সিংহকে কিয়ৎপরিমাণে "ত্বয়ার্দ্ধং ময়ার্দ্ধং" ন্যায়ে দক্ষিণ আফরিকার অর্দ্ধ-সভ্য কৃষকগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া কোনও প্রকারে আত্মসম্মান-রক্ষা করিতে হইবে! ইংলণ্ডীয় রাজনীতি-বিশারদ রাজপুরুষেরাও, বুয়র-ক্ষেত্রে যে তাঁহাদিগের সামরিক বলের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইবে, তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই।

ফলতঃ বুয়র যুদ্ধের ফলে বর্ত্তমান রণ-বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সম্যক্ প্রকারেই লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়াছে। মহাত্মা শিবাজী, মহাবীর বাজী রাও ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় বীরগণের অবলম্বিত অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতির কার্য্যকারিতা যে নিত্য, বর্ত্তমান যুগেও যে উহার মহিমা অব্যাহত রহিয়াছে, ইহা দক্ষিণ আফরিকার সমর-সূত্রে অবি-সংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব আফ্রিকার সোমালি-ক্ষেত্রেও এই সংগ্রাম-নীতির অকিঞ্চিৎকরতা পরিদৃষ্ট নাই। ফলতঃ যে সমর-প্রণালীর অবলম্বন করিয়া শিবাজী ও বাজী রাও-প্রমুখ মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, অনভিজ্ঞ ও বিদ্বেষ-পরায়ণ লেখকেরা এতদিন তাহার নিন্দা করিলেও এই বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে উহার প্রকৃত মহিমা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই কারণে এই সংগ্রাম-পদ্ধতির প্রকৃতি-পর্য্যালোচনা করিতে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু পাঠকের সহজেই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পাঠক-বর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য এই পরিশিষ্টে সংক্ষিপ্ত ভাবে অব্যবস্থিত সমর-যাগের প্রকৃতি, অনুষ্ঠান-প্রণালী ও তদানুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিবার সংকল্প করিয়াছি।

সংগ্রাম-যজ্ঞে প্রকার-ভেদ বা অনুষ্ঠান-প্রণালীর বিভেদ ঘটিলেও উহার মূল প্রকৃতির বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না, একথা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও যেমন পরিচ্ছদধারীর প্রকৃতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, সেইরূপ প্রাচীনকালের

অসি-ভল্ল চর্ম্মাদির পরিবর্ত্তে অধুনাতন যন্ত্র-চালিত আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি উপকরণের প্রবর্ত্তন হইলেও রণ-চণ্ডীর প্রকৃতি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সংগ্রামাধিষ্ঠাত্রী দেবতার এই প্রকৃতি-গত নিত্যত্ব বুয়র যুদ্ধে ও সোমালি ক্ষেত্রের সমরে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, বলিয়াছি। পাশ্চাত্যগণের অবজ্ঞাত অব্যবস্থিত সমরে শৌর্য্য, সাহস, ক্ষিপ্রতা, সহিষ্ণুতা, স্বদেশপ্রীতি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য প্রভৃতি প্রকৃত যোদ্ধৃজনোচিত গুণগ্রাম যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, একথাও বুয়র-যুদ্ধের ফলে সকলের সুগোচর হইয়াছে। ইংলণ্ড পর্ব্বত-প্রমাণ অর্থরাশি ব্যয় করিয়া ও অসীম শক্তিমত্তার বলে অনায়াসে ২।৩ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য দক্ষিণ আফরিকায় প্রেরণ করিতে পারিয়াছিলেন; টোটা বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধ-সামগ্রী নিঃশেষ হইতে না হইতে জাহাজের পর জাহাজ পূর্ণ করিয়া রণসম্ভার পাঠাইয়াছিলেন, অশ্বের অভাব অনুভূত হইবামাত্র পৃথিবীর যে যে প্রদেশে ঘোটক পাওয়া যায়, সেই সেই প্রদেশ হইতে উচ্চ মূল্যে সহস্র সহস্র অশ্ব ক্রয় করিয়া সমরক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন; এক কথায় ধন-বলে, জন-বলে ও বুদ্ধি-বলে যাহা কিছু সংগ্রহ করা সম্ভবপর, বুয়র-যুদ্ধে ইংরাজ তাহার কিছুই সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু এত করিয়াও তাঁহারা একজন ডিলারী, ডিওয়েট বা বোথা সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারিয়াছিলেন কি? অর্থের অভাব ছিল না, লোকজনের অভাব ছিল না, বুদ্ধি-বলেরও অভাব ছিল না; তথাপি ইংরাজ-শিবিরে পদে পদেই ডিওয়েট, ডিলারি ও বোথার অভাব অনুভূত হইয়াছিল। ইংরাজ যদি তাঁহাদিগের সাম্রাজ্যের কহিনূর ভারতবর্ষও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইতেন, তাহা হইলেও বিনিময়ে বুয়রদিগের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল, স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য ত্যক্ত-প্রাণ, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, যুযুৎসু সেনাদল সংগ্রহ করিতে পারিতেন কিনা, সন্দেহ। কারণ, যে বীরজনোচিত গুণগ্রামে সংগ্রাম-দেবতার আন্তরিক তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে, তাহা অর্থের বিনিময়ে কোন দেশের বিপণীতেই পাওয়া যায় না। শিবাজী ও বাজী রাওয়ের মহারাষ্ট্রীয় সেনা সেই সকল দুর্লভ গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিল। এই কারণে অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা মোগল-সাম্রাজ্যের স্থানে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভ যেরূপ আপনাকে প্রকৃত সিংহ মনে করিয়া

আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিল, বিজ্ঞান-কৌশলে উদ্ভাবিত নূতন অস্ত্র-শস্ত্রাদির অধিকারী হইয়া পাশ্চাত্য-সমরনীতি-বিশারদেরা সেইরূপ আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, যে পক্ষে দূরগামী-গুলিকা (Long ranged) ও সূক্ষ্ম ছিদ্র-যুক্ত, বহুমুখ বন্দুক, পৌরাণিক কালের ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় অনিবার্য্য অগ্নিবর্ষী কামানশ্রেণী, যন্ত্র-চালিতবৎ, শিক্ষিত সৈন্যদল, সমর-সংক্রান্ত কতিপয় সুপ্রতিষ্ঠিত কৌশল—প্রভৃতি বিষয়ের আয়োজন থাকে, সে পক্ষকে কেহই যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে না। এক পক্ষে যতগুলি বন্দুক থাকে, অপর পক্ষে অন্ততঃ ততগুলি বন্দুক না থাকিলে, যুদ্ধে জয় লাভ করা অসম্ভব হইয়া উঠে, বন্দুকের অভাব মানসিক বলের দ্বারা কখনই দূরীভূত হয় না, উভয় পক্ষে সমান শক্তি-বিশিষ্ট তোপখানা না থাকিলে দুর্ব্বল পক্ষের পরাজয় বুদ্ধি-কৌশলে নিবারণ করা অসম্ভব, প্রভৃতি ধারণা এতদিন পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল। ত্রিশ সহস্র সৈনিক তিনলক্ষ সুশিক্ষিত সুসজ্জিত সৈন্যদলের সহিত তিন বৎসর কাল যুদ্ধ করিতে পারে, ইংরাজের ন্যায় ধনবল-মদ-মত্ত, সুসভ্য রাজশক্তির দর্পচূর্ণ করিতে পারে, "দন্তে তৃণ-ধারণ-পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে, যুদ্ধ স্থগিত হইবে না" বলিয়া যাঁহারা গর্ব্বোক্তি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শান্তি-প্রয়াসী করিয়া তুলিতে পারে—একথা বুয়র-যুদ্ধের পূর্ব্বে সাধারণের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতির অবলম্বন করিয়া বুয়র বীরেরা পাশ্চাত্য রণ-পণ্ডিতদিগের চির-পোষিত ভ্রান্তির সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়াছেন।

বুয়রদিগের হস্তে যদি ইংরাজদিগের বন্দুকের ন্যায় দূর-লক্ষ্যভেদী উৎকৃষ্ট বন্দুক না থাকিত, তাহা হইলে বীরোচিত গুণগ্রাম প্রকাশ করিয়াও তাঁহারা কিছুমাত্র সুফল লাভ করিতে পারিতেন না, একথা বলাই বাহুল্য। ফলতঃ উভয় পক্ষে সমান শক্তি-বিশিষ্ট (সমান-সংখ্যক নহে,) অস্ত্রের সদ্ভাব থাকিলে যে পক্ষ প্রকৃত বীরোচিত গুণনিচয়ে অলঙ্কৃত থাকে ও অব্যবস্থিত সমর-প্রণালীর পক্ষপাতী হয়, সে পক্ষ সংখ্যায় ত্রিশ সহস্র হইলেও শত্রু-পক্ষীয় দুই লক্ষ ৭০ হাজার সুসজ্জিত চতুরঙ্গী সেনার সমকক্ষতা করিতে পারে! অব্যবস্থিত সমর-যজ্ঞের ফল এইরূপ বিস্ময়কর। ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও শত্রু-পক্ষের অনুরূপ অস্ত্র শস্ত্র এই

সত্রের প্রধান উপকরণ। যে দেশে অধিবাসীদিগের মধ্যে স্বদেশ-ভক্তি জাগরূক আছে, যাহারা বিলাসিতার চরম শিখরে উপনীত হয় নাই, পরন্তু সময় বিশেষে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত হইতে পারে, যে দেশের লোকের বুদ্ধি নিতান্ত হীন নহে, সেই দেশ যদি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে প্রতিবেশী শত্রুর সমসংখ্যক ও সমান-শক্তিবিশিষ্ট সৈন্যদল সংগ্রহ করিবার যে বিশেষ আবশ্যকতা থাকে না, তাহাও বুয়র-যুদ্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ত্রিশ সহস্র সৈন্য স্বদেশে থাকিয়া অব্যবস্থিত সমর-প্রণালী-ক্রমে যুদ্ধ করিলে তিন লক্ষ ইংরাজ সৈন্যের সমকক্ষতায় অপারগ হয় না, একজন আত্মরক্ষাকারী, শত্রুপক্ষীয় দশজনের নিকট দুর্জ্জয় হইয়া উঠে—একথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা শিবাজীর শিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় বীরেরা অব্যবস্থিত যুদ্ধ-পদ্ধতির অনুসরণে যেরূপে অসংখ্য সৈন্যপরিবেষ্টিত মোগল-সম্রাট অওরঙ্গজেবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার সহিত ইংরাজ বুয়র-যুদ্ধের বহুল সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ডিওয়েট, ডিলারির ও বোথার অদ্ভুত কার্য্য-কলাপের বিবরণ পাঠ করিলে সপ্তদশ শতাব্দীর অবসান কালে মহারাষ্ট্র বীরেরা মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে যে সকল অসাধ্য-সাধন করিয়াছিলেন, তাহারই বিবরণ পুনর্ব্বার পাঠ করিতেছি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতির গুণে আজ ত্রিশ সহস্র বুয়র সৈন্যের হস্তে তিন লক্ষ ইংরাজ-বাহিনীকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে, সেই সমর-পদ্ধতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের আয়ত্ত হইলেও ভারতবর্ষে ইংরাজ বণিক বিজয়-লক্ষ্মীর অধিকারী হইতে পারিলেন কিরূপে? ইংরাজেরা মুষ্টিমেয় ব্যবস্থিত সৈনাদল লইয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে সর্ব্বত্রই অজেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণে মান্দ্রাজ প্রদেশ ইংরাজের ব্যবস্থিত সেনাদলের দর্শন-মাত্রে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পূর্ব্বাঞ্চলে বঙ্গদেশও প্রায় বিনা যুদ্ধেই ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে। দক্ষিণাপথের সুভেদার, হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর নবাগত ইংরাজ বণিকের ব্যবস্থিত সৈন্যের আশ্রয়ে

বাস করা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌর নবাবেরা আপনাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে অসমর্থ হন। মহারাষ্ট্র পেশওয়েগণ ও উত্তর ভারতে শিন্দে, হোলকর প্রভৃতি মহারাষ্ট্র সামন্তগণ মোগল-সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াও ইংরাজের জন্য উহার সুখভোগ করিতে পান নাই। দুর্দ্ধর্ষ শিখদিগকে কাবুল-বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজের সেবায় মনোনিবেশ করিতে হয়। এইরূপে প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে ইংরাজ মুষ্টিমেয় হইয়াও বিগত এক শতাব্দী কাল হইতে বিজয়-লক্ষ্মীর একমাত্র বরণীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই ইংরাজ তিন লক্ষ সেনা ও বিপুল যুদ্ধ-সম্ভার-সহ দক্ষিণ আফ্রিকায় ত্রিশ সহস্র অর্দ্ধ শিক্ষিত বুয়র-কৃষকের হস্তে বিড়ম্বিত হইলেন কিরূপে? একই অব্যবস্থিত সমর-প্রণালী ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন ফল প্রদান করিল কিরূপে? উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ আফ্রিকায় ও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ ভারতে যে সমর-পদ্ধতি ঐন্দ্রজালিক ফল প্রসব করিয়াছিল, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে হিন্দু-মোসলমান ও ইংরাজের সমরে তাহা এরূপ নিষ্ফল হইল কেন? এসকল প্রশ্ন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু পাঠকের মনে সহজেই উদিত হয়।

এই সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে, অব্যবস্থিত সমরের অনুষ্ঠান-প্রণালী সংক্রান্ত কয়েকটী মৌলিক তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সাধারণ সমর-প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ পাঠকবর্গের অনেকেই বোধ হয় সমর-বিজ্ঞান-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অতএব সাধারণ সমর-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত কয়েকটী তত্ত্ব পাঠকের গোচর করিয়া অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। সেই আলোচনা পাঠ করিলে সকলেই মহারাষ্ট্র-সমর-পদ্ধতির উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

সামরিক ক্ষেত্র-নীতি।

যজ্ঞ-ভূমির নির্ব্বাচন ও যজ্ঞবেদি-নির্ম্মাণ যেরূপ সাধারণ যাগের এক প্রধান অঙ্গ, রণভূমির নির্ব্বাচনাদি কার্য্যও সমর-সত্রের সেইরূপ অতি প্রধান অঙ্গ। এই অঙ্গকে ইংরাজিতে ষ্ট্রাটাজেম (Stratagem) বলে।

আমরা এই ব্যাপারকে সামরিক ক্ষেত্র-নীতি নামে অভিহিত করিতে পারি। যুদ্ধক্ষেত্র-নির্ব্বাচন, সৈন্য-নির্য্যাণ, শিবির-সংস্থাপন, আয়ুধাগার, ভাণ্ডাগার, যোধাগার, বলাধিকরণ প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়ক বিচার এই ক্ষেত্রনীতি শাস্ত্রের অন্তর্গত। যন্ত্র-বহুল সুশিক্ষিত সেনার অভাব-সত্ত্বেও কোনও কোনও স্থলে কেবল প্রকৃষ্ট সামরিক ক্ষেত্র-নীতির অনুবর্ত্তী হইয়াও বহুলাংশে বিজয়-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। শত্রুপক্ষ কোথায় অবস্থিত, কোন স্থানে অরাতিদলের আবির্ভাব সম্ভবপর, কোন্ কোন্ পথে তাহাদিগের অভিযান করিবার সম্ভাবনা ও সুবিধা হইতে পারে, কোন্ দিক্ দিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যভিযান করিলে স্বপক্ষের জয়-লাভ সুনিশ্চিত, কোন্ কোন্ স্থানে শত্রুপক্ষের মিত্রবল-লাভের সম্ভাবনা, স্বপক্ষীয়েরাই বা কোন্ কোন্ স্থান হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারে, অন্নসামগ্রী ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি যুদ্ধ-সম্ভারসমূহ কোথায় সঞ্চিত করিয়া রাখিলে নিরাপদ থাকিবে ও যথাকালে সমরাঙ্গণে উহা স্বপক্ষীয় সৈন্যদলের হস্ত-গত হইতে পারিবে প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া রণ-প্রাঙ্গণ নির্ব্বাচন করাই ক্ষেত্রনীতির প্রধান লক্ষ্য।

পরন্তু একস্থানে স্বপক্ষের পরাভব ঘটিলে প্রত্যাবর্ত্তন ও বিশ্রাম-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শত্রু-সেনার সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করিবার পক্ষে সুবিধাজনক স্থান কোন্গুলি, কোন্ কোন্ স্থানে শত্রুপক্ষের আক্রমণ অতিক্রম করিতে হইবে, কোথায় তাহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে, কোথায় পাশ কাটাইয়া আত্ম-রক্ষা করিতে হইবে, বিপক্ষদলের সহায়তাকারী মিত্রবলকে কোন্ স্থানে অবরুদ্ধ করিতে হইবে, কোথায় তাহাদিগকে আক্রমণের ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে, আর কোন স্থানেই বা বিপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তিগণের উপর আপতিত হইয়া স্বপক্ষীয় বীরগণের শৌর্য্যানল প্রদীপ্ত করত শত্রু-নাশ করিতে হইবে প্রভৃতি সমর-ক্ষেত্র-সংক্রান্ত বহু বিষয়ের বিচারও এই ক্ষেত্রনীতির অন্তর্ভুক্ত। ক্ষেত্রনীতিজ্ঞ ব্যক্তি শ্যেনবৎ তীব্র দৃষ্টির সাহায্যে শত্রুপক্ষের বলাবল, গতিবিধি, মন্ত্রণা ও উদ্দেশ্যাদির পর্য্যবেক্ষণ ও যে কোনও প্রকারে গৃহ-বিবাদাদির নিবৃত্তি-বিধান দ্বারা আত্মপক্ষীয় সমস্ত বলের একতাসাধন-পুরঃসর সুসজ্জিতভাবে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করেন, এবং যুদ্ধারম্ভ মাত্র বীরত্ব-প্রকাশ করত শত্রুপক্ষীয় সেনামুখের উৎসাদন করিয়া বিজয়-লক্ষ্মীকে

বলপূর্ব্বক স্বকীয় অঙ্কশায়িনী করিতে সমর্থ হন। এই কারণে সমরশাস্ত্রে ক্ষেত্রনীতি-জ্ঞানের ভূয়সী-প্রশংসা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইষ্ট-লাভের উদ্দেশ্যে যে প্রদেশে উভয় পক্ষীয় সৈন্য-দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়, সেই প্রদেশকে সমারঙ্গণ বা সামরিক রঙ্গভূমি (Theatre of war) বলে। স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগের সমরাঙ্গণে প্রবেশের বিভিন্ন মার্গাদি, উহার নিকটবর্ত্তী দুর্গ বা সুদৃঢ় আশ্রয়স্থানসমূহ এবং যেস্থান পর্য্যন্ত স্বপক্ষীয় সেনাদল ও যুদ্ধোপকরণাদি নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিতে পারে, সেই সকল স্থান যে প্রদেশের অন্তর্গত, তাহাকে সামরিক রঙ্গভূমির নেপথ্য নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। ইংরাজিতে এই প্রদেশকে বেস্ অব্ অপারেশন (Base of Operation) বলে। সমরাঙ্গণের নেপথ্য প্রদেশ প্রায় সকল সময়ে নিরাপদ থাকে বলিলে কোন দোষ হয় না। কারণ, ঐ প্রদেশে বা উহার কোন অংশে শত্রুগণ বিঘ্ন উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলেই উহা বা ঐ অংশ সমরাঙ্গণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এবং রণভূমির নেপথ্য হয় পশ্চাদ্ভাগে সরিয়া যায়, না হয় অন্য দিকে নীত হয়।

নেপথ্য প্রদেশ হইতে, সামরিক রঙ্গভূমির যে স্থানে স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ সমবেত থাকে, সেই স্থান পর্য্যন্ত, অন্ন সামগ্রী ও সৈন্য সাহায্যাদি-প্রেরণার্থ কতকগুলি সুরক্ষিত মার্গ থাকে। সেগুলিকে ইংরাজিতে লাইন্স অব্ কমিউনিকেশন (Lines of communication) বলে। আত্ম-পক্ষের সুবিধাজনক সমরাঙ্গণ, উহার নেপথ্য প্রদেশ, এবং সৈনাসম্ভারাদি গমনাগমনের প্রকৃষ্ট মার্গ প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা-পূর্ব্বক নির্ব্বাচন করাও ক্ষেত্রনীতির অঙ্গীভূত। এই সকল কার্য্য যে কেবল যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই অনুষ্ঠেয় তাহা নহে, যুদ্ধকালের শেষ পর্য্যন্ত সেনাপতিকে এ সকল বিষয়ে সমান ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

বিজ্ঞ রাজনীতিকগণ পররাষ্ট্রের অবলম্বিত ক্ষেত্র-নীতির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। স্বরাষ্ট্রের হিত-সাধন-প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রসমূহের কাহার সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর, কোন্ কোন্ শত্রু-রাষ্ট্র আত্মপক্ষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রধান পরিপন্থী, কোন্ কোন্ রাষ্ট্র হইতে অরাতিগণ সহায়তা প্রাপ্ত হইতে পারে, শত্রু-পক্ষে যুদ্ধ-সজ্জার কিরূপ আয়োজন হইতেছে বা হইতে পারে, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধদান করিতে গেলে কোন্ প্রদেশ সমরাঙ্গণে পরিণত হইবে, সমরাঙ্গণের শত্রুপক্ষীয়

নেপথ্য ভূমি কতদূর সুব্যবস্থিত, প্রভৃতি ব্যাপারের সংবাদ-সংগ্রহ-কার্য্যে শান্তির সময়েও তাঁহাদিগের যত্ন দেখা যায়। এই সকল কার্য্য রাজদূত ও গুপ্তচরগণের (Deplomatic agency) সাহায্যে সম্পাদিত হইতে থাকে। তথাপি যুদ্ধারম্ভ হইবার পর কখন কখনও শত্রুপক্ষের আয়োজনাদি সম্বন্ধে স্বকীয় দূতগণের সংগৃহীত সংবাদ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কখন কখনও বা সমর-ক্রিয়ার গতি ও জয়-পরাজয়ের স্রোত সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় সামরিক রঙ্গ-ভূমি প্রায়শঃ পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ হইতে স্থানান্তরিত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কাজেই এক বা উভয় পক্ষকে অভিনব নেপথ্য-ভূমির রচনা দ্বারা যুধ্যমান সেনাদলকে অন্ন-সাহায্যাদি প্রেরণ করিবার জন্য সময়োপযোগিনী ব্যবস্থা করিতে হয়। এই কার্য্য যুযুৎসুগণের চাতুর্য্য ও দক্ষতা-সাপেক্ষ হইলেও ক্ষেত্রনীতিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ আয়াস-সাধ্য নহে।

নেপথ্য-প্রদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উভয় পক্ষীয় যোধগণ যখন সমরাঙ্গণে প্রবেশ করিতে থাকেন, তখন অনুকূল স্থানে উপস্থিত হইয়া সমরারম্ভ করিবার ও স্বপক্ষীয় সৈন্যদলের গতি-ক্রম অপর পক্ষের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য যুযুৎসুগণ প্রথমেই একদল সৈন্যকে প্রধান সেনাদলের অগ্রভাগে প্রেরণ করেন। সংস্কৃত ভাষায় ইহাদিগকে "নাসীরচর" ও ইংরাজিতে Advance guards বলে। অগ্রগামী সেনাদল পুরোদেশে যবনিকার (Screen) ন্যায় অবস্থিত হইলে মুখ্য সেনা কুচ করিতে আরম্ভ করে। আত্ম-পক্ষীয় বাহিনীর গতিক্রম গোপন ভিন্ন পুরোগামী সৈন্যদিগকে আরও কয়েকটি কার্য্য করিতে হয়। তন্মধ্যে দূরে লুক্কায়িত অরাতিদলের অনুসন্ধান, শত্রুগণের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য, কদাচিৎ স্বপক্ষীয় যোধগণ অসাবধান থাকিলেও শত্রুপক্ষ যেন তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার যথোচিত ব্যবস্থাবিধান প্রভৃতিই প্রধান। এই কার্য্য-সাধনে সহায়তা করিবার জন্য নাসীরচরদিগের সঙ্গে একদল সামরিক গূঢ়-চরও (scouts) থাকে।

সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ যুযুৎসুগণ অগ্রসর হইতে হইতে যখন পরস্পরের এরূপ নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়েন যে, আর দুই একদিনের অভিযানেই (Marching) এক পক্ষ অপর পক্ষের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করিতে পারেন (Within striking distance of each others), তখন

সৈনিকদিগের লঘুবেশ, লঘু অস্ত্র, ও ক্ষিপ্রকারিতাই (mobility of the army) জয়-লাভের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। যে সৈন্যদলের মধ্যে এই গুণের অভাব বা অল্পতা থাকে, তাহারা সহজে সমরাঙ্গণের নিকটবর্ত্তী সুদৃঢ় স্থান সমূহ অগ্রে হস্তগত করিতে, শত্রুর হস্ত হইতে সে গুলির উদ্ধারসাধন করিতে, অথবা সে স্থানে শত্রুর সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করিবার ইচ্ছা না থাকিলে যুদ্ধদানের ভাণ করিয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িতে সমর্থ হয় না।

ফলকথা, উভয় পক্ষের শস্ত্রাস্ত্র যদি সাধারণ ভাবে সমান থাকে, যুদ্ধারম্ভ ও সমরক্রিয়ার সময়ে ব্যূহরচনা-কার্য্যে যদি উভয় পক্ষের সেনানায়কেরা সমান পটুতা প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে যে পক্ষ সামরিক ক্ষেত্রনীতির বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ ও সেই ক্ষেত্রনীতির অনুমোদিত উপায়াবলীর অনুসরণে যে পক্ষের সেনাদল সমধিক দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ, সেই পক্ষের জয়লাভ সুনিশ্চিত। বলা বাহুল্য, উভয় পক্ষীয় যোধগণের অস্ত্রশস্ত্রাদি যে প্রকারেরই হউক না কেন, সমর-বিদ্যার এই অংশের অর্থাৎ ক্ষেত্রনীতির সহিত তাহার কোনও সংস্রব নাই। যে কালে মনুষ্য-সমাজ বাহু-যুদ্ধ ও মুষ্টি-যুদ্ধকেই অভীষ্টসাধনের প্রধান উপায় বলিয়া জানিত, যে কালে পরস্পরের প্রতি লোষ্ট্রাদি-নিক্ষেপ যুদ্ধের প্রধান অঙ্গস্বরূপ ছিল; লগুড়, মুদ্গর বা গদা ভিন্ন অন্য যুদ্ধাস্ত্র যখন জনসমাজে পরিজ্ঞাত ছিল না, তখনও পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষেত্রনীতি ও তদন্তর্গত তত্ত্বসমূহের যেরূপ সমাদর ছিল, অসি-খড়্গপ্রাসাদির প্রাদুর্ভাবকালে, এমন কি বর্ত্তমান বিজ্ঞান-কৌশলে নির্ম্মিত বন্দুক, কামান প্রভৃতি বহু-লোক-ক্ষয়-কর আগ্নেয়াস্ত্রাদির বহুল প্রচার কালেও উহাদের সেইরূপ সমাদরই দেখিতে পাওয়া যায়।

বাজী রাওয়ের ক্ষেত্র-নীতি।

সামরিক ক্ষেত্রনীতি-বিষয়ক যে সকল তত্ত্ব ইতঃপূর্ব্বে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, একটী উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইলে তাহা বিশিষ্টরূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যে সকল বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই সমরবিদ্যায় দ্বিতীয় পেশওয়ে বাজী রাওয়ের সমকক্ষ ছিলেন না। ভারতবর্ষ

দূরে থাকুক, বিজ্ঞান-দীপ্ত ইউরোপের ইতিহাসেও এক নেপোলিয়ন ভিন্ন আর কাহারও প্রতি রণ-চণ্ডী এরূপ প্রীত ছিলেন কি না, সন্দেহ। এই কারণে সামরিক ক্ষেত্রনীতি-জ্ঞানের উদাহরণ-স্থলে আমরা বাজী রাওয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। এই সমর-ধুরন্ধর মহাবীর ভূপালের যুদ্ধে যে ক্ষেত্রনীতির অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলেই পাঠক সমর-বিদ্যার এই অংশের সম্যক্ পরিচয় পাইবেন।

পাঠকের অবিদিত নহে যে, বাজী রাওয়ের বিক্রম-দর্শনে ভীত হইয়া দিল্লীর দরবার ১৭৩২।৩৩ খৃষ্টাব্দে মালব প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে নিজাম-উল্-মুল্কের পরামর্শ ক্রমে দিল্লীর মোগল কর্তৃপক্ষ সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হন। দরবারের মন্ত্রণায় স্থিরীকৃত হয় যে, অতঃপর বাজী রাও যাহাতে মালবে পদার্পণ করিতে না পারেন এবং দক্ষিণাপথেও যাহাতে তাঁহার প্রতিপত্তির লাঘব হয়, তাহা করিতে হইবে। এই কার্য্যের ভার দক্ষিণাপথের সুভেদার নিজাম-উল্-মুল্ক ও বাদশাহের উজির খান দৌরার প্রতি অর্পিত হয়। তাঁহাদিগের সহায়তা করিবার জন্য রাজপুতনার সামন্ত নরপতিগণ ও রোহিলা সর্দ্দারগণ আহূত হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগকে মালব হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য এই সময়ে মোগল, রাজপুত ও রোহিলাগণ সমবেত হইয়া যেরূপ ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমে সমুদ্র-কূলে ফিরিঙ্গীদিগের (পোর্ত্তুগীজদিগের) দমন উপলক্ষে মহারাষ্ট্র সেনানীগণ যেরূপ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তাহাতে বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র বাজী রাও ভিন্ন অপর কেহ মহারাষ্ট্র সমাজের নেতা থাকিলে ষড়্‌যন্ত্রকারীদিগের উদ্যম নিঃসংশয় সফল হইত। কিন্তু পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের সময় হইতে পররাষ্ট্রের অন্তর্গূঢ় কার্য্য-কলাপ, গতিবিধি ও উদ্দেশ্য-মন্ত্রণাদির প্রতি সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি রাখিয়া স্বরাষ্ট্রের রাজকার্য্য-সমূহ পরিচালিত করিবার পদ্ধতি মহারাষ্ট্রে প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ও নানা ফড়নবীসের সময় পর্য্যন্ত তাহা অল্পাধিক পরিমাণে অব্যাহত থাকায় মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য বহুবিধ বিঘ্ন-বিপত্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ বাজী রাওয়ের নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক গুপ্তচরেরা নিবিড় তন্তুজালবৎ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই কারণে দিল্লী-দরবারের মন্ত্রণা বাজী রাওয়ের কর্ণ-

গোচর হইতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব ঘটে নাই। চর-বিভাগের এরূপ সুব্যবস্থা ও পরিপুষ্টির পরিচয় বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে কোনও প্রদেশের হিন্দু-শাসনের ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পাঠানদিগের হস্তে ভারত-বাসীর স্বাতন্ত্র্য-নাশের ইহা একটী অতি প্রধান কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বাজী রাওকে মালব প্রদেশে পদার্পণ করিতে না দেওয়াই যে নিজামের এই অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তাহা নহে। পরন্তু বিন্ধ্য ও সাতপুড়া গিরিশ্রেণী লঙ্ঘন-পূর্ব্বক উত্তর মহারাষ্ট্রে দিল্লীর সৈন্যসহ স্বয়ং শিবির সংস্থাপন করিয়া হায়দরাবাদ হইতে স্বীয় পুত্রের দ্বারা মহারাষ্ট্রে অভিযান করাইয়া পুণার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ ও মধ্য মহারাষ্ট্র প্রদেশে, নিতান্ত পক্ষে উত্তর মহারাষ্ট্রে, সমরাঙ্গণ (Theatre of war) নির্দ্ধারিত করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু স্বদেশে সমরাঙ্গণ নির্দ্ধারিত করিতে দিলে, প্রজাকুলের ধন-সম্পত্তি উভয় পক্ষীয় সেনাদলের দৌরাত্ম্যে বিনষ্ট হয়, অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ বিদ্রোহী হইবার অবকাশ পায় ও স্বপক্ষের সামান্য পরাভব ঘটিলেও দেশে ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত হইয়া সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা ঘটে। এই কারণে সমরাচার্য্যগণ স্বদেশকে যথাসম্ভব সুরক্ষিত রাখিয়া পররাষ্ট্রে প্রবেশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ-দান করাই নীতি-সঙ্গত কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নিজাম-উল-মুল্কও সেই নীতির অনুসরণ করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যানুসারে যদি বাদসাহী সৈন উত্তর ভারতস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মারাঠা সর্দ্দারদিগকে পরাভূত করিয়া বিন্ধ্য প্রদেশের পথ ঘাট, নর্ম্মদা নদীর খেয়াঘাট ও সাতপুড়ার গিরিমার্গাদি অধিকার-পূর্ব্বক উত্তর মহারাষ্ট্রে শিবির সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে স্বদেশের মধ্যে শত্রুসেনাকে যুদ্ধদান ভিন্ন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অন্য উপায় থাকিত না। এইরূপ ঘটিলে সাতপুড়ার শৈলময় প্রদেশ মুসলমানদিগের সমরভূমির নেপথ্য ও পুণা প্রদেশ মহা-রাষ্ট্রীয় পক্ষের (Base of Operation) নেপথ্য ভূমিতে পরিণত হইত। এবং মধ্য-মহারাষ্ট্র বা নিতান্ত পক্ষে উত্তর মহারাষ্ট্র সামরিক রঙ্গভূমিরূপে পরিগণিত হইত। সাতপুড়ার ন্যায় দুর্গম প্রদেশ ও তদন্তর্গত গিরি-মার্গাদি মুসলমানদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে যে উত্তর ভারতেরই নির্ব্বিঘ্নতা সম্পাদিত হইত তাহা নহে, মুসলমানদিগের সমর-রঙ্গের

নেপথ্য-ভূমিও অতীব দৃঢ় হইতে পারিত, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, যে সময়ে এই যুদ্ধের মন্ত্রণা স্থিরীকৃত হয়, সেই সময়ে নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী প্রদেশ, সাতপুড়ার পাদদেশ ও উহার গিরি-সঙ্কটগুলি সামরিক ক্ষেত্র-নীতি অনুসারে উভয় পক্ষের প্রধান লক্ষ্য স্থল (Stratagical points) হইয়া উঠিয়াছিল। তাই উভয় পক্ষীয় সেনাদলই এই স্থানগুলি হস্তগত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রীয় সেনা এই সময়ে কোঙ্কণে পোর্ত্তুগীজদিগের সহিত সমরে ব্যস্ত ছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাজী রাও স্বল্প-সংখ্যক সৈন্যসহ উত্তর ভারত অভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং বিদ্যুদ্‌বেগে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইয়া সাতপুড়ার গিরিসঙ্কটগুলি অধিকার করিলেন। কেবল তাহাই নহে, সৈনিকগণের শ্রান্তি-সত্ত্বেও তাহাদিগকে লইয়া তিনি নিজাম-উল্‌-মুল্কের পূর্ব্বে মালব প্রদেশে পদার্পণ করিলেন। ফলে, উত্তর মহারাষ্ট্র প্রদেশে যে সমরাঙ্গণ রচিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইল, এবং সাতপুড়া প্রদেশ নিজামের পরিবর্ত্তে বাজী রাওয়েরই সামরিক নেপথ্যে (Base of Operations) পরিণত হইল। এইরূপে বাজী রাওয়ের ক্ষেত্রনীতি-কৌশলে নিজাম-উল-মুল্কের সংকল্পিত সমরাঙ্গন উত্তর মহারাষ্ট্র হইতে মালবে ও তাহার নেপথ্য-ভূমি বিন্ধ্য-প্রদেশ হইতে মালবের উত্তরাঞ্চলে অপসারিত হইয়া যায়। মহারাষ্ট্র সেনাপতি এরূপ ক্ষেত্রনীতি-কুশল না হইলে মারাঠাদিগকে এই সময়ে ঘোর বিপন্ন হইতে হইত।

এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মারাঠাদিগের ন্যায় লঘুভাবে সজ্জিত ও ক্ষিপ্রগামী (Mobile) সেনাদল না পাইলে বাজী রাওয়ের ন্যায় সেনাপতির পক্ষেও এই কার্য্য সম্ভবপর হইত কি না সন্দেহ। মারাঠা সৈন্যদলের সহিত যদি মোগলদিগের ন্যায় বড় বড় তোপ, প্রকাণ্ড তাঁবু, বা প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য সামগ্রী থাকিত, এবং পদাতিগণও যদি অশ্বারূঢ় (Mounted infantry) না হইত, তাহা হইলে বাজী রাও পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সাধন করিতে পারিতেন না। তাঁহার সহিত একদিকে যেমন ৬০।৭০ হাজার দৃঢ়কায় ও কষ্টসহিষ্ণু পদাতিক ছিল, অন্যদিকে তেমনই অল্প-ভোজী সর্ব্বঋতুতে সমান শ্রমপরায়ণ ৬০।৭০ হাজার দক্ষিণী টাট্টু ঘোড়াও ছিল। এই কারণে তাঁহার সৈন্যদলের ক্ষিপ্রতা বা স্বল্প সময়ের

মধ্যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার শক্তি, মোসলমান-সেনা অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক ছিল।

মহারাষ্ট্রীয়দিগকে যুদ্ধে বিপন্ন করিয়া মালব কাড়িয়া লইবার ষড়্‌যন্ত্র প্রথমে দিল্লীতে হইয়াছিল। দিল্লী হইতে মালব অধিক দূর নহে। এই কারণে পুণা হইতে বা বসই (বেসীন) হইতে বাজী রাওয়ের সসৈন্য মালবে প্রবেশ অপেক্ষা দিল্লী হইতে মোগল ফৌজ লইয়া নিজামের পক্ষে মালব অধিকার করা বহুপরিমাণে সহজসাধ্য ছিল। তদ্ব্যতীত যে সাতপুড়া প্রদেশ সে সময়ে উভয় পক্ষের লক্ষ্যস্থানীয় (Stratagical points) হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে ঔরঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থানে নিজামের কয়েকটী সেনানিবাস ছিল। সেই সকল শিবিরে ১০।১২ হাজার সুসজ্জিত সৈন্যও সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল। এ সকল সুবিধা মহারাষ্ট্রীয়দিগের আদৌ ছিল না। তথাপি তাঁহারা মোগলদিগের অগ্রে মালবে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা মহারাষ্ট্র-সৈন্যের সামান্য ক্ষিপ্রকারিতা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরিচায়ক নহে। দিল্লী দরবারে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যে ষড়্‌যন্ত্র হইতেছিল, তৎসংক্রান্ত পরামর্শাদি যদি মোগলেরা অধিকতর গুপ্তভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেন, বাজী রাও যদি পররাষ্ট্রের গূঢ়-সংবাদ-সংগ্রহে ঈদৃশ দক্ষতা প্রকাশ করিতে না পারিতেন ও মারাঠা সেনার ক্ষিপ্রকারিতা যদি মোগলসেনার অপেক্ষা অধিক না হইত, তাহা হইলে নিজাম-উল-মুল্কের ন্যায় বহুদর্শী সেনানীর হস্তে বাজী রাওকে নিশ্চিত বিপন্ন হইতে হইত। বড় বড় তোপখানা ও অপরবিধ বহুসংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র সহ যদি সুচতুর নিজাম-উল-মুল্ক বাদসাহী সেনা ও স্বীয় চতুরঙ্গিনী বাহিনী লইয়া নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে মহাত্মা শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত ও পরবর্ত্তী বীরগণের চেষ্টায় পরিবর্দ্ধিত মহারাষ্ট্র রাজ্যের ইতিহাস ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাজী রাওয়ের ন্যায় অলৌকিক প্রতিভা-সম্পন্ন সেনানী লাভ করায় মহারাষ্ট্রীয়গণ এই ভীষণ বিপদ হইতে অনায়াসে উদ্ধার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কেবল সমরাঙ্গণ নির্ব্বাচনে সেনাপতির দক্ষতা ও সেনাদলের ক্ষিপ্রকারিতা (Mobility) থাকিলেই যে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়, তাহা নহে। গৃহবিবাদাদির নিবৃত্তিবিধান ও আত্মপক্ষীয় সমস্ত বলের একতা-সাধনও যুদ্ধে জয়লাভের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। বাজী রাওকে এই ভূপালের

যুদ্ধেই সে বিষয়েও বিশেষ অবহিত দেখিতে পাই। এই যুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে নাগপুরের ভোঁসলে ও গুজরাথের সেনাপতি দাভাড়ে প্রভৃতির সহিত বাজী রাওয়ের মনোবিবাদ চলিতেছিল। ভোঁসলে ও দাভাড়ে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের অন্যতম আশ্রয়-স্তম্ভস্বরূপ হইলেও সাম্রাজ্য-সংক্রান্ত পবিত্র কর্ত্তব্য-পালনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না, অথবা তখনও সে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগের জ্ঞান তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই। তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষাও বাজী রাওয়ের ন্যায় মহীয়সী ছিল না। স্বদেশীয় সাম্রাজ্যের উন্নতি-সাধনের জন্য কিরূপে স্ব স্ব ব্যক্তিগত স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহা তাঁহাদিগের নিকট সম্যক্ অপরিজ্ঞাত থাকায় তাঁহারা গৃহবিবাদে বিশেষ বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছিলেন। এই কলহ-নিপুণ সর্দ্দারদ্বয়ের সহিত সখ্য-স্থাপন করিয়া আত্ম-পক্ষীয় সমস্ত বলের একতা-সাধন করিতে বাজী রাও বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই কলহপ্রিয় সর্দ্দারদ্বয়কে বশীভূত করিতে না পারিলে মহারাষ্ট্র-পক্ষের পরাজয়ের সম্ভাবনা অধিকতর বৃদ্ধি পাইত। কারণ, তদবস্থায় মোগলসেনা যদি কোনও প্রকারে নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইতে পারিত, তাহা হইলে শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্বর্ত্তী পথঘাটসমূহে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া নেপথ্য ভূমির সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধচ্ছেদ (To cut off the line of communication) পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিপন্ন করা মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। কাজেই দূরদর্শী বাজী রাও এক দিকে যেমন নিজামের অগ্রে মালবে পদার্পণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, অন্য দিকে তেমনই কদাচিৎ উত্তর মহারাষ্ট্রে সমরভূমির নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে যাহাতে শত্রুপক্ষকে বিপন্ন করা যাইতে পারে, তাহার জন্য তিনি অন্যতম সেনাপতি দাভাড়ে ও ভোঁসলে সর্দ্দারের সহিত পূর্ব্বাহ্ণে মিত্রতা-স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ভোঁসলে ও দাভাড়ে স্বার্থবুদ্ধির বশবর্ত্তী না হইলে তাঁহাদিগের মধ্যভারত-স্থিত সেনাদলের সাহায্যে অনায়াসে উত্তর মহারাষ্ট্রে সমাগত মোগলদিগের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিতে পারা যাইত। কিন্তু বাজী রাও সমগ্র হিন্দু জাতির হিতাকাঙ্ক্ষায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে যে সমরসত্রের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত সেনানীদ্বয় তাহাতে সাহায্য করা দূরে থাকুক, গোপনভাবে বাধাদানেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কারণে ক্ষেত্র-

নীতিজ্ঞ বাজী রাও স্বয়ং উচ্চপদস্থ হইয়াও দেশের মঙ্গলের জন্য অতি বিনীত ভাবে পত্রাদি লিখিয়া সেই দুঃসময়ে ভোঁসলে ও দাভাড়ের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিলেন। . এইরূপে স্বপক্ষীয় সমস্ত বলের একতা-সাধন করিয়াই বাজী রাও নিশ্চিন্ত হন নাই। অওরঙ্গাবাদস্থিত মোসলমান সৈন্য যাহাতে বল-প্রকাশ করিবার অবকাশ না পায়, হায়দরাবাদ হইতে নূতন সৈন্যদল আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিতে না পারে, তিনি তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিজামের সৈন্য উত্তর মহারাষ্ট্রে অবতীর্ণ হইলে ভোঁসলে ও দাভাড়ের সৈন্যের সাহায্যে তাহাদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী পথঘাটসমূহ আক্রমণ করিয়া নেপথ্য-ভূমির সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধচ্ছেদ করা যেরূপ সহজসাধ্য ছিল, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য মালবে পদার্পণ করিলে, অওরঙ্গাবাদস্থিত মোসলমান সৈন্যের পক্ষেও সেইরূপ ভাবে স্বদেশের সহিত মালব-স্থিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করা সহজসাধ্য হইত। অওরঙ্গাবাদ-স্থিত মোসলমানেরা যাহাতে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটাইতে না পারেন, উত্তরে মোগল সেনার সহিত সম্মুখ যুদ্ধকালে হায়দরাবাদ ও অওরঙ্গাবাদের শত্রু-সেনা স্বপক্ষের নেপথ্য ভূমিতে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধসম্ভারাদি প্রেরণের মার্গনিচয়ে (Lines of communication) যাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত করিতে বা তাহার পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিতে না পারে, সে জন্য বাজী রাও স্বীয় ভ্রাতা চিম্‌ণাজীকে পুণা হইতে এক দল সৈন্য সহ অওরঙ্গাবাদ অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বাজী রাওয়ের এই সময়ের লিখিত পত্রাদি পাঠে বোধ হয়, তিনি দাভাড়ে অপেক্ষা নাগপুরের ভোঁসলের মৈত্রী-সম্পাদনে সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। ইহার কারণও অনুমান করা কঠিন নহে। ভোঁসলের বিনা সাহায্যে তিনি একাকী মোগল সেনাকে সমর-ক্রীড়ায় বিপন্ন করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তথাপি তিনি ভাবী ঘটনার উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া আত্ম-রক্ষার যথাসম্ভব সমস্ত উপায়ের অবলম্বনে ঔদাস্য প্রকাশ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। ভোসলেকে বিশেষ ভাবে হস্তগত করায় তাঁহার দূরদর্শিতা ও সতর্কতা বিশেষরূপেই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিমণাজীকে অওরঙ্গাবাদ অভিমুখে প্রেরণ-সত্ত্বেও যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, হায়দরাবাদের সৈন্য যদি কোন প্রকারে মহারাষ্ট্রে প্রবেশ-লাভ করিয়া

বাজী রাওয়ের সাময়িক নেপথ্য-ভূমির মার্গাদি অধিকার করিয়া ফেলে, এবং সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক্ হইতে শত্রু-সেনার দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়, তাহা হইলে আত্ম-পক্ষের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে, ইহা বাজী রাওয়ের মত বুদ্ধিমান্ সেনানীর অগোচর ছিল না। দৈবাৎ এবম্প্রকার বিপৎপাত হইলে নাগপুর অঞ্চলকে সামরিক নেপথ্য-ভূমিতে পরিণত করিয়া ও স্বয়ং পশ্চিম-মুখীন হইয়া যুদ্ধ-দানই বাজী রাওয়ের পক্ষে আত্ম-রক্ষার শেষ উপায়-স্বরূপ ছিল। এই শেষ উপায় অবলম্বনের পথ পূর্ব্বাহ্নে পরিষ্কৃত করিয়া রাখিবার জন্য তিনি ভোঁসলেকে আত্মীয়তা-সূত্রে বদ্ধ করিতে ঈদৃশ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন।

এই রূপে বাজী রাওয়ের অভিযানাদির বিষয় যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই সামরিক ক্ষেত্র-নীতির তত্ত্বসমূহ আমাদিগের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে, এবং ক্ষেত্র-নীতি-জ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ পার-দর্শিতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই বিষয়ে ভারতবর্ষে সে কালে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ভূপালের যুদ্ধেই কি, আর আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধেই কি, সর্ব্বত্র তাঁহার দূরদর্শিতা ও ক্ষেত্র-নীতি-জ্ঞানের চরম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লী আক্রমণের পূর্ব্বে সহসা আগ্রা আক্রমণ-পুরঃসর মোসলমান-দিগকে ভীত ও চকিত করিয়া তিনি যেরূপ বিদ্যুদ্বেগে দিল্লীর সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তথায় যুদ্ধদান-কালে অকস্মাৎ যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত সমর-ভূমির (Theatre of war) পরিবর্ত্তন করেন, জয়পুরের পথে প্রত্যা-বর্ত্তন-কালে যেরূপে সহসা শত্রুপক্ষের অতর্কিতভাবে সামরিক নেপথ্য-ভূমির সৃষ্টি ও তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয়, তাঁহার সেনা-দলের ক্ষিপ্রতা, স্বপক্ষের অনুকূল যুদ্ধ-ভূমির নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক সেই স্থানেই যুদ্ধদান করিতে শত্রুপক্ষকে বাধ্য করা, প্রয়োজন মত ঘন ঘন যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবর্ত্তনে দক্ষতা ও অবলীলাক্রমে যে কোনও স্থানে সাময়িক নেপথ্য-ভূমির রচনা দ্বারা শত্রুপক্ষকে বিড়ম্বিত করা প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতীয় হিন্দু মোসলমানের কথা দূরে থাকুক, পাশ্চাত্য জাতির মধ্যেও এক নেপোলিয়ান ভিন্ন আর প্রায় কেহই তাঁহার সমকক্ষতা করিতে পারেন নাই।

আলিবর্দ্দীর ক্ষেত্র-নীতি।

বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত-কালে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সামরিক ক্ষেত্রনীতি বিষয়ে যেরূপ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, আমরা সংক্ষেপে তাহারও নির্দ্দেশ করিতেছি। বর্গীর হাঙ্গামায় এদেশবাসী বহুপরিমাণে জ্বালাতন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে জন্য সমরনীতি-বিশারদের চক্ষে আলিবর্দ্দীর কতটুকু দোষ ছিল, তাহাই এক্ষেত্রে আমরা দেখাইব।

আলিবর্দ্দী খাঁ স্বয়ং এক জন বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সৈন্যদলও যুদ্ধবিদ্যায় সামান্য শিক্ষিত ছিল না। তবে কেন বঙ্গে বর্গী অত্যাচার করিবার অবসর পাইল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়, আলিবর্দ্দীর ক্ষেত্রনীতি-জ্ঞানের সম্যক্ অভাবেই তদানীন্তন বাঙ্গালীর এত দুর্গতি ঘটিয়াছিল। বঙ্গীয় ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নহে যে, নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাদিগের প্রাপ্য চৌথ আদায় করিবার জন্য আগমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এই সংবাদ আলিবর্দ্দী খাঁ পূর্ব্বাহ্লেই আপনার চরদিগের মুখে অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের আক্রমণ নিবারণের কোনও চেষ্টা তিনি করেন নাই। বাজী রাওয়ের ন্যায় স্বরাজ্যের সীমান্ত-রক্ষা ও আত্ম-পক্ষের সুবিধা-জনক স্থানে যুদ্ধভূমি-নির্দ্ধারণ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে সামরিক নেপথ্য-ভূমিতে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার তৎপরতা প্রকাশ পায় নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমনের সংবাদ যথাসময়ে পাইয়াও তিনি অগ্রে ময়ূরভঞ্জ ও উড়িষ্যার বিদ্রোহ-দমনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি স্বদেশের বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা করিয়া আত্মপক্ষীয় সমস্ত বলের একতা-সাধনের চেষ্টা করিলে এবং বিপক্ষের গতিবিধির প্রতি সুদক্ষ গুপ্তচরের সাহায্যে শ্যেনবৎ তীব্র দৃষ্টি রাখিতে পারিলে কখনই বর্গীগণ বঙ্গ-ভূমিতে প্রবেশ-লাভ করিতে পারিত না।

কেবল তাহাই নহে, ইহার পর উড়িষ্যার বিদ্রোহ-দমন-পূর্ব্বক পঞ্চ-সহস্র মাত্র পরিশ্রান্ত সৈন্যদল সহ প্রত্যাবর্ত্তন-কালে যখন তিনি শুনিলেন যে, পঞ্চকোটের পার্ব্বত্য-পথ দিয়া চল্লিশ সহস্র রণ-নিপুণ অশ্বারোহী সৈন্যসহ রঘুজী ভোঁসলে "চৌথ" আদায়ের জন্য বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, তখনও তিনি যদি তাঁহাদিগের সহিত

সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইতেন, তাহা হইলেও দেশ রক্ষা পাইত। কিন্তু বর্দ্ধমানের যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্রপক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হইলেও নবাব তাহাতে সম্মত হওয়া অপমানজনক বিবেচনা করিলেন। সামরিক ক্ষেত্রনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এ সময়ে কার্য্য করিতে পারিলে আলি-বর্দীকে কখনই বিপন্ন হইতে হইত না। এই বিপৎকালে বর্গীদলে বেষ্টিত হইয়া নবাব যেরূপভাবে ঘোর কষ্ট-স্বীকার ও অধ্যবসায়-পূর্ব্বক কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই।

বলিয়াছি, স্বদেশের মধ্যে যুদ্ধ-ভূমি নির্দ্ধারিত হইলে স্বপক্ষ-বিপক্ষীয় সেনাদলের ধাবনাক্রমণ-পলায়নে দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়, দেশের অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ শত্রুপক্ষে যোগ দান করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা-কালেও এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজ্যের বহির্ভাগে যুদ্ধ-ক্ষেত্র নির্দ্ধারিত না হওয়ায় মীর হবিব প্রভৃতি অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ বর্গী-দিগের সহিত যোগদান করিয়া বঙ্গের অধিকতর অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সকল স্বদেশ-দ্রোহীর পরামর্শেই বর্গীগণ বর্দ্ধমান-হুগলী প্রভৃতি স্থানে অত্যাচার করিয়াছিল। ফলে পশ্চিম বঙ্গে সর্ব্বত্র গ্রাম নগরাদি উৎসাদিত হইল। রাজ্য মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

পরবর্ত্তী বর্ষেও মহারাষ্ট্র-বাহিনী অক্লেশে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এবারও বাঙ্গালার নবাব সীমান্ত-রক্ষার বা সীমান্ত প্রদেশে বিপক্ষকে বাধা দিবার কোনও চেষ্টা করেন নাই। কাজেই বঙ্গ-ভূমি পুনর্ব্বার সমর-রঙ্গের অভিনয়-ক্ষেত্রে পরিণত হইল, বাঙ্গালীর দুরবস্থার একশেষ হইল। ইহার পরবর্ষে ভোঁসলের সেনানী ভাস্কর পণ্ডিত আবার চৌথ আদায়ের জন্য বঙ্গে আগমন করিলেন। এবার নবাবের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল। বল-প্রয়োগে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রতিহত করিবার আশা তাঁহার ছিল না। এই কারণে তিনি বিশ্বাস-ঘাতকতার আশ্রয়ে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতকে নবাবের শিবিরে আনয়ন করা হইল। তথায় সানুচর মহা-রাষ্ট্র সেনানী নবাবের ইঙ্গিতে গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন! তখন রঘুজী ভোঁসলে সেনানীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে অধিকতর সেনাবল সহ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। আলিবর্দী রাজধানী রক্ষার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ স্থল উত্তেজিত

মহারাষ্ট্র সৈন্যের অত্যাচারে উৎসন্ন-প্রায় হইল। বঙ্গেশ্বর সন্ধির প্রস্তাব করিয়াও তাহাদিগকে সহজে শান্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু পরিশেষে বাঙ্গালী সৈন্যের বীর্য্য-বলে আলিবর্দ্দী খাঁ কাটোওয়ার নিকট রঘুজীকে পরাস্ত করিলেন।

ইহার পর মহারাষ্ট্রীয়েরা উড়িষ্যা অধিকার করেন। আলিবর্দ্দী তথা হইতে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হওয়ায় উড়িষ্যার স্বত্বত্যাগ-পূর্ব্বক বঙ্গীয় রাজস্বের চতুর্থাংশ ১২ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ এই যুদ্ধ ব্যাপারের সূত্রপাতকালে বাঙ্গালার নবাব যদি সামরিক ক্ষেত্রনীতির অনুমোদিত নিয়ম সমূহের সম্যক্ পরিপালনে যত্ন প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গবাসীর নিগ্রহ বহুপরিমাণে হ্রাস পাইত, সন্দেহ নাই।

সামরিক ক্ষেত্র-নীতির পালনে যত্ন-প্রকাশ করিয়া বহুল প্রতিকূল ঘটনার সমাবেশ-সত্ত্বেও বাজী রাও ভূপালের যুদ্ধে জয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ নীতির সম্যক্ অনুসরণে অসমর্থ হওয়ায় আলিবর্দ্দী খাঁ বহুপরিমাণে স্বীয় প্রজাকুলের নাশের কারণ-স্বরূপ হইয়াছিলেন। এই কারণে প্রবন্ধ-বিস্তৃতির আশঙ্কা-সত্ত্বেও উভয় ঘটনার চিত্র পাশাপাশি-ভাবে পাঠকবর্গের সমক্ষে ধারণ করিলাম। ইহা হইতেই পাঠক, সমর-ব্যাপারে ক্ষেত্র-নীতি জ্ঞানের উপযোগিতা কত অধিক, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

সমর-ক্রিয়ার কৌশল

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি প্রস্তাবে যুদ্ধবিদ্যার প্রথমাংশ বা ক্ষেত্রনীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকবর্গকে প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে উহার অপরাংশ বা সমর-ক্রিয়া-কৌশল (Tactics) সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিবার চেষ্টা করিব। এই দুই অংশের স্থূল জ্ঞান লাভ না হইলে অব্যবহিত সমরের তত্ত্ব পাঠকদিগের সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সুতরাং অগ্রে তদ্বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

সমর-ক্ষেত্রে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ সমবেত হইলে সাধারণতঃ দুই প্রকারে প্রকৃত যুদ্ধারম্ভ ঘটিয়া থাকে। ১ম, উভয় পক্ষীয় সৈন্য অগ্রসর হইতে হইতে পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলে এক পক্ষ উপযুক্ত আশ্রয়-স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করেন। তখন অপর পক্ষকেও কিঞ্চিৎ দূরে শিবির-স্থাপন করিতে হয়। তৎপরে সুবিধা বুঝিয়া উভয় পক্ষই অল্পে অল্পে সমর-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। ফলতঃ অধিকাংশ স্থলে উভয় পক্ষের শিবির স্বভাবতঃ এরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট হয় যে, বিনা যুদ্ধে উহাদের অপসারণ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ, পরস্পরের সম্মুখীন ও নিকটবর্ত্তী হইবার পর বিনা যুদ্ধে পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে, শত্রু-সেনা অতি সহজে সমর-ক্ষেত্রের সহিত বিপক্ষের সামরিক নেপথ্য-ভূমির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে; এমন কি, এরূপ অবস্থায় কখনও কখনও স্বপক্ষীয় সমগ্র নেপথ্য-ভূমি সহসা শত্রুর করতলগত হইবার সম্ভাবনাও ঘটিয়া থাকে।

আবার কখনও কখনও সমর-ক্ষেত্রে সৈন্য-পরিচালন কালে, শত্রু-পক্ষীয় সেনার গতিক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উভয় পক্ষই এরূপ স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিতে বাধ্য হন যে, স্বকীয় নেপথ্য-ভূমির সহিত কোন পক্ষেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে না, এবং উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রায় করতলগতবৎ হইয়া পড়েন। এরূপ সঙ্কটে অসাধারণ শৌর্য্য-প্রকাশ করিয়া বিপক্ষের ব্যূহভেদ-পূর্ব্বক নির্গত হইতে না পারিলে কোনও পক্ষেরই আত্মরক্ষা সম্ভবপর হয় না। পাণিপথের সমরাঙ্গনে মারাঠা ও দুরানী-দিগের শিবির এইরূপ ভাবেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। আহম্মদ শাহ আব্দালীর সম্মুখীন হইবার জন্য মারাঠা সৈন্য যমুনা পার হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলে অতি অল্প কাল মধ্যে উভয় পক্ষেরই সমর-ভূমির অবস্থা আশ্চর্য্য-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পাণিপথের বায়ু-কোণে মারাঠাগণ ও অগ্নিকোণে দুরানীগণ শিবির সংস্থাপনে বাধ্য হন। সে সময়ে যুযুৎসুগণের শিবির যেরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে কোনও পক্ষেরই পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার উপায় ছিল না। নেপথ্য-ভূমির সহিত উভয় পক্ষেরই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। পরস্পরের পশ্চাদ্‌গতি নিবারণের ক্ষমতা উভয় পক্ষেরই ছিল। কাজেই যুদ্ধ-দান ও ব্যূহভেদ-পূর্ব্বক নিষ্ক্রমণ ভিন্ন কোন পক্ষেরই সে সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভের উপায়ান্তর ছিল না।

সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উভয় পক্ষের শিবির-সন্নিবেশের পর অথবা এক পক্ষের শিবির-সংস্থাপন হেতু অপর পক্ষ শিবির-স্থাপনে বাধ্য হইলে পর সেনাপতিদিগের ইচ্ছা ও অবকাশ-ক্রমে যুদ্ধারম্ভ হইয়া থাকে। টুগেলা নদীর তীরে বুয়র-সেনানী বোথা ও ইংরাজ-সেনানী বুলারের সহিত যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, সে গুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক্ষণে যুদ্ধারম্ভের দ্বিতীয় প্রণালীর প্রতি পাঠক মনোযোগ করুন। এই প্রণালী উভয় পক্ষের ইচ্ছা ও অবকাশের উপর নির্ভর করে না। সমর-ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্য-পরিচালন-কালে (on the move) সহসা যুযুৎসুগণের পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘটিলে বা এক পক্ষ অপর পক্ষের গতি-বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অকস্মাৎ শত্রু-সেনাকে আক্রমণ করিলে যুদ্ধারম্ভ হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ প্রকারে যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে সামরিক ক্ষেত্র-নীতির অন্তর্গত, একথা বোধ হয় পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। ফলতঃ যে প্রকারেই হউক, উভয় পক্ষের সান্নিধ্য বা সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইলেই সমর-নীতির প্রথমাংশ শেষ হইয়া যায় এবং প্রকৃত যুদ্ধ-ক্রিয়া-কৌশলের (Tactics) আরম্ভ হয়।

শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা আবশ্যক হইলে তদনুরূপ সৈন্যব্যূহ-রচনা, নদী নালা, বন জঙ্গল, দুর্গ, পর্ব্বত, পল্লী নগর, ও উচ্চাবচ ভূমি প্রভৃতির সহায়তা বা আশ্রয়-গ্রহণ দ্বারা স্ব-বল-বৃদ্ধির চেষ্টা, শত্রু-পক্ষ সম্মুখ যুদ্ধের ভাণ করিয়া সহসা পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে কি না তৎপ্রতি দৃষ্টি, এবং স্বয়ং পার্শ্বভাগ আক্রমণ-কালে অরাতি-দল ক্ষিপ্রতা-পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগের মার্গাদি বিঘ্ন-বিহত করিয়া যেন নেপথ্য-ভূমির সহিত স্বপক্ষীয় যুধ্যমান সেনা-দলের সম্বন্ধচ্ছেদ-পুরঃসর বিপ্লব ঘটাইতে না পারে, তদ্বিষয়ে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন প্রভৃতি কার্য্যই আত্ম-রক্ষা-প্রয়াসীদিগের সমর-কৌশলের (Tactics) মূলভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা আক্রমণ করিবেন, সংক্ষেপে তাঁহাদিগের অবলম্বনীয় কৌশলের নির্দ্দেশ করা সহজসাধ্য নহে। কারণ, সমর-বিশারদদিগের মতে আত্ম-রক্ষা করা অপেক্ষা আক্রমণ-কার্য্য অনেক সময়ে অষ্ট গুণ অধিকতর আয়াস-সাধ্য। অভিযানকারীদিগকে প্রায়ই সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া এক দিকে শত্রুপক্ষীয় সেনা-প্রাচীর ভেদ (Frontal

attack) ও অপর দিকে তাহাদিগের পার্শ্ব-রক্ষক সেনাসমূহকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যথোচিত যত্ন প্রকাশ করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, সেই সঙ্গে অবস্থা বুঝিয়া শত্রুপক্ষকে আংশিক বেষ্টন বা অপর দিকে আক্রমণের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। কদাচিৎ স্বপক্ষের পরাভব ঘটিলে ধীরভাবে স্বীয় সৈন্যবলসহ পশ্চাৎপদ (Retreat) হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনই অপসরণ-কালেও শত্রু-পক্ষের উপর শৌর্য্য-প্রকাশ করিয়া, তাহারা যাহাতে বেগে পশ্চদ্ধাবন-পূর্ব্বক স্বপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করিবার অবকাশ না পায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, শত্রুপক্ষ রণভূমি হইতে অপসরণের চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে বিত্রস্ত ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য নববল-সম্পন্ন তুরঙ্গ সাদীর (Cavalry) নিয়োগে তৎপরতা-প্রদর্শনও অভিযানকারী সেনাপতির অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত।

এই সকল বিষয় ভিন্ন সমর-ক্রিয়া-কুশল সেনাপতিদিগের অন্যান্য বিষয়েও তীব্র দৃষ্টি থাকে। শত্রু পক্ষীয় সেনা-মুখের সহিত যুদ্ধকালে ও প্রধান বাহিনীর সহিত সমরারম্ভের পর শত্রুপক্ষের সমর-পদ্ধতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকিলে, সমর যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা ইষ্টলাভের প্রয়াসকারীদিগকে অনেক সময়ে বিপন্ন হইতে হয়। শত্রু-পক্ষ এক স্থানে আক্রমণের ভান করিয়া অন্য স্থানে সহসা আক্রমণ করিবার সংকল্প করিতে পারে। এই কারণে যুদ্ধকালে সেনানীগণ পরস্পরের উদ্দেশ্যের অনুধাবনে বিশেষ যত্ন-প্রকাশ করিয়া থাকেন। শত্রু পক্ষ যে স্থানেই যুদ্ধাবেশ প্রকাশ করুক, তাহার প্রকৃত বল ব্যূহের কোন্ অংশে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা অবধারিত করিয়া তাঁহারা স্বপক্ষের বল-বিন্যাস করিয়া থাকেন। স্বপক্ষকে অনেক স্থলে শত্রু-ব্যূহের একাংশ আক্রমণের ভান (Demonstration) করিয়া অন্যস্থানে যুদ্ধের অবতারণা করিতে হয়। যুদ্ধকালে স্বপক্ষীয় ব্যূহের কোনও অংশ বিত্রস্ত বা বিধ্বস্ত হইলে ঐ অংশে নূতন সৈন্য-প্রেরণের ব্যবস্থা, ব্যূহতত্ত্বজ্ঞ সেনাপতিকে সর্ব্বদা রাখিতে হয়। আবার স্বপক্ষীয় সৈন্যেরা বিপক্ষের ব্যূহে চঞ্চু-প্রবেশ করিতে পারিলে, তাহাদিগের সহায়তা ও বল-বৃদ্ধি দ্বারা বিপক্ষের উৎসাদন সহজ সাধ্য করিবার জন্যও সমগ্র সৈন্যদলের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ প্রত্যাসার বা পার্ষ্ণিত্রাণ (Reserve) রূপে অদূরে রক্ষা করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ-কালেও সৈনিকগণ যাহাতে স্বেচ্ছাচার বা সামরিক নিয়মের

অনুবর্ত্তনে অমনোযোগ প্রকাশ না করে, যাহাতে তাহাদিগের উৎসাহ ভঙ্গ না হয়, এবং সামান্য জয়-পরাজয়-সূত্রে যাহাতে সৈনিকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়েও সর্ব্বদা সেনাপতির লক্ষ্য রাখা উচিত। বলা বাহুল্য, ক্ষিপ্রতার সহিত প্রয়োজন-মত দণ্ডব্যূহ (ar·ay in line) ভোগব্যূহ (array in column) মণ্ডলব্যূহ (array in circle) ও অসংহত ব্যূহ (in mixed order) প্রভৃতির রচনায় সকল সেনাপতিকেই দক্ষতা প্রকাশ করিতে হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য বহু স্থলেও সেনাধ্যক্ষের পক্ষে সামরিক প্রতিভার পরিচয় দান আবশ্যক হয়। যুযুৎসুগণ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইলে প্রায়শঃ ব্যস্ততার সহিত প্রথমে যে কোনও স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হন। পরে চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী স্থানের পরীক্ষা দ্বারা আপন আপন পক্ষের সুবিধা-জনক স্থানে শিবির অপসারণ বা পূর্ব্ব-গৃহীত স্থানেই আত্ম-রক্ষার্থ পরিখা-খনন করিয়া সমর-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যখন সৈন্য-পরিচালন করিতে করিতে সহসা পথিমধ্যে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে ক্ষিপ্রতার সহিত শিবিরের জন্য যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট স্থান নির্ব্বাচন এবং ক্ষেত্র ও সময়োপযোগী ব্যূহ-রচনা-কার্য্যে যে সেনাপতি বিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই বীরেন্দ্র-সমাজে বরণীয় হয়েন। এইরূপ সংকট-কালেই সেনাপতির প্রকৃত যোগ্যতা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এক পক্ষ যখন প্রতিপক্ষের তুলনায় সেনাবলে বহু গুণ বলীয়ান্ থাকেন, তখন বলবান্ পক্ষের সেনানীকে তাদৃশ সমর-কৌশল প্রকাশ করিতে হয় না। সে ক্ষেত্রে প্রায়ই কেবল বাহুবলে তাঁহারা বিজয়লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন। কিম্বার্লের নিকট লর্ড রবার্টস্ বুয়র সেনানী ক্রঞ্জির উপর যে জয়লাভ করেন, ইংরাজ পক্ষীয়ের সেনার সংখ্যাধিক্যই তাহার প্রধান কারণ-স্বরূপ হইয়াছিল! পরে পারডেবার্গে ক্রঞ্জির সৈন্যদল যে ইংরাজের সেনা-চক্রে বেষ্টিত হইয়া পরাজয়-স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তাহারও কারণ, তাহাদিগের সংখ্যার নিতান্ত অল্পতা। এই উভয় ক্ষেত্রে ইংরাজদিগের সমর-ক্রিয়া-কৌশল অপেক্ষা সেনাতিশয্যই বৃটিশ-সিংহকে জয়শ্রী-দানে অধিকতর সমর্থ হইয়াছিল।

যেখানে সংখ্যায় ও অস্ত্রশস্ত্রে উভয় পক্ষীয় যোধগণ তুল্য থাকেন, সেখানেও জয়-পরাজয় সেনাপতির সৈন্য-পরিচালন-কৌশলের উপর

সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। এরূপ অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে সৈনিকদিগের রণ-শিক্ষা ও অধ্যবসায়াদির গুণেও জয়লাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক সেনাবলের সম্মুখীন হইতে হয়, সেখানেই প্রকৃত পক্ষে সেনাপতির প্রতিভার পরীক্ষা হয়। সেখানে জয় পরাজয় তাঁহার বল-বিন্যাস ও বল-প্রয়োগ-কৌশলের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এইরূপ কৌশলে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেখানে প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধদান আবশ্যক হইয়া উঠিত, সেখানে তিনি শত্রুপক্ষের সম্মুখভাগে যুদ্ধদান করিবার চেষ্টা না করিয়া উহার পার্শ্বভাগ আক্রমণ করিতেন। তিনি প্রায়ই শত্রুপক্ষীয় সমগ্র সেনাবলকে এক-দ্যোমে যুদ্ধ করিবার অবসর দিতেন না, তাঁহাদের পার্শ্বদেশস্থিত সেনাদলকে স্বপক্ষীয় প্রধান সেনাদলের সহিত যুদ্ধ-দান করিতে বাধ্য করিতেন।

এইরূপ কৌশলে স্বপক্ষীয় বল-বিন্যাস-পূর্ব্বক তিনি যুদ্ধারম্ভ করিলে বিপক্ষগণ পূর্ব্ব-রচিত ব্যূহ পরিবর্ত্তিত করিতে ও পার্শ্ব-রক্ষক সেনাদিগের সহায়তার জন্য অপরাপর অংশের সেনাদলকে যুদ্ধস্থলে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইতেন। নেপোলিয়ন সেই অবসরে বিপক্ষের পার্শ্বরক্ষক সেনা-দলের পরাজয়-সাধন-পুরঃসর তাহাদিগের সাহায্যার্থ সমাগত সৈন্য-দিগের সম্মুখীন হইতেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সেনাদলের সহিত পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে যুদ্ধ করিয়া স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে অধিক সংখ্যক শত্রু-সেনার পরাভব-সাধনই নেপোলিয়নের সমর-ক্রিয়া-কৌশলের প্রধান অঙ্গ বা মূল সূত্র ছিল।

নেপোলিয়নের সমর-কৌশল আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইবে যে, যুদ্ধারম্ভ-কালে স্বপক্ষীয় সৈন্য অপেক্ষা পুরোবর্ত্তী যুদ্ধোদ্যত বিপক্ষ সেনা সংখ্যায় অধিক না থাকিলেই সুবিজ্ঞ সেনানীগণ জয়-লাভ-বিষয়ে বহু-পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। যুদ্ধারম্ভের পর যুধ্যমান সৈনিক-দিগের সহায়তার জন্য যত সৈন্যই প্রেরিত হউক, তাহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ ভয়ের কারণ থাকে না। অন্ততঃ নেপোলিয়ন এইরূপ মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার বল-বিন্যাস ও সৈন্য-পরিচালনের কৌশল এইরূপ ছিল যে, তাহার ফলে তিনি প্রায় সকল স্থলেই যুদ্ধারম্ভ-কালে শত্রু-শিবিরের দুর্ব্বলতর অংশে—অর্থাৎ যে অংশের সেনাবল স্বপক্ষের সেনাবল অপেক্ষা অধিক নহে, সেই অংশেই কৌশল-পূর্ব্বক

সংঘর্ষের সূত্রপাত করিতে পারিতেন। এইরূপে সমান সংখ্যক সেনাদলের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইলে নেপোলিয়নের পক্ষে জয়লাভ করা কিছুমাত্র কষ্টকর হইত না। কারণ, তাঁহার সৈন্যদিগের রণশিক্ষা, অধ্যবসায় ও শৌর্য্যাদি গুণ এবং সেনাপতির অসাধারণ ক্ষমতায় বিশ্বাস, ইউরোপের অন্যদেশীয় সৈন্য অপেক্ষা অধিক ছিল। এইরূপ সুশিক্ষিত, সাহসী ও বিশ্বস্ত সেনাদলের সাহায্যে সমান-সংখ্যক বিপক্ষকে পরাস্ত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে, একথা বলাই বাহুল্য।

ফল কথা, শত্রু-শিবিরের দুর্ব্বলতর অংশের নির্ব্বাচন ও সেই অংশে আক্রমণের বেগ যাহাতে প্রবল হয়, তাহার উপায়-বিধানই সমর-কৌশলের একটি প্রধান অঙ্গ। এইরূপ আক্রমণে স্বপক্ষের যতই সৈন্যক্ষয় হউক, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, প্রবল সাগর-তরঙ্গের ন্যায় আক্রমণ-বেগ যথাসম্ভব বর্দ্ধিত করিলে, বিপক্ষের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ ও বিপর্য্যস্ত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে স্বয়ং এইরূপ ভাবে আক্রান্ত হইলে বিপক্ষের আক্রমণ বেগ অসহ্যপ্রায় হইলেও ধৈর্য্যহীন না হইয়া প্রগাঢ় অধ্যবসায়-সহকারে ব্যূহ-রক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন, উৎসাহ বাক্যে আশ্বাসদান-পূর্ব্বক স্বপক্ষীয় সেনার বিপর্য্যয় নিবারণ, যুধ্যমান সেনার সহায়তার জন্য উপর্য্যুপরি নূতন সৈনিক-প্রেরণ, স্বপক্ষীয় সৈন্য-সংখ্যার আধিক্য বিষয়ে যাহাতে বিপক্ষগণের বিশ্বাস জন্মে, এরূপ কৌশলে বল-বিন্যাস এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণ-বেগ নিঃশেষরূপে সহ্য করিয়াও স্বপক্ষীয় যোধগণ প্রত্যভিযান করিয়া শত্রু-নাশ করিতে পারিবেন, বিপক্ষের মনে এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা প্রভৃতি উপায়ই একমাত্র অবলম্বনীয়।

নেপোলিয়নের অবলম্বিত সমর-কৌশল ব্যর্থ করিবার এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও উপায় ছিল না। ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের আক্রমণ অসহ্যপ্রায় ও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিলেও ইংরাজ সেনানী ওয়েলিংটন যে বিশেষ কষ্ট ও সহিষ্ণুতা-স্বীকার-পূর্ব্বক স্বীয় ব্যূহ রক্ষা করিতেছিলেন, এবং স্বপক্ষের পুনঃ পুনঃ পরাজয় ও বিনাশ দেখিয়াও যে উৎকণ্ঠ ভাবে "হয় রাত্রি, না প্রুশীয় মিত্র-সৈন্যগণ আসিয়া সমর-ক্লান্ত সৈনিকদিগকে বিশ্রাম দান করুক" বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহার কারণ পাঠকগণ এখন বুঝিতে পারিবেন। সেনাপতি ওয়েলিংটন

ঈদৃশ ধীরতা প্রকাশ করিতে না পারিলে ওয়াটারলুর পরিণাম অন্য প্রকার হইত, সন্দেহ নাই।

শত্রুব্যূহের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অংশের উপর সমুদ্রের তরঙ্গ-মালার ন্যায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত বেগে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া জয়লাভের চেষ্টা করাই মোসলমান ও মারাঠাগণের এবং বুয়র যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সেনানীদিগের সমর-কৌশলের প্রধান অঙ্গস্বরূপ ছিল। রাজপুতগণও এই প্রকার সমর-পদ্ধতিরই পক্ষপাতী ছিলেন। শত্রুপক্ষকে সংখ্যায়, শিক্ষায়, ব্যূহ-রচনায়, উৎসাহে বা অন্য কোনও বিষয়ে স্বপক্ষের অপেক্ষা হীন বলিয়া বিবেচনা না করিলে, কিংবা তাস্তপক্ষে ঐ সকল গুণে বিপক্ষ স্বকীয় যোধগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে বলিয়া ধারণা না জন্মিলে বুদ্ধিমান্ সেনানায়কেরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আক্রমণ-নীতি অবলম্বন করেন না—ইউরোপীয় ও মারাঠা সেনানায়কেরা কদাপি ঐরূপ করেন নাই। কিন্তু ভারতীয় মোসলমান ও রাজপুত যোদ্ধারা বিপক্ষীয় বলাবলের বিশেষ বিচার না করিয়াই সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত সমর-কৌশলের অবলম্বনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ফল কথা, অসি-যুদ্ধই হউক আর বন্দুক লইয়া যুদ্ধই হউক, সমর-কৌশলের মূলসূত্র সর্ব্বত্রই এক। ক্ষুদ্রশক্তির উপর বৃহৎ শক্তি পাতিত করিয়া, বিপক্ষের দুর্ব্বল অংশের উপর স্বপক্ষের সমস্ত সৈন্যবল প্রযুক্ত করিয়া জয়লাভ করাই সমর-ক্রিয়া-কৌশলের মূল সূত্র। মোসলমান ও রাজপুতদিগের সমর-পদ্ধতির আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া মোসলমান ও মারাঠার সমর-প্রসঙ্গের পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে রণাঙ্গণে মারাঠারা মোসলমানের প্রথম আক্রমণ-বেগ নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা না করিয়া পরাজয়ের ভান-পূর্ব্বক কৌশল-ক্রমে কিয়ৎ পরিমাণে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেন। সুচতুর ব্যাধ যেরূপ দুর্দ্দান্ত বন্য ব্যাঘ্রের প্রথম আক্রমণের বেগে বাধাদান না করিয়া উহার শক্তি-ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত পাশ কাটাইবার চেষ্টা করে, মারাঠারাও মোসলমানদিগের সহিত সমর-কালে সেইরূপ করিতেন। তাহার পর মোসলমান সেনা প্রথমেই মারাঠাদিগের পশ্চাদ্ধাবনে কিয়ৎ পরিমাণে শক্তিক্ষয় করিয়া যখন ঈষৎ শ্রান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, তখন মহারাষ্ট্র সেনানায়কেরা সহসা মুখ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বপক্ষীয় তুরগ-সেনার সহিত দ্বিগুণবেগে তাহাদিগের উপর আপতিত হইতেন। রাজপুতেরা যেরূপ মোসলমান-

দিগের প্রথম আক্রমণবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বহুবার পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, মোসলমানেরাও সেইরূপ মহারাষ্ট্রীয় তুরঙ্গবলের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে পারেন নাই। কি দক্ষিণাপথের সুপ্রসিদ্ধ বীর হায়দার আলীর রণকর্কশ সেনাদল, কি উত্তর ভারতের বাদশাহী সেনা, কেহই মহারাষ্ট্র-শিলেদার ও বারগীরদিগের (১) আক্রমণ-বেগ প্রতিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। পেশওয়েদিগের ৫২ হাজার তুরগসেনা ইংরাজ, ফিরিঙ্গী (পোর্ত্তুগীজ), টিপু, নিজাম, রোহিলা ও দুরাণীদিগের হৃদয়ে সমান ভীতির সঞ্চার করিত। যুদ্ধারম্ভের পর শত্রু-ব্যূহের যে অংশের যোধগণের শ্রান্তি, ভীতি বা নিরুৎসাহের লক্ষণ প্রকাশ পাইত, মারাঠা সেনাপতিগণ সেই অংশে অজস্র বন্যা-প্রবাহের ন্যায় আপনাদিগের তুরঙ্গ-সেনা প্রেরণ করিতেন। তখন সেই অবিশ্রান্ত সেনা-প্রবাহের বেগরোধ করা মোসলমানদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। এইরূপে মারাঠা অশ্ব-সৈনিকদিগের দুর্দ্দমনীয়তা সম্বন্ধে মোসলমানদিগের হৃদয়ে ঈদৃশ ভীতি স্থানলাভ করিয়াছিল যে, পদাতিক সেনার সহিত সংঘর্ষে মোসলমানেরা জয়লাভ করিলেও, মহারাষ্ট্রীয় তুরঙ্গবল সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে না হইতে রণভূমির সম্পূর্ণ অবস্থান্তর ঘটিত, মহারাষ্ট্র ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। "রাক্ষস-ভুবন" নামক স্থানের যুদ্ধে নিজামের হস্তে রঘুনাথ রাও স্বীয় পদাতিক সৈন্যসহ পরাভব-স্বীকার ও প্রবীণ সেনানী মহ্লার রাও হোলকর তরুণ পেশওয়ে মাধব রাওকে পলায়ন-পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবার উপদেশ দান করিবার পর মাধব রাওয়ের ইঙ্গিতে ও উৎসাহ-দর্শনে একদল মহারাষ্ট্র তুরগ-সৈনিক এরূপ প্রচণ্ড বেগে মোসলমান সেনার উপর গিয়া আপতিত হয় যে, প্রবল বন্যামুখে তৃণরাশির ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে বিপক্ষদল ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় এবং মারাঠা শিলেদারের অশ্ব নিজাম বাহাদুরের হস্তীর দন্তোপরি সম্মুখবর্ত্তী

(১) "শিলেদারঃ স্বতুরগী"—যাহারা স্বকীয় অশ্ব লইয়া যুদ্ধ করে, তাহারা শিলেদার (সিল্লিদার) এবং "বারগীরস্ত্বশ্ববহো"—যাহারা পরের বা সরকারী অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করে, তাহারা বারগীর নামে অভিহিত হয়। বারগীর শব্দ হইতেই "বর্গী" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

পদদ্বয় স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং মারাঠার বল্লম নিজাম বাহাদুরের কণ্ঠদেশের সমীপবর্ত্তী হয়। পাণিপথের যুদ্ধেও মহারাষ্ট্রীয় তুরঙ্গসেনার আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া আব্দালীর উজীর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ধরাতলে পতিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে গায়কোয়াড় ও হোলকর বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে আব্দালীর একজন সৈনিকও স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অবকাশ প্রাপ্ত হইত না। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি ভাউ সাহেব গায়কোয়াড়ের প্রতি, শত্রু-পক্ষের যমুনা উত্তীর্ণ হইবার পথরোধপূর্ব্বক দুরাণী সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ দ্বারা তাহাদিগকে বিপন্ন করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু গায়কোয়াড় সে আদেশে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ অবলম্বন করিলেন। অকস্মাৎ কোনও প্রকার বিপৎপাতের সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও মহ্লার রাও হোলকর তাঁহার চল্লিশ সহস্র সেনাসহ নিঃশব্দে গায়কোয়াড়ের অনুবর্ত্তী হইলেন! এইরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতায় পাণিপথে রণ-রঙ্গভূমির অবস্থা সহসা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কেহ কেহ বলেন, আহম্মদশাহ আব্দালী বিপৎকালে সহায়তা পাইবার উদ্দেশে একদল প্রতিগ্রহ বা রিজার্ভ সৈন্য স্বীয় শিবিরে রাখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু, পাশ্চাত্য সেনানায়কেরা যেরূপ সমর-নীতির বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিগ্রহ (রিজার্ভ) সেনার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে আব্দালী সেরূপ করেন নাই। তিনি পূর্ব্ব-নিবেশ স্থান হইতে স্বীয় শিবির সম্পূর্ণ ভাবে অপসারিত করিতে না পারায় তাঁহাকে শিবির-রক্ষার জন্য স্বল্পসংখ্যক সৈন্য পশ্চাদ্ভাগে রাখিতে হইয়াছিল। গায়কোয়াড় যদি স্বীয় কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা না করিতেন, তাহা হইলে সকলেই দেখিতে পাইতেন যে, আব্দালী ঐ সেনাদলকে প্রতিগ্রহ-বল-(Reserved forces) রূপে শিবিরে না রাখিয়া শিবিরের রক্ষকরূপেই রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ঐ সেনাদল যে বিজয়লাভ-ব্যাপারে রণক্ষেত্রে আব্দালীকে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিয়াছিল, ইতিহাসে এরূপ কোনও নিদর্শনও পরিদৃষ্ট হয় না। ফলতঃ পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের সমর-ক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, মহারাষ্ট্রীয়গণের পক্ষে কয়েক জন সেনানায়কের

কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা না ঘটিলে বা তাঁহারা ইচ্ছা-পূর্ব্বক প্রভুর সর্ব্বনাশে অগ্রসর না হইলে সমরের পরিণাম অন্যরূপ হইত।

পাণিপথের যুদ্ধফল যাহাই হউক, মারাঠা শিলেদারগণের আক্রমণ-বেগের বা অভিক্রম-শক্তির দুর্দ্দমনীয়তা স্মরণ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ আফগানেরা আর কখনও মহারাষ্ট্র শক্তির সহিত সংঘর্ষ ঘটাইতে সাহসী হন নাই। পাণিপথে যুদ্ধের বহুদিন পরে যখন উত্তর ভারত হইতে মহারাষ্ট্র আধিপত্য বিলুপ্তপ্রায় হয় এবং ইংরাজেরা ভারতে একটি প্রবল শক্তিরূপে পরিগণিত হন, তখনও আফগানেরা একবার কলিকাতায় গবর্ণর জেনারেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, "আমরা উত্তর ভারতে অভিযান করিবার সংকল্প করিয়াছি, আপনারা আমাদিগকে মারাঠাদিগের বিরুদ্ধে সহায়তা করিতে পারিবেন কি?"

এস্থলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, মারাঠাগণের ক্ষেত্রনীতি-জ্ঞান, সমর-ক্রিয়া-কৌশল যদি এরূপ প্রশংসনীয় ছিল, তাঁহাদের অভিক্রম-শক্তি যদি এরূপ প্রবল ছিল যে, দুর্দ্ধর্ষ মোগল ও পাঠানেরাও তাহার নিকট পরাভব স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা হইলে সেকালের সামান্য ইংরাজ বণিকের হস্তে মহারাষ্ট্র-শক্তির পরাজয় ঘটিল কেন? ইংরাজের সৈন্যদল অল্পদিনের মধ্যেই ভারতীয় রাজন্যবর্গের ভীতিস্থল হইয়া উঠিয়াছিল কেন? এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

ইংরাজের সামরিক শক্তি।

ইংরাজের রাজনীতিক কুটিলতা, দূরদর্শিতা, প্রায় সর্ব্ববিষয়ে নিয়মবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী, রাজ্য-ব্যবস্থার সুকৌশল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি গুণ এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নবাবিষ্ক্রিয়াসমূহের সহায়তা-লাভ, ভারতবর্ষীয় রাজন্যবৃন্দের পরস্পর-বিরোধ হেতু দেশীয় সমাজের বিপ্লবাবস্থা প্রভৃতি সুযোগের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় ইংরাজ বণিকের সামরিক শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে উপলব্ধ হইবে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভৃত্যেরা ভারতীয় সাম্রাজ্য-বিজয়-ব্যাপারে সামরিক ক্ষেত্র-নীতির বা সমর-ক্রিয়া-কৌশলের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইংরাজের সমর-প্রণালীও এদেশের সমর-প্রণালী অপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে অধিক নিয়মবদ্ধ ছিল, একথা যথার্থ;

কিন্তু এই উৎকর্ষ তাঁহাদিগের ভারতে সর্ব্বত্র বিজয়-লাভের মুখ্য কারণ-স্বরূপ হয় নাই, একথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। সামরিক ক্ষেত্র-নীতি-জ্ঞানে (Stratagem) ও সমর-ক্রিয়া-কৌশলে (Tactics) ভারতের মারাঠা ও মোসলমানেরা যে ইংরাজের অপেক্ষা বিশেষ হীন ছিলেন, তাহাও নহে। পলাসীর যুদ্ধে ইংরাজের সামরিক নীতিজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় প্রকাশ পায় নাই; দৈববলেই হউক, আর কুটিল নীতির বলেই হউক, বঙ্গদেশ সহজেই ইংরাজের গলাধঃকৃত হইয়াছিল। পলাসীর তিন চারি বৎসর পরে পাণিপথের যুদ্ধে ভারতের মোসলমানশক্তি ক্ষীণ হইলে ও মারাঠারা কিছু দিনের জন্য হীনবল হইয়া পড়িলে, ইংরাজের নিকট ভারত-বর্ষ বীরহীনা বসুন্ধরার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সেই অবকাশে অযোধ্যার নবাব, রোহিলখণ্ডের সর্দ্দার, দিল্লীর বাদসাহ প্রভৃতি দুর্ব্বল ভূপতিগণকে ভয় দেখাইয়া ইংরাজেরা কিঞ্চিৎ লাভবান্ হইলেন। এই সকল ক্ষুদ্র ব্যাপারে সাফল্য লাভ করায় ইংরাজের কিঞ্চিৎ সাহস বৃদ্ধি পায়। তখন

পেশওয়ে নারায়ণ রাওয়ের হত্যাকারী রঘুনাথ রাওকে সহায়তা করিয়া মারাঠাদিগের সহিত বল-পরীক্ষার অভিলাষ তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হয়। কিন্তু ইংরাজকে শীঘ্রই আপনার ভ্রম বুঝিতে হইল। প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধে ইংরাজেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া আপনা-দিগের বাহুবলের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, প্রাংশুলভ্য ফলগ্রহণে বামনের উর্দ্ধবাহু হওয়া শোভা পায় না; প্রাকৃতিক নিয়মে ফল পক্ব হইয়া স্বতই ভূতলে পতিত হইলে উহা সংগ্র-হের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

এই ঘটনার প্রায় ত্রয়োবিংশ বৎসর পরে ১৮০৩ সালে আসাই ও লাসওয়ারীতে ইংরাজের সহিত আবার মারাঠাগণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে ইংরাজেরা উল্লেখযোগ্য সাহস ও সমরকৌশল প্রকাশ করিয়া-ছিলেন সত্য; কিন্তু নেপোলিয়ান-বিজয়ী পাশ্চাত্যদেশ-প্রসিদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটন সাহেব এই যুদ্ধের সৈনাপত্য করিয়াছিলেন, ইহাও এস্থলে বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। সমর-কৌশলের গুণে এই যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়লাভ করিলেও যুদ্ধের ঈপ্সিত ফল তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই, সামরিক ক্ষেত্র-নীতি বিষয়েও মারাঠা সেনানায়কদিগের হীনতা এই যুদ্ধে প্রতিপন্ন হয় নাই। আসাই ও লাসওয়ারির যুদ্ধে মহারাষ্ট্র শিলেদারদিগের

অতিক্রম-শক্তি দর্শনে ভীত হইয়াই ইংরাজকে শিন্দে ও হোলকারের সহিত "ত্বয়ার্দ্ধং ময়ার্দ্ধং" ন্যায়ে সন্ধি করিতে হয়। অতঃপর পুণার পেশওয়ে দরবারের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। শেষ পেশওয়ে মূর্খচূড়ামণি বাজী রাও বিলাস-ব্যসনে অর্থব্যয় করিবার সুযোগ পাইবার আশায় পেশওয়ে সরকারের ৫২ হাজার প্রসিদ্ধ সংশপ্তক তুরগ-সেনাকে বিদায় দান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে, বোম্বায়ের ইংরাজেরা গোপনে পেশওয়ের সচিবদিগকে হস্তগত করিয়া বাজী রাওকে উক্ত কুপরামর্শ-দানে প্ররোচিত করিতে ত্রুটী করেন নাই। পেশওয়ের ৫২ হাজার সংশপ্তক তুরগ সেনা বিদায়লাভ করিলে বাজী রাও ও তাঁহার সচিবগণ বিলাসসাগরে এরূপ নিমগ্ন হইলেন যে, বোম্বাই হইতে ইংরাজ সেনা সহ্যাদ্রি উত্তীর্ণ হইয়া পুণার আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইলেও পুণার কর্ত্তৃপক্ষ সে সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই! এরূপ অবস্থায় ইংরাজের ক্ষেত্র-নীতি-জ্ঞান অপেক্ষা বিলাসমগ্ন পুণা দরবারের অজ্ঞতা ও অকর্ম্মণ্যতাকেই মহারাষ্ট্র শক্তির পরাজয়ের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। ব্রহ্মদেশ জয় করিয়া ইংরাজকে তথায় আপনাদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে পরিমাণে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, মহারাষ্ট্রে কোম্পানির শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে তাহার অর্দ্ধেক কষ্টও পাইতে হয় নাই। বরং মহারাষ্ট্র দেশের তদানীন্তন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরাই অদূরদর্শিতা ও স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া অনেক স্থলেই স্বহস্তে ইংরাজের বিজয়-পতাকা জন্মভূমির বক্ষের উপর রোপণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন! পাণিপথের যুদ্ধে গায়কোয়াড় যেরূপ প্রভুর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে তাঁহার সচিবেরা সেইরূপ স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পেশওয়ের গুপ্ত মন্ত্রণা ইংরাজের গোচর করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছিলেন। নাগপুরেও এই প্রকার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরাজের আধিপত্য অনায়াসে ও অল্প সময়ের মধ্যে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল। শিখেরা যখন ইংরাজের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তখন ভারতে ইংরাজ শক্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদিগকে ইংরাজের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজ-শাসন এদেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু অজ্ঞ প্রকৃতিপুঞ্জ সে

সময়ে ইংরাজের প্রতি অনুকূল থাকায় এবং বিদ্রোহিদলে তাত্যা টোপী ও ঝাঁশীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ভিন্ন সেনাপতিত্ব করিবার যোগ্য একজন লোকও ছিল না বলিয়া ১৮৫৭ সালের বিপদে ইংরাজেরা সহজে অব্যাহতি-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এইরূপে পূর্ব্বেতিহাসের আলোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, ভারতে বৃটিশ-শাসনের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে ইংরাজের সামরিক শক্তি অপেক্ষা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতা, স্বদেশদ্রোহিতা, অদূরদর্শিতা ও রাজ্যের অব্যবস্থা প্রভৃতিই অধিকতর সহায়তা করিয়াছিল। আর্কটের অবরোধ ভঙ্গ-কালে ক্লাইব সামরিক ক্ষেত্র-নীতির অবলম্বনে প্রকৃষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু হায়দারের সহিত ইংরাজের যে সমস্ত যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র-নীতি-জ্ঞানের বলেই হায়দার বহু স্থলে ইংরাজের পরাজয় সাধন করেন। সমর-কৌশলে ইংরাজের অপেক্ষা মারাঠারা হীন ছিলেন না, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি স্বল্প সংখ্যক ইংরাজ সেনার ভয়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গ সর্ব্বদা থরহরি কম্পিত হইতেন, এমন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইংরাজের সম্বন্ধে ভারতীয় যোধগণের এই প্রকার ভয়ের প্রকৃত কারণ কি? ভারতে আসিয়া ইংরাজ অপূর্ব্ব ক্ষেত্রনীতি-জ্ঞানের বা সমর-কৌশলের পরিচয় দান না করিয়াও উহার সম্পূর্ণ ফল-লাভ করিতে সমর্থ হইলেন কিরূপে?

কুটিল রাজনীতি ও সুব্যবস্থিত শাসন-পদ্ধতির প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ইংরাজের বন্দুক ও কুচকাওয়াজের কৌশলই তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষের সমরক্ষেত্র-সমূহে যশস্বী করিয়াছিল। ইংরাজের ভারতে পদার্পণ কালে বা তৎপূর্ব্বে ভারতে বন্দুকের ব্যবহার ছিল না, এরূপ নহে; বরং অতি প্রাচীন বৈদিককাল হইতেই এদেশে বন্দুকের ব্যবহার পরিজ্ঞাত ছিল, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। কিন্তু বন্দুকের সাহায্যে শত্রুনাশ করা সেকালে কাপুরুষতা-মূলক ও অধর্ম্মজনক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় উহার উন্নতি-বিধানের বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মোসলমান ও মারাঠা যোধগণও যুদ্ধকালে বন্দুক কামানের ব্যবহার করিতেন; কিন্তু ইংরাজেরা বন্দুক কামানকেই যেরূপ যুদ্ধের প্রধান উপকরণে পরিণত করিয়াছিলেন, ভারতীয় যুযুৎসুগণ সেরূপ করেন নাই। তাঁহারা ঐ

সকল আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারকে "কূট যুদ্ধ" নামে নিন্দা করিতেন; বন্দুকের সাহায্যে রণজয় তাঁহাদিগের নিকট শৌর্য্যের নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইত না। এই কারণে সমরক্ষেত্রে কদাচিৎ বন্দুক কামানের ব্যবহার হইলেও অসি-চর্ম্ম-ভল্লাদির উপরেই তাঁহাদিগের বিশেষ নির্ভর ছিল। ইউরোপখণ্ডে যখন প্রথমে বন্দুক ও কামানের উদ্ভাবন হয়, তখন সেখানকার যোধগণও অসি-চর্ম্ম-ভল্লাদির উপরেই সমধিক নির্ভর করিতেন। বন্দুক কামানের প্রচারের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় বীরেন্দ্রবৃন্দ তাঁহাদিগের চির-ব্যবহৃত গুরুভার লৌহ-কবচ, দীর্ঘ-প্রস্থ-বিশাল অসি-ফলক এবং সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় বল্লমের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যুদ্ধারম্ভ-কালে তাঁহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বন্দুক গ্রহণ করত কোনরূপে বহুকষ্টে উহাতে অগ্নি-সংযোগ করিতেন এবং একবার মাত্র সমবেতভাবে গুলিকা-বর্ষণের পরই বন্দুক ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া তরবারি হস্তে শত্রু-পক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইতেন। কি ইউরোপে, কি ভারতবর্ষে কোনও স্থানেই যুদ্ধক্ষেত্রে তখন বন্দুকের ব্যবহার ইহার অপেক্ষা অধিক হইত না। কারণ, তখন বন্দুকের গুলির বেগ ও দূরগামিতা এত অল্প ছিল যে, শত্রু-পক্ষ নিতান্ত সন্নিহিত না হইলে যুদ্ধারম্ভ করা সম্ভবপর হইত না, এবং বন্দুকে গুলি বারুদ পূর্ণ করিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে এত অধিক সময় লাগিত যে, একবার গুলিবর্ষণের পর দ্বিতীয় বার বন্দুক সজ্জিত করিবার ক্লেশ-স্বীকার অপেক্ষা ধাবন-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে সন্নিহিত শত্রুকে আক্রমণ করা অধিকতর সহজসাধ্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তদ্ভিন্ন সেকালের বন্দুকগুলিও এরূপ গুরুভার ছিল যে, দূরদেশে অভিযান-কালে বন্দুক লইয়া কুচ করা সৈনিকগণের পক্ষে কষ্টকর হইত। এই কারণে দুর্গের ও নগর প্রাচীরের উপর বন্দুক কামান সাজাইয়া রাখিয়া আক্রমণকারী শত্রুর উপর অগ্নিবর্ষণ ব্যতীত ও স্থানবিশেষে অদূরে ব্যূহিত শত্রু সেনার সহিত যুদ্ধারম্ভ কাল ভিন্ন অন্য সময়ে বা অন্য প্রকারে ঐ সকল আগ্নেয়াস্ত্রের প্রায়ই ব্যবহার হইত না। শত্রু পক্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গাদির অবরোধ করিবার উদ্দেশ্যে কখনও কখনও বহু আয়াস স্বীকার-পূর্ব্বক বন্দুক ও কামান প্রভৃতি গুরুভার আগ্নেয়াস্ত্র অভীষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হইত। অধ্যবসায়শীল মারাঠারা ভারতব্যাপী হিন্দু সাম্রাজ্য-

স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া যুদ্ধকালে অধিকাংশ স্থলেই বন্দুক কামানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অধিকাংশ অভি-যানেই ঐ সকল দুর্ব্বহ অস্ত্র-শস্ত্রাদি তাঁহাদিগকে সঙ্গে রাখিতে হইত। তথাপি তাঁহারা ঐ সকল আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নতি সাধন করিবার যথোচিত অবসর প্রাপ্ত হন নাই।

ইংরাজেরা যে সময়ে ভারতের রাজ-নীতি-ক্ষেত্রে অবতরণ করেন, সে সময়ে তাঁহাদের বন্দুক কামানের অবস্থা এরূপ ছিল না। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপে বন্দুক কামানের প্রথম প্রচলন হয়। উহার কিছু দিন পর হইতেই ঐ সকল আগ্নেয়াস্ত্রের উৎকর্ষ বিধানে এক দল ইউরোপীয় অস্ত্র-বিশারদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাঁহারা যুদ্ধকালে অসি-ভল্লাদির অপেক্ষা নবোদ্ভাবিত আগ্নেয়াস্ত্রের উপর ক্রমশঃ অধিকতর নির্ভর করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের প্রায় তিন শতাধিক বৎসরের চেষ্টায় (অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে) বন্দুক কামানের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ইউরোপে তখন বন্দুক কামানই যুদ্ধের প্রধান উপকরণে পরিণত হইয়াছিল এবং ঐ সকল আগ্নেয় অস্ত্র পরিচালনের নিয়মাদিও বহু পরিমাণে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বন্দুকের লঘুতা ও গুলির দূর-গামিতা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু বার গুলি বর্ষণ করিয়া দূরস্থিত শত্রু-সৈন্যের মস্তক ভেদ করা তখন বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল না। এই উন্নত প্রণালীর বন্দুক সেকালের ভারত-প্রবাসী ইংরাজদিগের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র ছিল। ইংরাজ সৈনিকেরা যে সে সময়ে সঙ্গিন ও তরবারি আদৌ সঙ্গে রাখিত না তাহা নহে, কিন্তু ঐ সকল অস্ত্রের উপর তাহাদিগের বিশেষ নির্ভর ছিল না। উন্নত প্রণালীর বন্দুকের ন্যায় ইংরাজ সৈন্যের কুচ কাওয়াজ তাহাদিগকে ভারতীয় সমরে বিজয়-দানে অল্প সহায়তা করে নাই। সে কালে যদিও সৈনিকেরা বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বিরলভাবে একটি মাত্র শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইয়া এক মিনিটের মধ্যে ৮০ বার গুলিকাবর্ষণে সমর্থ হইত না, তথাপি তাহাদিগের সম্মুখ-বর্ত্তী দল বসিয়া, মধ্যবর্ত্তী সেনাদল হাঁটু গাড়িয়া ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সৈনিক-শ্রেণী দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্রতার সহিত একাদিক্রমে গুলিকাবর্ষণ করিলে, অসি-ভল্লাদির সাহায্যে যুদ্ধকারী ভারতীয় যোধগণের পক্ষে তাহার ফল

বিষম সাংঘাতিক হইত। ভারতীয় সৈনিক পুরুষেরা অসি-ভল্ল ও প্রাচীন প্রণালীক্রমে নির্ম্মিত বন্দুক লইয়া ইংরাজ-সেনার সমীপবর্ত্তী হইবার অবসরই প্রাপ্ত হইত না। দৈবক্রমে কদাচিৎ ভারতীয় বরকন্দাজ-গণ ইংরাজ সেনার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের উপর গুলি বর্ষণের চেষ্টা করিলে, ইংরাজ সৈনিকদিগের ব্যূহ-রচনা-প্রণালীর গুণে ভারতীয় বর-কন্দাজগণের গুলিতে তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইত না। কারণ, ইউরোপে যেরূপ বন্দুক কামানের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেইরূপ উহাদের অগ্নি-বর্ষণ হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার উপযোগী ব্যূহ-রচনার বিবিধ প্রণালীও উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ইংরাজেরাও ভারতে সেই অভিনব প্রণালীর অনুসরণে আত্ম-রক্ষা করিতেন। ইংরাজ সৈনিকেরা যেরূপ সেনানায়কের ইঙ্গিত মাত্রে যন্ত্রবৎ কার্য্য করিবার শিক্ষালাভ করিত, ভারতীয় সৈনিকদিগের পক্ষে সেরূপ ভাবে শিক্ষিত হইবার প্রয়োজন কখনও উপলব্ধ হয় নাই। বলা বাহুল্য, বন্দুক কামানের ন্যায় আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ-কালে সেনাপতির ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়া সৈনিকেরা যেরূপ সুফল লাভ করে, অসি-ভল্লাদির সাহায্যে আরব্ধ যুদ্ধে সেনাপতির ইঙ্গিতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে গেলে তাহারা সেরূপ সুফল লাভ করিতে পারে না। অতএব সে কালের ভারতীয় সৈনিক-সমাজে যুদ্ধকালে পাশ্চাত্য প্রণালী-সম্মত সুশিক্ষা ও সুব্যবস্থার অভাব পরিলক্ষিত হইত, ইহা বিচিত্র নহে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সামরিক ব্যাপারে বন্দুকের প্রাধান্য থাকায় ইউরোপে সৈনিক-গণের ব্যূহাভ্যাস (প্যারেড) ও ব্যূহরচনা-প্রণালীর বিশেষ উৎকর্ষ-সাধন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বিপক্ষের অগ্নি-বর্ষণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য পাশ্চাত্য সমরাচার্য্যগণ, প্রয়োজন-কালে ইঙ্গিতমাত্রে অনায়াসে কিরূপে ঘনবিরল ভাবে ব্যূহিত হইতে হয়, তাহার কৌশল ও অন্যান্য বিবিধ আত্ম-রক্ষার উপায় সৈনিকদিগকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে সুশিক্ষিত সৈন্য দূরগামি-গুলিকাবিশিষ্ট লঘুভার বন্দুক হস্তে লইয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলে যে, প্রধানতঃ অসিভল্লের সাহায্যে যুদ্ধকারী যোধগণের সহজেই বিনাশ-সাধন করিতে পারিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

ফলতঃ ইংরাজের ব্যবহৃত বন্দুকের উৎকর্ষই ইংরাজকে ভারতে

সার্ব্বভৌম আধিপত্য-দান করিয়াছে। সে কালের পরস্পর-বিবদমান ভারতীয় রাজন্যবৃন্দও ইংরাজও ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিদিগের বন্দুক ও উহার পরিচালন প্রণালীর উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই আপনা-দিগের গৃহবিবাদে তাহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত বল-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইতেন না। সে কালের ইংরাজের বন্দুক হইতে নিঃসৃত গুলিকা ভারত-বাসীর নিকট ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় অব্যর্থ ও অনিবার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত; উহা প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী শত্রু-সেনার মস্তক বিদীর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, সময়ে সময়ে উহা পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈনিকের ললাটভেদ করিয়া যুগপৎ উভয়কেই শমন সদনে প্রেরণ করিত। সেই ভীষণ অগ্নি-গুলিকার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার কোনও উপায়ই ছিল না। অসি-চর্ম্মে উহার বেগ প্রতিরুদ্ধ হইত না, ভারতীয় যোধগণের কোনও অস্ত্রই ইংরাজের বন্দুকধারী সৈনিকের অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিত না। তাই অধিকাংশ স্থলে স্বল্প-সংখ্যক ইংরাজ সেনার সহিত যুদ্ধে ভারতীয় নৃপতি-গণের বিশাল চতুরঙ্গিনী সেনার সম্পূর্ণ পরাভব ঘটিত, ইংরাজের নাম শুনিলে মোগল পাঠান, মারাঠা, শিখ, রাজপুত, বুন্দেলা সকলেরই আতঙ্কে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। ইংরাজের শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহস, রণ-কৌশল বা অপূর্ব্ব ক্ষেত্র-নীতি-জ্ঞান সে আতঙ্কের কারণ-স্বরূপ হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশ প্রচলিত উৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্রের বলেই ইংরাজ ভারতীয় সাম্রাজ্য-বৈভবের অধিকারী হইয়াছেন। ইংরাজের বন্দুকের শব্দ শুনিয়াই দেশীয় সৈনিকদিগের সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়াছে, এরূপ উদাহরণও ইতি-হাসে দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই ঘটনাকে ভারতীয় সৈনিকের ভীরুতার নিদর্শন বলিয়া মনে করা অনুচিত। ইংরাজের গুলির অনিবার্য্যতা-বিষয়ে দৃঢ় ধারণাই এই প্রকার অবসাদের কারণ-স্বরূপ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কোনও প্রকার শৌর্য্য, সাহস ও রণ-ক্রিয়া-কৌশলেই ইংরাজের গুলির গতিরোধ করা সম্ভবপর নহে ভাবিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী সৈনিকদিগকে ইংরাজের অব্যর্থ গুলিতে নিহত হইতে দেখিয়া অতি সাহসী বীরপুরুষকেও নিরুপায় হইয়া পলায়ন করিতে হইত। লর্ড রবার্টস আমীরকে হস্তগত করিয়া স্বল্প-সংখ্যক সৈন্যসহ কাবুল সহর অধিকার করিলে দুর্দ্ধর্ষ আফগানদিগের যে দুর্দ্দশা

ঘটিয়াছিল, তাহারও প্রধান কারণ ইংরাজের বন্দুক ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আফগানেরা শৌর্য্য, সাহস, স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি কোনও গুণেই হীন ছিল না। তাহাদিগের বালক ও রমণীরা পর্য্যন্ত অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া থাকে। ইংরাজের সৈন্য-সংখ্যা সার্দ্ধদ্বি সহস্রের অধিক ছিল না। আফগানিস্থানের পথ ঘাট ও গিরিকন্দরাদি তাহাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। কর্ণেল হানার বর্ণনানুসারে লর্ড রবার্টস্ সামরিক ক্ষেত্রনীতি, সমর-ক্রিয়া-কৌশল ও বল-বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি গুরুতর ভ্রমও করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তথাপি আফগানেরা ইংরাজের বিশেষ কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারিল না। অধিক কি, তাহারা সংখ্যায় প্রায় ৬০ হাজার হইয়াও ইংরাজ সেনার সমীপবর্ত্তী হইতে সাহসী হয় নাই—দূরে থাকিয়া যুদ্ধদানের ভাণ ও ভয়-প্রদর্শন করিয়াই তাহাদিগকে নিরস্ত থাকিতে হইয়াছিল। কর্ণেল হানা এই ঘটনাকে দৈবের লীলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ব্যাপারকে দৈবের লীলা বলা অপেক্ষা বন্দুকের ভীষণ শক্তির নিদর্শন বলিয়াই নির্দ্দেশ করা উচিত। পক্ষান্তরে যে পাঠানেরা সংখ্যায় ইংরাজের অপেক্ষা ২৫।৩০ গুণ অধিক, হইয়াও লর্ড রবার্টসের সেনাদলের সমীপবর্ত্তী হইতে ভয় পাইয়াছিল, তাহারাই কয়েক বৎসর পরে আমীর আব্দর রহমানের চেষ্টায় অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর বন্দুক হস্তে পাইয়া তীরা অভিযানের সময় ইংরাজ সৈন্যের পরাভব সাধনে সমর্থ হইয়াছিল। ফলতঃ অসি-যুদ্ধ ও বন্দুকের সাহায্যে যুদ্ধ করিলে ফলের কিরূপ তারতম্য হয়, এই ঘটনায় তাহা পাঠকের বিশেষ-রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এই অস্ত্র-শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়াই পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, উভয় পক্ষে সমান-শক্তি-বিশিষ্ট (সমান সংখ্যক নহে) অস্ত্রের সদ্ভাব থাকিলে যে পক্ষ প্রকৃত বীর-জনোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত হয়, সে পক্ষের জয় লাভ সুনিশ্চিত হইয়া থাকে। অপিচ বুয়রদিগের ও তীরা প্রদেশের পাঠানদিগের হস্তে যদি উন্নত প্রণালীর বন্দুক না থাকিত, তাহা হইলে বীরোচিত গুণাবলীর পরিচয় দিয়াও তাহারা কিছুমাত্র সুফল লাভ করিতে পারিত না। এই কারণে আমরা ভারতবর্ষের বিজয়-ব্যাপারে ইংরাজ সৈনিকের শৌর্য্য-সাহস ও রণ-কৌশল অপেক্ষা তাহাদিগের হস্ত-

স্থিত পাশ্চাত্যবন্দুকের শক্তিরই সমধিক প্রশংসা-কীর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি।(১) তাহার পর কুচ-কাওয়াজ কাওয়ায়েৎ বা উন্নত প্রণালীর ব্যূহা-

---

(১) আজকাল পাশ্চাত্য জাতিসমূহ যে সকল অভিনব আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার কথা ভাবিলে আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। তাহার উপর আবার নিত্য নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতেছে। প্রচলিত "মজার (Mauser) গন" নামক বন্দুকের মধ্যে যে গুলি উৎকৃষ্ট, তাহাতে একমিনিটে ৭৮টি গুলি নিক্ষিপ্ত হয় এবং সে গুলি প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত সবেগে গমন করে। এক মাইলের মধ্যে শত্রুপক্ষীয় কেহ থাকিলে, তাহার আর নিস্তার নাই! এই কারণে কতিপয় "শার্পশূটার" নামক লক্ষ্যভেদকারী বিশিষ্ট সৈনিক ভিন্ন আজকালকার সমরে আর কাহাকেও লক্ষ্য স্থির করিয়া বন্দুক চালাইতে হয় না। এই সকল ভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করাও ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। কারণ এক একটি গুলি স্তম্ভাকারে শ্রেণীবদ্ধ বহুসংখ্যক মনুষ্যের দেহভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে! গুলি যতদূর যায়, বন্দুকের শব্দ ততদূর যায় না, এদিকে বারুদও নির্ধূম হইয়াছে। কাজেই কোথা হইতে গুলি আসিতেছে, তাহাও স্থির করা অনেক সময় দুরূহ হইয়া উঠে।

আগ্নেয়াস্ত্রসমূহের এইরূপ উন্নতি হওয়ায় আক্রমণ অপেক্ষা আত্ম-রক্ষা করা সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আক্রমণকারীদিগকে প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া আসিতে হয়, আত্ম-রক্ষাকারীর দল বিরল ভাবে অবস্থিত হইয়া "মজার গনের" সাহায্যে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিলে, আক্রমণকারীদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। তাহারা শ্রেণীবদ্ধ ও সংখ্যায় অধিক থাকায় বিপক্ষের অব্যর্থ গুলিতে দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে। পক্ষান্তরে আত্ম-রক্ষাকারীরা বিরলভাবে অবস্থিতি করায় শত্রুপক্ষের একটি গুলিতে তাহাদের একটির অধিক লোক মরে না। ফলে ১৫ জন "মজার গন"-ধারী একশত সশস্ত্র ও সুসজ্জিত শত্রুকে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে। ইহার উপর আত্মরক্ষাকারীরা অব্যবস্থিত সমর পদ্ধতির অবলম্বন করিলে তাহার পরিণাম কিরূপ ভয়ঙ্কর ঘটে, তাহা বিগত বুয়র ও সোমালিল্যাণ্ডের যুদ্ধে সাধারণের গোচর হইয়াছে।

ভ্যাসের কথা। বড় বড় যুদ্ধে বিশেষতঃ ব্যবস্থিত সমর-ব্যাপারে উন্নত প্রণালীর ব্যূহাভ্যাসে জয়-লাভের পক্ষে বিশেষ সহায়তা ঘটে, সন্দেহ

দূরলক্ষ্যভেদী আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কারের সহিত অসি-ভল্ল দূরে থাকুক, বিলাতী সঙ্গীনের ব্যবহারও কমিয়া যাইতেছে। কারণ, এখন আর যুদ্ধকারী সৈন্যদল পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইবার অবকাশই পায় না। উভয় পক্ষ একশত গজ দূরে থাকিতেই যুদ্ধের অবসান হয়, জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। অনেকে বলিতেছেন, আর কিছুদিন পরে যুদ্ধে অশ্বসাদীরও বিশেষ আবশ্যকতা থাকিবে না। অষ্টগুণ অধিক সৈন্য না লইয়া কোন শত্রুকে আক্রমণ করা এখনই অসম্ভব হইয়াছে। যুদ্ধের ব্যয় ও হতাহতের সংখ্যা বাড়িতেছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো জর্ম্মান যুদ্ধে যে পরিমাণ সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল, যুযুৎসুদিগের হস্তে বর্ত্তমান কালের মত উৎকৃষ্ট বন্দুক থাকিলে, তাহার দশগুণ অধিক ক্ষতি ঘটিত। কামানের শক্তিও বিগত ৩০ বৎসরে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ৪০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহার উপর আবার "সিরিগোটী" নামক জনৈক ইটালীয় পণ্ডিত এক অভিনব বন্দুক প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাকে রাক্ষস-বন্দুক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বন্দুকের নলের মুখের নিকট নিম্নভাগে একটি ছিদ্র আছে। গুলি বহির্গত হইবার পর বারুদ হইতে যে গ্যাস নির্গত হয়, তাহা ঐ ছিদ্রপথে গমন করে। ঐ ছিদ্রের নিম্নে একটি সিলিণ্ডার-যুক্ত বাষ্পাধার নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গ্যাস তথায় সবেগে উপস্থিত হইলেই সিলিণ্ডারটি ঘুরিতে থাকে। উহার ঘূর্ণনে বন্দুকের "ব্রিচ" খুলিয়া যায়। অতপর গ্যাসের বেগে টোটার বাক্সের ঢাক্‌নি খুলে। টোটাগুলি স্প্রীংয়ের সহিত এরূপভাবে সংযুক্ত থাকে যে, বাক্সের ঢাক্‌নি খুলিয়া গেলেই উহাদের একটি স্প্রীংয়ের বলেই বন্দুকের যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাক্সের মধ্যে যতক্ষণ টোটা থাকে, ততক্ষণ এইরূপ কার্য্য আপনা আপনি হইতে থাকে। বন্দুকধারী একবার ঘোড়া তুলিয়া উহা টিপিলে ও প্রথমে একটি গুলি চালাইলেই পরবর্ত্তী কার্য্যসমূহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বতই সম্পাদিত হয়। বন্দুকধারীকে কেবল বন্দুকটি সমানভাবে স্কন্ধের অধোভাগে ধরিয়া রাখিতে হয়।

নাই ; কিন্তু অব্যবস্থিত সমরে কাওয়ায়েৎ শিক্ষার তাদৃশ প্রয়োজন থাকে না, কেবল বিপক্ষের বন্দুকের অনুরূপ বন্দুক থাকিলেই যথেষ্ট হয়, একথা আফরিদী ও বুয়র যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। যে বন্দুকের বলে ইংরাজ সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইয়াও বিগত দেড় শত বৎসর কাল এসিয়াখণ্ডে অজেয় শক্তিরূপে পরিগণিত হইতেছিলেন, সেই বন্দুক আফরিদী ও বুয়রদিগের হস্তগত হওয়ায় ইংরাজের কিরূপে ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিল, তাহা স্মরণ করিলে ভারত-বিজয় ব্যাপারে, ইংরেজ শৌর্য্যবীর্য্যের প্রশংসা বা ভারতীয় যোধগণের ভীরুতার নিন্দা করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না। উভয় পক্ষে সমান-শক্তি-বিশিষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র থাকিলে ইংরাজ বণিকের পক্ষে ভারতীয় রণক্ষেত্রে বিজয়-লক্ষ্মীর কৃপালাভ করা দুঃসাধ্য হইত, একথা সাহস-পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে। উভয় পক্ষে সমান অস্ত্র শস্ত্র ছিল বলিয়াই মারাঠা ও মোসলমানের যুদ্ধে খর্ব্বকায় মারাঠারা অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতির গুণে জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতির অনুসরণ করায় সংখ্যার অল্পতা-জনিত দোষে তাঁহাদের কোনও ক্ষতি সাধিত হয় নাই। কিন্তু যদি তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র মোসলমানদিগের অপেক্ষা বিশেষ হীন থাকিত, তাহা হইলে মোসলমানদিগের পরাভব-সাধন করা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর হইত। অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতির আলোচনা কালে অস্ত্র-শক্তিবিষয়ক এই তত্ত্বটি বিশেষ ভাবে মনে রাখা আবশ্যক। তাই এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিবার জন্য আমাদিগকে ইংরাজের ভারতে জয়-লাভের সামরিক কারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে হইল। এই আলোচনায় আমরা ইংরাজের

এই বন্দুকের সাহায্যে এক মিনিটে বিনা আয়াসে তিন শত গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। নলের মুখের নিকটে গুলির বেগ সেকেণ্ডে ২২ শত ফীট থাকে। এই বন্দুকের গুলি দুই মাইল যায়! একটি ব্যাটেলিয়নের নিকটে যদি এই বন্দুক থাকে, তাহা হইলে, তাহারা চারিমিনিটের মধ্যে শত্রুপক্ষের উপর দশলক্ষ গুলি বর্ষণ করিতে পারে! বলা বাহুল্য, এই বন্দুকে গুলি বারুদ জলের ন্যায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। সামরিক বিভাগে এই বন্দুকের ব্যবহার করিতে হইলে, উহার গুলি-বারুদের ব্যয়েই রাজকোষ শূন্য-প্রায় হইবে, সন্দেহ নাই।—হিতবাদী।

কামানের শক্তি বিষয়ে কোনও প্রসঙ্গের উত্থাপন করি নাই; কারণ, অব্যবস্থিত সমরে কামানের ন্যায় গুরুভার আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করিয়া কোনও পক্ষই সুফল লাভ করিতে পারেন না। বুয়রের বন্দুকের নিকট ইংরাজের তোপখানা ও শিবাজীর শিলেদারের নিকট মোগল-দিগের তোপখানা অকর্ম্মণ্যবৎ হইয়াছিল, ইহা সকলেরই স্মরণ থাকিতে পারে। বরং বুয়র যুদ্ধে ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অব্যবস্থিত পদ্ধতি-ক্রমে সমরকারীদিগের সংখ্যা যতই কম হউক, তাহাদিগের নিকট বড় বড় তোপখানা, ডিনামাইট, গন কটন প্রভৃতি সাংঘাতিক বিস্ফোরক দ্রব্য, সমরোপযোগী বাষ্পীয় শকট ও পরিখাদি-খননোপযোগী বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি উপকরণের যতই অভাব থাকুক, সাধারণ সৈনিকদিগের হস্তে প্রতি পক্ষের তুল্য-শক্তি-বিশিষ্ট অস্ত্র থাকিলে—অন্ততঃ তাহাদের অস্ত্র প্রতিপক্ষের অপেক্ষা অধিক হীন না হইলে, পূর্ব্বোক্ত বিপুল সমর সম্ভার-সেবিত প্রবল শত্রুর পরাজয় সাধনও বিশেষ কষ্টকর হয় না।

অব্যবস্থিত সমর।

মহাত্মা শিবাজী ও বাজীরাও প্রভৃতি মারাঠা বীরগণের অবলম্বিত অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতির সমর্থন ও পরিচয়-দান প্রসঙ্গে আমরা সামরিক ক্ষেত্র-নীতি, (Stratagem) ও সমর-ক্রিয়া-কৌশল সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। উভয় পক্ষীয় সৈনিকদিগের ব্যবহার্য্য অস্ত্রের শক্তির তারতম্যে যুদ্ধ-ফলের কিরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তাহা দেখাইবার জন্য আমাদিগকে বর্ত্তমানকালের বন্দুক—কাওয়ায়তের কিঞ্চিৎ আলোচনাও করিতে হইয়াছে। সমর বিজ্ঞান-বিষয়ক এই সাধারণ তত্ত্বগুলি ব্যবস্থিত ও অব্যবস্থিত উভয়বিধ সমরেরই অনুষ্ঠান কালেই সমানভাবে প্রযুজ্য। বরং অব্যবস্থিত সমরের অনুষ্ঠান-কালে দুর্ব্বল পক্ষকে এই সকল তত্ত্বের প্রতি যেরূপ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়, প্রবল পক্ষকে সকল সময়ে সেরূপ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হয় না। শৌর্য্য, সাহস, ক্ষিপ্রতা, সহিষ্ণুতা, স্বদেশপ্রীতি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য প্রভৃতি যে সকল গুণে রণচণ্ডীর অন্তরিক প্রীতি সম্পাদিত হইয়া থাকে, অব্যবস্থিত সমর-কারীদিগের পক্ষে সেই সকল গুণের বাহুল্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, প্রতি

পক্ষীয় সৈনিকদিগের হস্তস্থিত অস্ত্রের অনুরূপ অস্ত্রের সংগ্রহও সেইরূপ আবশ্যক। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধকালে মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকদিগের ব্যবহৃত অস্ত্র মোসলমানদিগের অস্ত্রের প্রায় সমকক্ষ ছিল, অন্ততঃ তদপেক্ষা নিতান্ত হীন ছিল না এবং শৌর্য্যসাহসাদি গুণে তাঁহারা সামসময়িক মোগলদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাদের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন। এই তত্ত্বটি যাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাঁহারা কখনই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রকৃত বীরগৌরবের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে অগ্রসর হইবেন না, রাজপুতের অপেক্ষা তাঁহাদিগকে শৌর্য্যে বীর্য্যে হীন বলিয়া মনে করিবেন না বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

এক্ষণে অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতি সংক্রান্ত কয়েকটি মৌলিক-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বলিয়াছি, আমরা যাহাকে অব্যবস্থিত সমর পদ্ধতি বলিতেছি, ইংরাজীতে তাহাকে "গরিলা ওয়ার-ফেয়ার" (Guerilla warfare) বলে। এই গারিলা শব্দটি ইংরাজী quarrel শব্দেরই স্পেনদেশীয় রূপান্তর হইতে উদ্ভূত। ইহার মৌলিক অর্থ কলহ বা বিগ্রহ ? এই শব্দের ইলা Illa প্রত্যয়টি ক্ষুদ্রার্থ বাচক। স্পেন দেশীয় ভাষায় ক্ষুদ্র যুদ্ধ বা খণ্ড যুদ্ধকে "গরিলা ওয়ার" বলে। পর্ব্বত-বহুল স্পেন দেশের লোকে বিপুল যুদ্ধসম্ভার সহ সম্মুখ যুদ্ধ অপেক্ষা অতুল শৌর্য্য সহকারে প্রবল শত্রু পক্ষকে সহসা আক্রমণ ও আত্মরক্ষার্থ পলায়ন-মূলক নীতির উপর নির্ভর করিয়াই মহাবীর নেপোলিয়নকে ঘোরতর বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। নেপোলিয়ানের ন্যায় মহাবীরকে জর্জ্জরিত ও পরাস্ত করা অসম্ভব বলিয়া যখন ইউরোপবাসীর মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল, সেই সময়েই স্পেন-দেশবাসী গরিলা ওয়ার ফেয়ার বা অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতির ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রদর্শন করিয়া সমগ্র সভ্য জগৎকে চমৎকৃত করেন। স্পেনবাসীর সহিত অব্যবস্থিত সমরে লিপ্ত হওয়াতেই সর্ব্বপ্রথম নেপোলিয়ানের সৌভাগ্য-সাগরে ভাটার সূত্রপাত হয়। ফলে ইউরোপের ইতিহাস রূপান্তর ধারণ করে। গরিলা ওয়ারফেয়ার বা অব্যবস্থিত সমর-সত্রের অপূর্ব্ব ফল দর্শন করিয়া অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতি স্পেনবাসীর নিকট ঐ সত্রের অনুষ্ঠান-প্রণালী শিক্ষা-পূর্ব্বক দেশকাল পাত্রানুসারে অল্পাধিক পরিমাণে আপনাদিগের অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হন। এই রূপে খৃষ্টীয় ঊনবিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে স্পেনীয়েরা

গরিলা যুদ্ধের প্রবর্ত্তন করিয়া যেরূপ পাশ্চাত্য জগতে যুগান্তরের সৃষ্টি করেন, সেইরূপ ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাত্মা শিবাজী সেই সমর পদ্ধতির অবলম্বন করিয়া বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের মূলোচ্ছেদ-পূর্ব্বক আসমুদ্র-হিমাচল-ব্যাপী হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্রীয় বীরেরা সমর-নীতি-বিষয়ে শিবাজীর পদানুসরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য বহু পরিমাণে সুসিদ্ধ করিতে সমর্থ হন। মহারাষ্ট্রদেশে এই সমর-প্রণালীকে "গনিমী কাওয়া" বলে।

অব্যবস্থিত সমর সত্রের ফল এরূপ বিস্ময়কর হইলেও অকালে উহা অনুষ্ঠিত হইলে কখনই ইষ্টসিদ্ধি হয় না। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কালা-কালের বিচারের সহিত দেশ ও পাত্রের বিচারও অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন কোনও প্রবল বৈদেশিক রাজশক্তি কোনও দেশ অধিকার করিয়া স্বীয় অসংখ্য সৈন্যের ও কৌশলপূর্ণ বিধি-ব্যবস্থার বলে তথায় আপনার সাম্রাজ্য শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, তখন সেই বৈদেশিক শক্তির উচ্ছেদ সাধনের জন্য অব্যবস্থিত সমর-পদ্ধতির অবলম্বন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। বৈদেশিক রাজ-শক্তির দ্বারা দেশ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইবার পূর্ব্বে অব্যবস্থিত সমর সত্রের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে তাহা প্রায় সুফলপ্রদ হয় না। নগ-নদী-বনানী-বহুল দেশই অব্যবস্থিত যুদ্ধের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই কারণে স্পেন, ইটালি, মেক্সিকো, স্কটল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে গরিলা যুদ্ধের ফল অতীব বিস্ময়কর হইয়াছিল। যাহাদের হৃদয়ে স্বদেশ প্রীতি অতিশয় প্রবল, যাহারা পরকীয় শাসনপাশ হইতে দেশের উদ্ধার-সাধন কার্য্যে দেশের অধিকাংশ লোকের নিকট সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ করিবার আশা করিতে পারে, তাহারাই এই অব্যবস্থিত সমর-যাগের অনুষ্ঠান করিবার যোগ্য পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দেশকাল-পাত্র সম্বন্ধে এই সকলের বিষয়ের বিচার না করিয়া গরিলা যুদ্ধের অবতারণা করা মূর্খতা বলিয়া রণ-বিশারদেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছত্রপতি শিবাজী ও তাঁহার পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্র বীরেরা দেশকাল পাত্র সম্বন্ধে যথোচিত আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের চেষ্টা এরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

অব্যবস্থিত সমর আরব্ধ হইলে পরকীয় রাজশক্তি দ্বারা অধিকৃত

সমস্ত ভূভাগ ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমরকারীদিগের রণ-রঙ্গ-ভূমিতে (Theatre of war) পরিণত হয়। সামারিক ক্ষেত্রনীতির আলোচনা-কালে বলা হইয়াছে যে, স্বরাজ্য মধ্যে যাহাতে সমরাঙ্গণ নির্দ্ধারিত না হয়, তৎপক্ষে যত্ন-প্রকাশ করা সমরবিশারদ যুযুৎসুগণের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য-পালনকে সামরিক ক্ষেত্রনীতির মূল সূত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অব্যবস্থিত সময়ে দুর্ব্বলপক্ষ বিনা আয়াসে এই নিয়মের সম্পূর্ণ সুফল ও সুবিধা ভোগ করিতে সমর্থ হন। কারণ, স্বদেশ শত্রু পক্ষের দ্বারা অধিকৃত থাকায়, আক্রমণকারী যুযুৎসুদিগের হস্ত হইতে উহার রক্ষা করিবার ভার অব্যব[illegible] ভাবে সমরকারীদিগকে গ্রহণ করিতে হয় না। দেশশাসনকারী [illegible]শিক শক্তিকেই আপনার ক্ষমতা ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সমরকারীদিগের লক্ষ্য স্থানীয় দুর্গ, নগর, (Stratagical points) পথ ও ঘাট(Lines of communication) প্রভৃতি রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হয়। ফলে দুর্ব্বলপক্ষ রণরঙ্গ-ভূমি ও উহার নেপথ্য প্রদেশ সংক্রান্ত অনেক কর্ত্তব্য কার্য্যের দায় হইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকেন। দশ জন লোকের চেষ্টায় যে প্রদেশে এক দল যুদ্ধকারীর আবির্ভাব হয়, সেই প্রদেশই তাঁহাদিগের সামরিক নেপথ্য ভূমিতে পরিণত হয় এবং সেই সমরকারীর দল আত্ম-রক্ষা-পূর্ব্বক যে প্রদেশের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া শত্রুপক্ষকে অকস্মাৎ আক্রমণ ও লুণ্ঠন প্রভৃতি দ্বারা ব্যতিব্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারেন, সেই প্রদেশটুকুই তাহাদের রণভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সেই যোধবৃন্দই যখন এক প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া বলিষ্ঠ পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার উদ্দেশে অন্য প্রদেশে গমন করেন, তখন তাঁহাদের রণরঙ্গভূমির নেপথ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কারণ, তাঁহারা যখন যে প্রদেশে গমন করেন, তখন সেই প্রদেশের অধিবাসিগণ তাঁহাদিগকে দেশের উদ্ধারকারী জানিয়া সাধ্যমত রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রাদি-দানে সহায়তা করিয়া থাকে। বলিষ্ঠ বিপক্ষের গুপ্ত সংবাদাদি সংগ্রহ করিবার জন্যও অব্য-বস্থিত সমরকারীদিগকে প্রায়ই স্বতন্ত্র চর-বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় না। কারণ, ঐ কার্য্যও রসদ-সংগ্রহকারী জনপদবাসীরা সানন্দচিত্তে সম্পন্ন করিয়া থাকে।

শত্রুপক্ষ যতই বলিষ্ঠ হউক, স্বীয় সেনাদলের দ্বারা সমপ্রদেশকে

পরিব্যাপ্ত করা কথনই তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এই কারণে তাহাদের সেনানিবাস হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশেই অব্যবস্থিত সমরকারী-দিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলিকে সর্ব্বদা আপনাদিগের ধাবন ও পলায়ন-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আত্ম-রক্ষা ও শত্রুপক্ষকে সহসা আক্রমণ করিতে হয় বলিয়া সাধারণতঃ লঘুবেশ ও লঘু অস্ত্রের পক্ষপাতী হইতে হয় এবং অতিরিক্ত অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধসম্ভারাদি সঞ্চিত রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র গুপ্ত স্থানের নির্ব্বাচন করিতে হয়। সমরকারী দুর্ব্বল পক্ষ প্রায়ই হয় গিরি-কন্দরে, না হয় গভীর অরণ্যে আপনাদিগের আয়ুধাগার নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন; কথনও কথনও তাঁহাদিগের ভাগ্যে দুর্গপ্রাকার-পরিখাদিবেষ্টিত স্থানের লাভও ঘটিয়া থাকে। প্রবল শত্রুপক্ষ যাহাতে কোন ক্রমে সেই গুপ্ত আয়ুধা-গারের সন্ধান না পায়, অথবা কোনও প্রকারে উহার নিকটবর্ত্তী হইতে না পারে, তাহার জন্য দুর্ব্বল পক্ষকে নানা প্রকার কৌশলের অবলম্বন করিতে হয়। সর্ব্ব প্রকার সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও কথনও কথনও এরূপ ঘটে যে, দুর্ব্বল পক্ষের আয়ুধাগার যে প্রদেশে সংস্থাপিত থাকে, সেই প্রদেশ অকস্মাৎ প্রবল শত্রুপক্ষের হস্তগত হইয়া যায়। এই কারণে অধিকাংশ স্থলেই এই গুপ্ত আয়ুধাগার ভূগর্ভে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রবল পক্ষ উহার আবিষ্কার করিতে সহজে সমর্থ হয় না। এ দিকে ঐ প্রদেশস্থিত যুযুৎসুদলকে বহুদূর প্রদেশে পলায়ন-পূর্ব্বক আত্ম-রক্ষা করিতে হয় এবং কথনও কথনও এরূপও ঘটে যে, তাঁহারা সহজে আর পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হন না। কিন্তু এরূপ ঘটিলেও ঐ প্রদেশে সঞ্চিত অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রায়শঃ অকারণে নষ্ট হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত যুযুৎসুদলের পলায়নের পর ঐ প্রদেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে ভাবিয়া প্রবল পক্ষের সেনা-নিবাস যথন ঐ অঞ্চল হইতে অপসারিত হয়, তথন অন্য কোনও দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে বিতাড়িত অব্যবস্থিত সমরকারীদিগের একটি নূতন দল আসিয়া হয়ত ঐ প্রদেশে আশ্রয়-গ্রহণ ও পূর্ব্ব দলের সঞ্চিত অস্ত্রশস্ত্রাদি সমরোপকরণের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, এই সকল কার্য্য দেশবাসীদিগের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহায়তা ভিন্ন কথনই সম্পাদিত হয় না। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অব্যবস্থিত সমর কথনই এক দল সৈন্যের

সহিত অপর এক দল সৈন্যের যুদ্ধেই পর্য্যবসিত হয় না, দুই একটি যুদ্ধের জয় বা পরাজয়ে অব্যবস্থিত সমরের কখনও অবসান হয় না। কারণ, ব্যবস্থিত সমরের ন্যায় এই অব্যবস্থিত সমর, রাজায় রাজায় যুদ্ধ নহে। ইতঃপূর্ব্বে এই যুদ্ধের দেশ, কাল ও পাত্র-বিষয়ক বিচার-কালে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে পাঠক অব্যবস্থিত সমরের মূল প্রকৃতি কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এক কথায় সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করিতে গেলে বলিতে হয়, বৈদেশিক জেতৃ-জাতির সহিত সম্মুখ সমরে পরাভূত প্রকৃ[illegible]পুঞ্জের আত্মরক্ষা-পূর্ব্বক অসংখ্য খণ্ড যুদ্ধই অব্যবস্থিত বা গরিলা [illegible] নামে পরিচিত। এই সমরে জেতৃ-জাতির সেনাদলকে সমগ্র জনপদবাসীরই পরাভব-সাধন করিবার ভার গ্রহণ করিতে হয়। ব্যবস্থিত সমরে যেরূপ এক দল সেনার পরাজয় সাধন করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সমগ্র দেশ অধীনতা স্বীকার করে, অব্যবস্থিত সমরে সেরূপ হয় না। পক্ষান্তরে সমগ্র জনপদবাসীর পরাভব-সাধন নেপোলিয়ানের ন্যায় অতি প্রচণ্ড বৈদেশিক বিজেতার পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এ স্থলে সমগ্র জনপদবাসী বলিতে, দেশের প্রত্যেক অধিবাসী, এরূপ অর্থ আশা করি কেহ গ্রহণ করিবেন না। কারণ, সকল দেশে সকল সময়েই এক দল লোক হয় অর্থ-লোভে, নয় নির্ব্বুদ্ধিতাবশে, স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে বৈদেশিক রাজ-শক্তির সহায়তা করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে। স্পেন, মেক্সিকো, সুইজারল্যাণ্ড, ট্রান্সভাল ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি সকল দেশেই অব্যবস্থিত সমরকারীদিগকে এই প্রকার দেশদ্রোহীর হস্তে অল্পাধিক পরিমাণে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে। বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধেও জাপানে স্বদেশ-দ্রোহীর অভাব ছিল না। ফল কথা, দেশের প্রত্যেক অধিবাসীর না হউক, অধিকাংশ লোকের সহানুভূতি ও সহায়তা ভিন্ন অব্যবস্থিত সমরে কেহ কখনও যশস্বী হইতে পারে নাই। নানা দেশের অব্যবস্থিত সমরকারীদিগের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, পরকীয় শাসনপাশ-মোচনে সাধারণ ভাবে দেশবাসীর হৃদয়ে আগ্রহ না জন্মিলে কখনও অব্যবস্থিত সমরের আরম্ভ হয় না। এই রূপ ভাবে অব্যবস্থিত সমর আরব্ধ হইলে সমরকারিগণ দেশবাসীর নিকট কি রসদ, কি অস্ত্র শস্ত্র, কি শত্রুপক্ষের গুপ্ত সংবাদ-সংগ্রহ, কি সুপরামর্শ, সকল বিষয়েই যথাসম্ভব সহায়তা লাভ করিয়া

থাকেন। অবশ্য, যে সকল স্থলে সমরকারীদিগকে সহায়তা-করণের অপরাধে ধরা পড়িয়া দেশের শাসনকারী বৈদেশিকদিগের দ্বারা তৎক্ষণাৎ কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, অথবা শত্রু সৈন্য ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলে, স্বদেশের জন্য সমরকারী-দিগকে সাহায্য-দানের চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার সুবিধা না থাকে, সেখানে জনপদবাসী যদি স্বপক্ষকে সহায়তা করিতে বিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহা বিশেষ দোষের বিষয় বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু যেখানে সেরূপ আশঙ্কা নাই, সেখানে জনপদবাসী সহায়তা-দানে ঔদাস্য প্রকাশ্য করিলে, নিতান্ত পক্ষে বিপক্ষকে কোনও প্রকারে সাহায্য করিব না বলিয়া কৃত-সংকল্প না হইলে অব্যবস্থিত ভাবে সমর পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন মহারাষ্ট্রের দেশভক্ত বীরগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া দেশের নানাস্থানে মোগলদিগের সহিত খণ্ড সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন দেশের অধিকাংশ লোকে তাঁহাদিগকে ব্যক্তি-গত ভাবে শত্রু-পক্ষের অবস্থিতি সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান, খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহ, আপনাদিগের সুস্থকায় তরুণ পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয় যুবকদিগকে সমরকারীদিগের দলে মিলিত হইবার জন্য উৎসাহ দান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা সহায়তা করিয়াছিলেন। অন্যান্য দেশের অব্যবস্থিত সমরের ইতিহাসেও জনপদবাসীর এবম্প্রকার সহায়তার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল স্থলেই জনপদবাসিগণ ব্যক্তিগত ভাবেই স্বদেশ-হিতৈষী সমরকারীদিগকে যথাশক্তি সাহায্য করিয়া থাকেন—অন্য সকলে সাহায্য করিতে অগ্রসর না হইলে, আমি সাহায্য করিব না বলিয়া কেহ পশ্চাৎপদ হন না। ফল কথা, "সামরিক ক্ষেত্রনীতি" শীর্ষক প্রক-রণে যুযুৎসুদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে, অব্যবস্থিত সমরে তাহার অধিকাংশ কার্য্যই জনপদবাসীকে বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যক্তিগতভাবেই করিতে হয়। এই কারণেই সংক্ষেপে সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ-স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, বৈদেশিক জেতৃজাতির সহিত সমগ্র জনপদবাসীর সংগ্রামকেই অব্যবস্থিত সমর বলে।

বৈদেশিক বিজেতার শাসন-পাশ ছিন্ন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে সকল দেশহিতৈষী অব্যবস্থিত সমরকারীর দল গঠিত করেন, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে দেশের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণভূমি ও অসংখ্য

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেপথ্য ভূমির (Base of operation) সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই সকল রণ-ভূমিতে শত্রুপক্ষের সহিত সমরকারীদিগের প্রথমাবস্থার প্রায় কখনই ধীরভাবে সম্মুখ সমর সংঘটিত হয় না। শত্রুপক্ষকে কিঞ্চিৎ অসাবধান বা ঈষৎ দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইলেই অব্যবস্থিত সমরকারীরা অকস্মাৎ তাহাদিগের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ, ও তাহাদের রসদ লুণ্ঠন করেন এবং শত্রুপক্ষ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবামাত্র পলায়ন-পূর্ব্বক আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হন। শত্রুপক্ষকে সহসা আক্রমণ ও লুণ্ঠন-পূর্ব্বক ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ব্বল করাই তাঁহা[illegible] সমর-ক্রিয়ার প্রধান কৌশল এবং শত্রুর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ [illegible]য়া পলায়নই তাঁহাদের আত্মরক্ষার মূল মন্ত্র-স্বরূপ হইয়া উঠে। এই কারণে প্রবল শত্রু পক্ষ তাঁহাদিগকে "দস্যুদল" নামে অভিহিত করিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। অনভিজ্ঞ লোকেও সেই সকল দেশ-হিতার্থে অব্যবস্থিত সমরকারীদিগকে দস্যু শ্রেণীভুক্ত করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হয়। কিন্তু শত্রুদমনের জন্য অব্যবস্থিত সমরকারীরা যে কোনও প্রণালীরই অবলম্বন করুন না কেন, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহা-দিগের সমাদর কখনই বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস পায় না। কারণ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণ বুঝিতে পারেন যে, এই সকল পলায়নপটু সমরকারীদিগের জন্য দেশের মধ্যে অসংখ্য রণভূমির সৃষ্টি হওয়ায় ও ঘন ঘন ঐ সকল রণভূমির পরিবর্ত্তন ঘটায় দেশের শাসনকারী বৈদেশিক রাজশক্তিকে ঘোর বিড়ম্বিত ও বিপন্ন হইতে হইতেছে। সমরকারিগণ যখন কোনও স্থানে পরাস্ত হইয়া পলায়ন-পূর্ব্বক অন্যত্র গমন ও তথায় নূতন রণভূমির সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন, তখন সেই নূতন প্রদেশে অন্ততঃ প্রথম কিছু দিন তাঁহাদিগের প্রভাব বর্দ্ধিত ও শত্রুপক্ষের প্রভাব হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সেই সুযোগে সমরকারিগণ প্রায়শঃ শত্রু পক্ষের থানা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনা-নিবাসের ধ্বংস-সাধন, সরকারি রসদ ও ধনাগারাদির লুণ্ঠন, রেলপথ বা অন্যবিধ রাজমার্গাদির বিপর্য্যয়-সাধন-পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্রাদি ও খাদ্য সামগ্রীর সংগ্রহ করিয়া আত্মপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। সমরকারীদিগের দলপতি সাহসী ও বুদ্ধিমান্ হইলে রসদের জন্য দেশবাসীর মুখাপেক্ষী না হইয়া অধিকাংশ স্থলেই শত্রুপক্ষের সংগৃহীত বা সংগৃহ্যমান অন্নসামগ্রীর লুণ্ঠন দ্বারা আপন দলের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া থাকেন। জনপদবাসীদিগের

মধ্যে যাহারা স্বদেশের প্রতি বিদ্রোহাচরণ-পূর্ব্বক শত্রুপক্ষকে কোনও প্রকারে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়, গরিলা যুদ্ধকারীরা তাহাদিগের সর্ব্বস্ব-হরণ-পুরঃসর তাহাদিগকে দণ্ডিত করিতেও কালবিলম্ব করেন না। এই রূপে দণ্ডিত হইলে দেশদ্রোহিগণের শত্রুপক্ষকে সহায়তা করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি বহু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এইরূপে নূতন রণভূমিতে কিছু দিন পর্য্যন্ত শত্রু পক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া, তাহাদিগের যন্ত্রাস্ত্র-শস্ত্র-বহুল বিশাল সেনাদল আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অব্যবস্থিত সমরকারিগণ ঐ স্থান ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হন। দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র শত শত যুযুৎসুদলের চেষ্টায় এইরূপ সমর-পদ্ধতির অনুষ্ঠান আরব্ধ হইলে অতি প্রবল শত্রুকেও ক্রমশঃ হীনবল হইতে হয়।

বলিয়াছি, আপনাদের ধাবন ও পলায়ন-শক্তির নির্ভর করিয়া অব্যবস্থিত সমরকারী দলগুলি আত্মরক্ষা ও শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু সকল সময়ে এইরূপ সমর-নীতির অনুসরণে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। কখনও কখনও সম্মুখ যুদ্ধে শৌর্য্য ও সাহস প্রকাশ করিয়া সমরকারী-দিগকে আত্ম-রক্ষা করিতে হয়। রণভূমির পরিবর্ত্তনকালে শত্রুপক্ষ যদি দীর্ঘকাল পশ্চাদ্ধাবন করে, তাহা হইলে সমরকারীদিগের পক্ষে সহসা শত্রুর অভিমুখীন হইয়া প্রবলভাবে আক্রমণ-পূর্ব্বক তাহাদিগের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। কদাচিৎ শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক সহসা আক্রান্ত হইলে পলায়নের সুযোগ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত শৌর্য্য সহকারে যুদ্ধদান করিতে হয়। কখনও কখনও রণভূমির জন্য সুবিধামত স্থান লাভ করিবার আশায় শত্রুপক্ষের নেত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিতে হয়—শত্রুসেনার সহিত যুদ্ধ করিবার ভান করিয়া তাহাদিগকে অভীষ্ট দেশ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অপসারিত করিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কিয়ৎকাল সম্মুখ যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত না হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। নূতন প্রদেশে রণভূমি নির্দ্ধারণের সময়েও ঐ প্রদেশস্থিত শত্রুপক্ষের থানা ও সেনানিবাস-স্থিত সৈন্যদলের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। শত্রুপক্ষের রসদ লুণ্ঠন অব্যবস্থিত সমরকারীদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। এই কর্ত্তব্য সাধন-কালেও সময়ে সময়ে সম্মুখ সমরে শৌর্য্য প্রকাশ করিতে হয়।

এইরূপ নানা কারণে প্রবল শত্রুপক্ষের সহিত অল্পাধিক পরিমাণে

সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া অব্যবস্থিত সমরকারীদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ঈদৃশ অবস্থায় সমরকারিগণকে যে সমর-ক্রিয়া-কৌশলের (tactics) অবলম্বন করিতে হয়, তাহার মধ্যে প্রায়শঃ বিশেষ জটিলতা বা সেনাপতির প্রতিভার পরিচয় দানের আবশ্যকতা থাকে না। সংঘর্ষ অনিবার্য্য বলিয়া বোধ হইলে দলবদ্ধ ভাবে ভীমবেগে শত্রুর উপর পতন, প্রাণপণ শৌর্য্য সহকারে ক্ষণকাল মধ্যে শত্রুসেনায় ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য যত্ন-প্রকাশ, সহজে শত্রুপক্ষকে অভিভূত করিতে অসমর্থ হইলে দীর্ঘকাল বৃথা যুদ্ধে আত্মশক্তির ক্ষয় না করিয়া অসংকোচে পলায়ন এবং পর্ব্বত, কানন বা দুর্গাদির আশ্রয় প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত [illegible] করিবার লোভ সংবরণ প্রভৃতি কার্য্যই অব্যবস্থিত সমরকারী[illegible] সমরকৌশলের প্রধান অঙ্গ। কি রসদ লুণ্ঠনকালে, কি শত্রুসেনার সহিত সংঘর্ষ সময়ে, কি তাহাদিগের শিবির-গুল্মাদির বিধ্বংস-কালে সর্ব্বদাই অব্যবস্থিত সমরকারী-দিগকে আক্রমণের বেগ যথাসম্ভব প্রবল করিতে হয় এবং যৎপরোনাস্তি ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য শেষ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। ইহাই অব্যবস্থিত সমরে জয়লাভের মূলমন্ত্র বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। [illegible]ব্যবস্থিত সমরে সকল সময়ে এরূপ ভীষণ অভিক্রম (gallant attack) ও ক্ষিপ্রকারিতার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু গরিলা যুদ্ধে যোধদিগকে প্রতিপদে এই দুই গুণের পরিচয় দান করিতে হয়। যোধদিগের মধ্যে এই দুইটি গুণ প্রধান না থাকিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষে শত্রুর পরাজয়-সাধন, রসদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [illegible]াদির লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের অনবরত ক্ষতিসাধন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, উভয় পক্ষীয় অস্ত্র-শক্তির সমতা বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে যে তত্ত্বের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি ঔদাস্য ঘটিলেও অব্যবস্থিত সমরকারীদিগকে শৌর্য্য, সাহস, ক্ষিপ্রতা, স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি গুণের বাহুল্য-সত্ত্বেও দীপমুখে পতঙ্গের ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। তাঁহাদের সমস্ত পুণ্য-চেষ্টাই হীন অস্ত্রের দোষেই ব্যর্থ হইয়া যায়।

গরিলাযুদ্ধের প্রথম অবস্থায় যোধগণকে শত্রুপক্ষের রসদ ও ধনপূর্ণ যানাদি পথিমধ্যে অসহায় অবস্থায় আক্রমণ-পূর্ব্বক হরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তৎপরে ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধির সহিত বিপক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবির-গুল্মাদি আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে সাফল্য-লাভ দুষ্কর হয় না। [illegible]শেষোক্ত কার্য্য দক্ষতার সহিত সাধন করিতে পারিলে একদিকে যে